রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা
(খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগে পি-এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত
গবেষণাপত্র

দেবস্মৃতি জানা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০১৬

This is certified that the thesis entitled - রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) *- submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dr. Debarchana Sarkar, Professor of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata and Prof. Dr. Swati Bhattacharya, Associate Professor of Govt. College of Art and Craft, Kolkata.*

Neither this thesis nor any part of it has been submitted before any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Candidate : ....

Dated :

Countersigned by the :

1. Supervisor : ....

2. Supervisor : ....

Dated :

এই গবেষণাপত্র

আমার অনুজা **দেবশ্রুতি**'র

পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গীকৃত হলো।।

"ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি ...."

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতাস্বীকার	১-৪
চিত্রসূচী	৫-৩২
প্রাক্কথন	৩৩-৩৯
প্রথম অধ্যায়	
ভূমিকা	৪০-৬৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	
প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ (রস, রীতি, ধ্বনি)	৬৪-১১৪
তৃতীয় অধ্যায়	
সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রস, রীতি, ধ্বনি ঃ	
ক. নাট্যকার কালিদাস	১১৫-১৫৬
খ. নাট্যকার ভবভূতি	১৫৭-১৯১
গ. নাট্যকার শূদ্রক	১৯২-২১৪
চতুর্থ অধ্যায়	
ভারত-শিল্পের ইতিহাস	২১৫-২৬৯
পঞ্চম অধ্যায়	
প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় রস, রীতি, ধ্বনি - প্রয়োগ ঃ	
ক. চিত্রকলা	২৭০-৩৩১
খ. ভাস্কর্য	৩৩২-৩৮৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উপসংহার	৩৮৬-৪০৭
গ্রন্থপঞ্জী	৪০৮-৪২৮

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) শীর্ষক গবেষণা সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার মেলবন্ধনকে উপস্থাপিত করার একটি বিনম্র প্রয়াস। এক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রস, রীতি, ধ্বনি - এই তত্ত্বগুলি কিভাবে একাধারে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটিকে প্রভাবিত করেছে এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা যে একে অন্যের পরিপূরক - সেই সূক্ষ্ম ধারাটিকেই অনুসন্ধান করার প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র।

এই গবেষণাকার্যের প্রতিটি স্তরে আমি একাধিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে ঋণী, যাঁদের সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া এই গবেষণা সম্পূর্ণ করা অসম্ভব ছিল। গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়করূপে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ড. দের্বাচনা সরকার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন প্রাপ্ত গভ: কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌ট-এর অধ্যাপিকা ড. স্বাতী ভট্টাচার্যকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা বহু বিস্তৃত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে তাঁদের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করার সুযোগ দিয়েছেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের রস, রীতি, ধ্বনি এই তত্ত্বগুলি যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে একইসাথে প্রভাবিত করেছে, তা অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে তাঁদের ভাবনা এবং মননশীল মন্তব্য গবেষণায় উদ্ভুত সমস্যাগুলির সমাধানের ক্ষেত্রে তথা বিষয়ভিত্তিক নিবন্ধ রচনার প্রয়াসে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। তাঁদের স্নেহ, অনুপ্রেরণা এবং ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য আমি তাঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আমাকে গবেষণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করেছেন। আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের কর্মীবৃন্দের কাছেও কৃতজ্ঞ, যাঁরা গবেষণা সংক্রান্ত নানান কার্যাবলীতে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

গবেষণার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে সাহায্য করার জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ড. রঘুনাথ ঘোষ-কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, যিনি গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক বিশ্বনাথ মুখার্জী-কে, যিনি তাঁর মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-র গ্রন্থাগারিক ড. মিতালী চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতীয় জাদুঘরের গ্রন্থাগারিক ড. চিত্তরঞ্জন পাত্র-কে আমাকে গবেষণা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। মুরলীধর গার্লস কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী বঙ্গশ্রী দে-কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণার উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং Digital Library-র কর্মীবৃন্দকে শ্রদ্ধা জানাই। এছাড়াও আমি কলকাতাস্থিত জাতীয় গ্রন্থাগার, The Ramakrishna Mission Institute of Culture Library, Golpark, ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা এবং কলকাতার Asiatic Society-র গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের কাছে কৃতজ্ঞ, যাঁরা গবেষণার ক্ষেত্রে আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই উত্তরপ্রদেশের সারনাথ মিউজিয়াম, কলকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, বেনারসের ভারত কলাভবন, দিল্লীর ন্যাশনাল মিউজিয়াম, কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম ও আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম, চন্দ্রকেতুগড় মিউজিয়াম ও তাম্রলিপ্ত আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে।

আমি সেই সমস্ত ঐতিহাসিক, ভারততত্ত্ববিদ্ এবং গবেষকদের কাছে কৃতজ্ঞ যাঁদের গবেষণা আমার কাজে সর্বাঙ্গীনভাবে সহায়তা করেছে। গবেষণাপত্রের শেষে উপস্থাপিত গ্রন্থসূচীতে সেই সমস্ত গবেষকদের গ্রন্থাবলী উল্লেখের মাধ্যমে তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার প্রয়াস করেছি।

এই গবেষণার ক্ষেত্রে নানান সময়ে, নানান বিষয়ে সাহায্য এবং সহযোগিতা করার জন্য আমি শিল্পকলার গবেষক দেবদত্ত গুপ্ত-কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি রামকৃষ্ণ মঠ, বরানগর-এর শ্রদ্ধেয় স্বামী হরিদেবানন্দ (অমল মহারাজ)-কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই, যিনি সর্বদা আমাকে আত্মবিশ্বাস ও মানসিক দৃঢ়তা নিয়ে এই গবেষণাপত্র রচনায় উৎসাহিত করেছেন।

আমার বাবা শ্রী পাঁচুগোপাল জানা ও মা শ্রীমতী ভারতী জানা-কে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই, যাঁদের স্নেহ ও অনুপ্রেরণা গবেষণাকার্য পরিচালনার জন্য আমাকে মানসিকভাবে আত্মবিশ্বাসী করেছে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অনিন্দ্যসুন্দর ব্যানার্জীকে যার সহযোগিতায় এই গবেষণাপত্রের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

গবেষণাপত্রের বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য ধর ব্রাদার্স -কে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা **দেবস্মৃতি জানা**

তারিখ : ১৭.০৬.২০১৬

চিত্রসূচী

চিত্রসংখ্যা : ১ চিত্রিত হরিণ

সময়কাল : আনুমানিক নিয়োলিথিক - চ্যালকোলিথিক যুগ।

প্রাপ্তিস্থান : খারভাই ভীমভেটকা, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : অশোক মিত্র, *ভারতের চিত্রকলা* (প্রথম খণ্ড), ২০১২।

চিত্রসংখ্যা : ২ শিকারের দৃশ্য

সময়কাল : আনুমানিক নিয়োলিথিক - চ্যালকোলিথিক যুগ।

প্রাপ্তিস্থান : ভিমভেটকা, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : http://www.indianetzone.com/10 bhimbetka.htm

চিত্রসংখ্যা : ৩ নৃত্যরতা নারী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ - ১৫০০।

প্রাপ্তিস্থান : সিন্ধু সভ্যতা - মহেঞ্জোদারো।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৪ সন্ন্যাসীর মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ - ১৫০০।

প্রাপ্তিস্থান : সিন্ধু সভ্যতা - মহেঞ্জোদারো।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৫ সীলমোহর

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ – ১৫০০।

প্রাপ্তিস্থান : সিন্ধু সভ্যতা – মহেঞ্জোদারো।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৬ টরসো - পুরুষ মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ – ১৫০০।

প্রাপ্তিস্থান : সিন্ধু সভ্যতা – মহেঞ্জোদারো।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৭ সিংহস্তম্ভ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৮ দিদারগঞ্জ যক্ষিণী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ১ম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দিদারগঞ্জ, বিহার।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৯ কল্পবৃক্ষ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বিদিশা, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ১০ সিংহস্তম্ভ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ১১ রিলিফ, The Gift of Jetavana

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ভারহুত, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১২ মায়ার স্বপ্নদর্শন

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ভারহুত, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৩ রিলিফ - Adoration of Buddha

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ভারহুত, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৪ পিলার রিলিফ - যক্ষী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ভারহুত, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৫ সাঁচী স্তুপ, উত্তরের দ্বারস্তম্ভ - রিলিফ।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : সাঁচী, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৬ সাঁচী স্তুপ, উত্তরের দ্বারস্তম্ভ - রিলিফ।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : সাঁচী, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৭ যক্ষী মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : সাঁচী, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৮ যক্ষী - সাঁচী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : সাঁচী, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১৯ কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২০ বোধিসত্ত্ব

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২১ উপোসরত বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২২ বুদ্ধের মস্তক

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২৩ দণ্ডায়মান বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২৪ বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২৫ বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : গান্ধার, পাকিস্তান।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ২৬ দণ্ডায়মান বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ২৭ দণ্ডায়মান বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ২৮ নারীমূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ২৯ উপবিষ্ট বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৩০ বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৩১ নলগিরি হস্তী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৩২ রিলিফ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৩৩ বুদ্ধের জীবনচরিত

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অমরাবতী, অন্ধ্রপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৩৪ উপবিষ্ট বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৩৫ বুদ্ধের মস্তক

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৩৬ দণ্ডায়মান বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৩৭ নারীদেহের নিম্নাংশের ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৩৮ অবলোকিতেশ্বর

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৩৯ মুকুটশোভিত বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৪০ মহাজনকের প্রব্রজ্যাগ্রহণের সংকল্প, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং-১।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ, বাকাটক রাজত্বকাল।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৪১ চম্পেয় জাতকের কাহিনী, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ, বাকাটক রাজত্বকাল।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৪২ চম্পেয় জাতকের কাহিনী, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ, বাকাটক রাজত্বকাল।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৪৩ বিধুর পণ্ডিত জাতকের কাহিনী, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ২।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ, বাকাটক রাজত্বকাল।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৪৪ দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান : মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৪৫ গঙ্গা অবতরণ দৃশ্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ।

প্রাপ্তিস্থান : মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৪৬ নৃত্যরত শিব, বাদামী গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকেব শেষভাগ।

প্রাপ্তিস্থান : বাদামী, কর্ণাটক।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৪৭ রাবণ কর্তৃক পর্বত উত্তোলন — কৈলাসনাথ মন্দির

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : ইলোরা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৪৮ গুহা-ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : আইহোল, কর্ণাটক।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৪৯ শিবের তাণ্ডব নৃত্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : ইলোরা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৫০ শিব-মহেশ্বর ত্রিমূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : এলিফ্যান্টা গুহা, বম্বে।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ৫১ বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুল, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫২ মহাজনকের অভিষেক — মহাজনক জাতকের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৩ মহাজনকের অভিষেক — মহাজনক জাতকের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৪ মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প — মহাজনক জাতকের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৫ মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প — নারীগণ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৬ মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প — নারীগণ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৭ মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প — নারীগণ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৮ মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প — নারীগণ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৫৯ শঙ্খপালজাতকের কাহিনীর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬০ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬১ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬২ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৩ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৪ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৫ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৬ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ২

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৭ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৮ ছাদের অলংকরণ সজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৬৯ বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭০ নাগ রাজকন্যা ইরন্দতী, বিধুর পণ্ডিত জাতক কথার অংশ, গুহা নং - ২

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪

চিত্রসংখ্যা : ৭১ মুমূর্ষু রাজকন্যা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৬

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭২ নন্দের ধর্মপরিবর্তন কথা : নন্দের পত্নী জনপদ কল্যানী, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৩ নন্দের ধর্মপরিবর্তন কথা : নন্দের পত্নী জনপদ কল্যানী, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৪ প্রেমিক যুগল : বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি দৃশ্যের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৫ মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন : বুদ্ধের জন্মসম্বন্ধীয় কাহিনীর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ২

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৬ অপ্সরা - বুদ্ধের পূজার অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৭ বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৮ বুদ্ধের উপদেশদানের একটি অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৭৯ সিংহলাবদান জাতকের কাহিনীর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮০ মদমত্ত হাতীকে বশীকরণ করার দৃশ্য, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮১ প্রেমিক যুগল বেস্‌সান্তর জাতক কাহিনীর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮২ নারী সিংহলাবদান কথার অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৩ বেস্‌সান্তর জাতক-এর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৪ রাজকুমারীর অঙ্গসজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৫ কিন্নরযুগল বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৬ নারীচিত্র, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৭ নারী — বুদ্ধের মারবিজয়ের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৮ নারীচিত্র, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৮৯ নারী — বেস্‌সান্তর জাতক কাহিনীর অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ৯০ বহু নারীর নৃত্যদৃশ্য, বাঘগুহা চিত্রকলা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ৪

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বাঘ, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : অশোক মিত্র, (সম্পা.), ভারতের চিত্রকলা, ২০১২।

চিত্রসংখ্যা : ৯১ বহু নারীর নৃত্যদৃশ্য, বাঘগুহা চিত্রকলা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ৪

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বাঘ, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : অশোক মিত্র, (সম্পা.), ভারতের চিত্রকলা, ২০১২।

চিত্রসংখ্যা : ৯২ উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৯৩ দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ।

প্রাপ্তিস্থান : জামালপুর, মথুরা, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ৯৪ সুলতানগঞ্জের বুদ্ধমূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সুলতানগঞ্জ, বিহার।

সৌজন্যে : https://en.wikipedia.org/wiki/Sultanganj_Buddha.

চিত্রসংখ্যা : ৯৫ মুকুটশোভিত বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৯৬ ব্যাখ্যানরত বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৯৭ নাগ মুচলিন্দ দ্বারা সুরক্ষিত বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বুদ্ধগয়া, বিহার।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৯৮ বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ৯৯ অভয়মুদ্রায় বুদ্ধ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১০০ অবলোকিতেশ্বর

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১০১ নাগরাজ ও রাণী, অজন্তা গুহা, গুহা নং - ১৯

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ১০২ যক্ষ মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ১০৩ বুদ্ধমূর্তি, অজন্তা গুহা, গুহা নং - ১৯

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ১০৪ বুদ্ধের মারবিজয়, অজন্তা গুহা, গুহা নং - ২৬

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের শেষার্ধ।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ১০৫ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ, অজন্তা গুহা, গুহা নং - ২৬

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, The Art of Ancient India, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ১০৬ দেব-দেবী মূর্তি, অজন্তা গুহা, গুহা নং - ১৬

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অজন্তা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : অজন্তা কা বৈভব, এ. ঘোষ (সম্পা.), প্রকাশন বিভাগ, ভারত সরকার, ১৯৯৪।

চিত্রসংখ্যা : ১০৭ শিব-পার্বতী মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : কোশাম্বি, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১০৮ রাহু ও অপর তিন গ্রহ মূর্তি

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১০৯ অলংকৃত মন্দির স্থাপত্যাংশ

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ভূমারা, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১১০ কুবের, ধনসম্পদের দেবতা

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বিহার।

সৌজন্যে : ভারতীয় জাদুঘর, কলকাতা।

চিত্রসংখ্যা : ১১১ বিষ্ণুর বরাহঅবতার

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগ, বরাহ গুহা, নং - ৫।

প্রাপ্তিস্থান : উদয়গিরি, মধ্যপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India*, 1993.

চিত্রসংখ্যা : ১১২ অনন্তশয্যায় বিষ্ণু ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : http://www.ancient.eu/image/3876/

চিত্রসংখ্যা : ১১৩ নর-নারায়ণ ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : https://en.wikipedia.org/wiki/Deogarh,_Uttar_Pradesh#/media/File:Nara_Narayana_Deogarh.jpg

চিত্রসংখ্যা : ১১৪ গজেন্দ্রমোক্ষ ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : https://en.wikipedia.org/wiki/Dashavatara_Temple,_Deogarh#/media/File:Gajendra_Moksha.jpg

চিত্রসংখ্যা : ১১৫ গঙ্গা-যমুনা

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : অহিচ্ছত্র, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : http://www.remotetraveler.com/wp-content/gallery/national-museum-delhi/Goddess-Ganga-Yamuna-in-Gupta-Gallery-in-National-Museum-Delhi.jpg

চিত্রসংখ্যা : ১১৬ জলদেবী গঙ্গা

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বেসনগর, ভোপাল, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১১৭ নন্দীর পৃষ্ঠে আরোহনরতা শিব-পার্বতী।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : http://www.archipelago.org/vol3-4
/snead11.htm

চিত্রসংখ্যা : ১১৮ বিষ্ণুর অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট মূর্তি ভাস্কর্য

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : বাদামী, কর্ণাটক।

সৌজন্যে : https://en.wikipedia.org/wiki/Badami_cave_
temples#/media/File:Badami_Cave_3_si05-
1613.jpg

চিত্রসংখ্যা : ১১৯ অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট বিষ্ণু

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ।

সৌজন্যে : https://en.wikipedia.org/wiki/Dashavatara_
Temple,_Deogarh

চিত্রসংখ্যা : ১২০ শিব-নটরাজ, বাদামী গুহা, গুহা নং - ১

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক।

প্রাপ্তিস্থান : বাদামী, কর্ণাটক।

সৌজন্যে : Susan L. Huntington, The Art of Ancient India,
1993.

চিত্রসংখ্যা : ১২১ দুর্গা-মহিষাসুরমর্দিনী

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : The Art of Indian Asia, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১২২ মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ইলোরা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : The Art of Indian Asia, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১২৩ গঙ্গা অবতরণদৃশ্য।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : The Art of Indian Asia, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১২৪ গঙ্গা অবতরণদৃশ্য - অর্জুনের তপস্যা।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু ।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : The Art of Indian Asia, Vol - II. 1955.

চিত্রসংখ্যা : ১২৫ রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত উত্তোলন।

সময়কাল : আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দী।

প্রাপ্তিস্থান : ইলোরা, মহারাষ্ট্র।

সৌজন্যে : Heinrich Zimmer : The Art of Indian Asia, Vol - II. 1955.

প্রাক্‌কথন

রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক গবেষণার ক্রমবিকাশ ঃ

সাহিত্য ও শিল্পকলার মূল উদ্দেশ্যই হল আনন্দদান। আনন্দহীন কোনো বস্তু আমাদের অভীপ্সিত নয়। উপনিষদে এই মতের সমর্থন মেলে - *যেনাহং নামৃতং স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম।* [১] উপনিষদ আরোও বলে যে ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। *আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজনাৎ।* [২] আনন্দরূপ সেই ব্রহ্ম নিজেকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে। সর্বত্রই তাঁর সেই আনন্দময় সত্তার প্রকাশ বিদ্যমান। জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে। তিনি রস স্বরূপ এবং এই রস উপভোগ করে জ্ঞানীরা আনন্দলাভ করেন। উপনিষদে বলা হয়েছে — *রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।* [৩] সাহিত্যে বাক্যের বৈচিত্র প্রধান স্থান দখল করলেও রসই সাহিত্যের জীবন। *বাগ বৈদগ্ধ প্রধানে'পি রস এবাত্র জীবিতম্।* [৪]

সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে এক ধরণের লোকোত্তর আনন্দ রয়েছে। এই লোকোত্তর আনন্দের উৎস হল সেই পরম ব্রহ্ম। সাহিত্যের মধ্যে যে শৃঙ্গারাদি রস অনুভূত হয় তার মধ্য দিয়ে আমরা আনন্দ উপভোগ করে থাকি। শিল্পকলার অনুভবের মধ্যেও এক আনন্দময় প্রশান্তি আছে, যার জন্য আমরা বারবার সেই শিল্পের টানে ছুটে যাই। এই আনন্দের উৎস সেই পরম ব্রহ্ম। শিল্পানুভবজনিত আনন্দ সেই ব্রহ্মানন্দের স্ফূরণ হলেও তা অল্পক্ষণস্থায়ী। এই আনন্দের মধ্যেই আমাদের বেঁচে থাকা, এই আনন্দের মধ্যেই আমাদের বিলীন হয়ে যাওয়া। উপনিষদে তাই বলা হয়েছে — *আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং*

প্রর্যন্ত্যভিসংবিশতি।[৫] সাহিত্য রচনা বা সাহিত্যপাঠের উদ্দেশ্য যে অসীম আনন্দলাভ তা আলংকারিক মম্মটভট্ট বলেছেন —

কাব্যং যশসে'র্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তা সম্মিততয়োপদেশযুজে।[৬]

প্রসিদ্ধ আলংকারিক জগন্নাথ পণ্ডিত বলেছেন —

আনন্দ-বিশেষ-জনক-বাক্যং কাব্যম্।[৭]

অর্থাৎ, যে বাক্য দ্বারা মনে আনন্দবিশেষের উদ্রেক হয় তাই প্রকৃত কাব্য।

মানুষমাত্রই সৌন্দর্যপ্রিয়। এই সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে নাটক, কাব্য, নৃত্য, গীত বিভিন্ন শিল্পচর্চার মাধ্যমে। শিল্পচর্চা আমাদের এক লোকোত্তর আনন্দের সন্ধান দেয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রকলা থেকে আমরা অনাবিল আনন্দ পাই। এই আনন্দ অহৈতুকী বলেই তা 'রস' বলে উল্লিখিত। আস্বাদ্যমানতাই রসের বৈশিষ্ট্য। যা আস্বাদ্যমান হয় তাই 'রস'। আচার্য ভরতমুনি তাঁর রসসূত্রে বলেছেন রসের নিষ্পত্তি হয় বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিভাবের মিশ্রণের দ্বারা।

তত্রবিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।[৮]

নাটক বা দৃশ্যকাব্যে আমারা যে রসের সন্ধান পাই তা একান্তই সুখ-দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। রসোসিক্ত হৃদয় অতি সহজেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে, যা আনন্দবর্ধন উল্লেখ করেছেন — *ক্রৌঞ্চ দ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমা গতঃ।*[৯] অর্থাৎ, বাল্মীকির মধ্যেও ক্রৌঞ্চ - ক্রৌঞ্চযুগেলের বিচ্ছেদ থেকে উত্থিত শোকে শ্লোকে রূপান্তরিত হয়েছিল, করুণরসের সমাগম ঘটেছিল। তাই কোন কাব্যসৃষ্টিকে কবির বা রচয়িতার হৃদয়স্থিত রসের উপস্থিতি পূর্বে দরকার। কবি নিজে রসসিক্ত হলেই তার বিচ্ছুরণ কাব্যের মধ্যে পড়ে এবং রস সৃষ্টি হয়। দৃশকাব্য বা নাটকের সব চরিত্রগুলি নায়ক, নায়িকা সকলেই একই রসে সিক্ত হয়ে থাকেন ফলে অভিনয়ের

সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়। এই রসকেই দর্শকমণ্ডলী অনুভব করে থাকেন তাঁদের অন্তরে পুঞ্জীভুত রসের মাধ্যমে। তাই সহৃদয়তাকে রস সৃষ্টির অন্যতম কারণ বলা হয়। সহৃদয় পাঠক বা দর্শককে বলা যায় শৈল্পির অভিব্যক্তি বা শৈল্পিক যোগাযোগের (artistic manifestation or communication) অন্যতম মাধ্যম।

সো'র্থঃ হৃদয়সংবাদী তস্য ভাবো রসোদ্ভবঃ।
শরীরং ব্যাপ্যতে তেন সূক্ষ্মং কাষ্ঠমিবাগ্নিনা ।।[১০]

সহৃদয় পাঠক বা দর্শকের মধ্যে যখন রসানুভূতি হয়ে থাকে তখনই তিনি আনন্দলাভ করেন। সেক্ষেত্রে 'রস' কাব্যের ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার ক্ষেত্রে রস অতিপ্রয়োজনীয় তত্ত্ববিশেষ। সংস্কৃত আলংকারিকরা তাই রসকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন। *বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্।*[১১] পাশাপাশি অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিকেও কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করা হয়। *রীতিরাত্মাকাব্যস্য।*[১২] আচার্য বামনের মতে যে বিষয়গুলো কাব্যকে সুষমামণ্ডিত কসর তার মধ্যে সবচেয়ে বলবান হচ্ছে রীতি। বামন এই রীতিকে বিশিষ্ট পদরচনা বলেছেন।[১৩] যখন কোন বাক্য প্রসাদাদিগুণের দ্বারা সংযুক্ত হয় তখনই তা বিশিষ্টপদরচনায় পর্যবসিত হয়।

আনন্দবর্ধন সমস্ত কিছুকে পরিত্যাগ করে ধ্বনিকেই কাব্যের আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন। *ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য।*[১৪] ধ্বনি ব ব্যঞ্জনা কাব্যের প্রাণ। এই ধ্বনিকে সহৃদয় ব্যক্তিগণ প্রশংসা করে থাকেন যা কাব্যের আত্মারূপে বর্তমান। *অর্থঃ সহৃদয়শ্লাঘ্যঃ কাব্যাত্মা যো ব্যবস্থিতঃ।*[১৫]। কাব্যের যে অংশ সহৃদয়ের হৃদয়কে ব্যাকুল করে তাই ধ্বনি। যে বাক্যের মধ্যে ধ্বনির প্রাধান্য থাকে তা রসসিঞ্চিত হতে পারে, ধ্বনির প্রাধান্যবিহীন কাব্য উৎকৃষ্ট কাব্য নয়, তখন তা তৃতীয়স্তরের চিত্রকাব্যে পরিণত হয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ নিজের শক্যার্থকে পরিত্যাগ করে প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, এমন যে কাব্যবিশেষে তাকেই ধ্বনি বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।

আনন্দবর্ধনের মতে *যত্র শব্দো'র্থ বা উপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ বাঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সুরিভিঃ কথিতঃ।*[১৬] কবি যখন কাব্যের মধ্যে ব্যঙ্গ অর্থের প্রাধান্য

প্রকট করে তোলেন এবং অভিধেয়ার্থকে গৌণ বলে প্রতিপন্ন করেন তখন তাকে ধ্বনি বলা হয়। আনন্দবর্ধন ধ্বনিকে লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন - *লাবণ্যমিব অঙ্গনাসু* [১৭]। লাবণ্য হচ্ছে সামঞ্জস্যপূর্ণ লবণের ভাব বা ব্যঞ্জনাকে সুস্বাদু করে তোলে। ধ্বনিও আমাদের মধ্যে ভাষাকে সুষমরূপে পরিবেশন করে, তাই তা লাবণ্যযুক্ত। লবণের ভাব যেমন সুস্বাদের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু কোন অবয়বে থাকে তা প্রত্যক্ষগোচর হয় না, ঠিক তেমনি ধ্বনিকে উপলব্ধি করা যায় কিন্তু বাক্যের কোন অবয়বে তা বিদ্যমান তা বোঝা যায় না। তাই ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। রসধ্বনিই হল শ্রেষ্ঠ ধ্বনি। রস সবসময়ই ব্যঙ্গ হয়, বাচ্য হয় না। প্রতীয়মান অর্থের জন্যই রসোৎপত্তি ঘটে থাকে।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ রস, রীতি, ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করেছেন। মূলতঃ ভিন্ন ভিন্ন এই তত্ত্বসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় যে কাব্য রচনায় এই তিনটি তত্ত্বেরও প্রয়োজন আবশ্যিক। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলংকারিক তাঁদের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করলেও এই তিনটি তত্ত্ব যে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ তা সহজেই অনুমেয়। কেবল ভিন্ন দৃষ্টিকোন দিয়ে এই সব তত্ত্বের আভাস দিয়েছেন আলঙ্কারিকগণ।

সংস্কৃত আলংকারিকগণ নান্দনিক তত্ত্বগুলোকে শুধুমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রে (Literary art) প্রয়োগের কথা ভেবেছেন, তবুও একথা আমাদের ধরে নিতে হবে যা কিছু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা অনান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কাব্যের আনন্দের মধ্যে এই রস, রীতি, ধ্বনির তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তেমনি শিল্পকলার আনন্দের মধ্যে ঐ একই তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য থেকে দর্শকের মনে যে আনন্দ অনুভূতি ঘটে থাকে তেমনি চিত্র-ভাস্কর্যের দর্শকের মনেও অনুরূপ অনুভূতি ঘটে থাকে। লোকত্তর আনন্দ সমস্ত শিল্পেই বর্তমান। তাই কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র, ভাস্কর্য - সমস্ত শিল্প থেকে উদ্ভুত আনন্দ এক লোকোত্তর আনন্দের অংশীদার করে।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন আলংকারিক নান্দনিক তত্ত্বগুলি নিয়ে ভেবেছেন। কাব্যের প্রাণ কি হতে পারে - এই খোঁজ তাদের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে চলেছে, এই চলার পথে কখনো কখনো এক একটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কখনো রস, কখনো রীতি কখনো বা ধ্বনি কাব্যের প্রাণ বা আত্মা রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আলঙ্কারিকগণ এক এক সময় এক একটি তত্ত্বকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তত্ত্বগুলি আলঙ্কারিকদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে কাব্যের সৌন্দর্য রচনায় তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে তাই তত্ত্বকথার খোঁজ চলেছে। সর্বোপরি এই তত্ত্বগুলো সাহিত্য ও শিল্পকলা উভয়ক্ষেত্রকে কিভাবে প্রভাবিত করে চলেছে সেই বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে একাধারে রস, রীতি, ধ্বনি কিভাবে উৎকর্ষতা দান করেছে আবার প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে তাই এই গবেষণাপত্রের অনুসন্ধেয় বিষয়। একজন ঔৎসুক গবেষকের দৃষ্টিতে এই খোঁজ চলেছে, তারই ফলশ্রুতি পরবর্তী অধ্যায়গুলি।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,* ৩১৯.৪।

২। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ৫৯।

৩। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ২.৭।

৪। *অগ্নিপুরাণ,* ৩.৮।

৫। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ৫৯।

৬। *কাব্যপ্রকাশ,* ১.২।

৭। *রসগঙ্গাধর,* ১ম আনন।

৮। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১

৯। *ধ্বন্যালোক,* ১.১৫।

১০। *ধ্বন্যালোক,* লোচন, কপ্পুস্বামী (সম্পা.), মাদ্রাজ, ১৯৪৬।

১১। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

১২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

১৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৭।

১৪। *ধ্বন্যালোক,* ১.১।

১৫। *ধ্বন্যালোক,* কারিকা ১.২।

১৬। *ধ্বন্যালোক,* কারিকা ১.১৩।

১৭। *ধ্বন্যালোক,* কারিকা ১.৩।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সাহিত্য ও শিল্পকলা - সমাজের দর্পণ, যা প্রাত্যহিক জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে মানুষ নিজেকে নতুন করে অবিষ্কার করেছে।

সাহিত্য ও শিল্পকলা উভয়ের উৎস একটি ছন্দোবদ্ধ কল্পনার জগৎ, যাদের আন্তরছন্দ রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র সম্মত তত্ত্বসমূহের দ্বারা প্রকাশমান। তাই গবেষণা পত্রের অনুসন্ধেয় বিষয় —

"রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক)।"

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে গবেষণার প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ নাট্যসাহিত্য বা দৃশ্যকাব্য হল সব ধরণের জ্ঞান, সব ধরণের শিল্প, সব ধরণের কলা, যোগ ও সর্ব কর্মের মিলনস্থল। এই প্রসঙ্গে আচার্য ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন —

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পং ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
নাস যোগো, ন তৎকর্ম নাট্যে'স্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।।[১]

মনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য নাট্যের উৎপত্তি এবং এমন কোন বিষয় নেই যা নাট্যসাহিত্যে নেই। বিভিন্ন কলাবিদ্যার প্রয়োগ নাট্যসাহিত্যেই মধ্যেই পাওয়া যায়। নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলেখ্য এগুল নাট্যের প্রধান অঙ্গ।

নাট্যসাহিত্য একটি সম্পূর্ণ মাধ্যম যেখানে বাৎস্যায়ন কথিত চৌষট্টি কলার মিলনস্থল। তাই নাট্যের মধ্যে চৌষট্টি কলার অন্তর্গত নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলেখ্য প্রভৃতি কলাগুলির একত্র সমাবেশ ঘটে।

অভ্যাসযোজ্যাংশ্চ চাতুঃষষ্টিকান্ যোগান্ কন্যা রহস্যেকাকিন্যভ্যসেৎ।
গীতম্, নৃত্যম্, বাদ্যম্, আলেখ্যম্ ....।[২]

'আলেখ্য' শব্দের অর্থ 'চিত্রকলা'। নৃত্যের সঙ্গে নাট্যের অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যের যেমন প্রত্যক্ষ যোগ আছে, তেমনি চিত্রের সঙ্গেও নৃত্যের অন্তরঙ্গ যোগ রয়েছে। নৃত্যে যে সব দৃষ্টি, ভাব, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভঙ্গী, করমুদ্রা প্রভৃতি থাকে, সেগুলি চিত্রেও থাকবে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* বলা হয়েছে —

বিনা তু নৃত্তশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্।[৩]

চিত্র কিভাবে নাট্যের অনুশাসনগুলির ওপর প্রতিষ্ঠিত তা *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* বলা হয়েছে —

যথা নৃত্তে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টযশ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্বশঃ।।
করাশ্চ যে মতা নৃত্তে পূর্বোক্তা নৃপসত্তম।
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্তং চিত্রং পরং স্মৃতম্।।[৪]

এছাড়াও বাৎস্যায়নের *কামসূত্রে* নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলেখ্য (চিত্রশিল্প) প্রভৃতি বিষয়গুলিকে একই তালিকাভুক্ত করে চৌষট্টি কলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। যেখানে নৃত্য ও চিত্রের সহাবস্থান দেখা যায়।[৫] এছাড়াও নৃত্য, গীত, বাদ্য, আলেখ্য - এই চারটি বিষয় প্রাচীন ভারতে গন্ধর্বশাস্ত্রে ও শিল্পশাস্ত্রে বিশেষরূপে বিবৃত হয়েছে।

দৃশ্যকাব্য বা নাট্যসাহিত্য যেহেতু কাব্যেরই অন্তর্গত একটি বিভাগ বিশেষ, সুতরাং

কাব্যস্থিত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বিষয়গুলি নাট্যসাহিত্যে থাকাটাই স্বাভাবিক। যেহেতু *বাক্যং রসাত্মকংকাব্যং*[৬] তাই দৃশ্যকাব্য বা নাট্যসাহিত্য হল রসাভিমুখী। এই কাব্যস্থিত রসকে পরিস্ফুট করে রীতি এবং ব্যঞ্জনা। সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত বিষয়সমূহের দ্বারা নাট্যসাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করে। এক্ষেত্রে শিল্পকলা ও নাট্যসাহিত্য উভয়ের ক্ষেত্রেই অন্যতম আকর হল ভরতমুনি প্রণীত *নাট্যশাস্ত্র।* শিল্পকলার জগৎ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সেখানেও সাহিত্যের মতোই রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রীয় বিষয়সমূহ শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে। যদিও সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পূর্ণ আলাদা দুটি মাধ্যম, তবুও রস, রীতি, ধ্বনি - উভয়ক্ষেত্রটিতেই বিকশিত হয়েছে। বলা যেতে পারে সাহিত্য ও শিল্পকলা উভয়ের মধ্যে - সূক্ষ্ম যোগসূত্র রয়েছে।

নাট্যের বিষয়বস্তুগত রস আমরা শ্রবণ ও দর্শনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করি, সেইমতো রীতি ও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাও উপলব্ধির মধ্যদিয়ে অনূভূত হয়। আবার শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ রস আমরা দর্শনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করি। সুতরাং শিল্পকলা রসাভিমুখী, আর এই শিল্পস্থিত রসকে পরিস্ফুট করে রীতি এবং ব্যঞ্জনা। সুতরাং শিল্পকলা ও নাট্যসাহিত্যে রস, রীতি ও ধ্বনির প্রয়োগ খুব স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে ঘটেছে বলে মনে হয়েছে।

গবেষণাপত্রে আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, নাট্যসাহিত্য ও শিল্পকলার রস, রীতি, ধ্বনির পারস্পরিক সংযোগ রয়েছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রধান তিনটি তত্ত্ব - রস, রীতি, ধ্বনি যেমন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষসাধন করেছে, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকেও সুসমৃদ্ধ করেছে — যা অনুসন্ধান করাই আমার গবেষণাপত্রের উদ্দেশ্য।

অর্থাৎ অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত রস, রীতি, ধ্বনির পারস্পরিক সংযোগ দৃশ্যকাব্যের মতো শিল্পকলাতেও আন্তরছন্দে বিকশিত হয়ে ওঠে কিনা - তাই এই গবেষণাপত্রের অনুসন্ধেয় বিষয়।

উপলব্ধ আকরসমূহের পর্যালোচনা ঃ

সাহিত্য ক্ষেত্রে বিচরণ করে গবেষণার বিষয় সম্পর্কিত অনান্য সন্দর্ভপাঠ ও অনুসন্ধান করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় —

এক্ষেত্রে প্রথম যে গ্রন্থটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় তা হল – C. Sivaramamurti –এর লেখা *Sanskrit LIterature and Art : Mirrors of Indian Culture* (New Delhi, 1970)। এই গ্রন্থে সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। সাহিত্যের নিরীখে শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে বিচার করা হয়েছে। ভারতীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট কবিদের কাব্য থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছে যা খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি বহন করে এই গ্রন্থ। কবি কালিদাসের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থে, তার সঙ্গে শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে বিচার করা হয়েছে যুক্তি সঙ্গতভাবে। কিন্তু এই গ্রন্থের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পকলার আভ্যন্তরীণ যোগসূত্রটা ঠিক কোথায় সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে লেখক বক্তব্য উল্লেখ করেননি। শিল্প ও সাহিত্যের অন্তরঙ্গ বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকলেও এখানে মূল সৌন্দর্যশাস্ত্রের আলংকারিক তত্ত্বগুলি অনুপস্থিত। কোন তত্ত্বগুলির ওপর নির্ভর করে সাহিত্য ও শিল্পকলা এক জায়গায় এসে মিলিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা গ্রন্থকার করেন নি। এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে বহু প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে যা আমার গবেষণার পথটিকে প্রশস্ত করেছে।

অপর একটি গ্রন্থ Stella Kramrich –এর লেখা *Viṣṇudharmottoram : A Treatise of Indian Painting* (Bombay, 1912)। গ্রন্থটিতে শিল্পকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে বিশেষতঃ 'চিত্রসূত্রম্' ও 'প্রতিমালক্ষণম্' অধ্যায়ে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বহু নিয়মনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ –এর তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের বহু নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করেছেন তৎকালীন মুনিঋষিগণ। Stella Kramrich তাঁর সম্পাদনায় এই গ্রন্থটিতে সেইসব নিয়মনীতি ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। এটিকে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার এক শাস্ত্রগ্রন্থ বলা হয়। গ্রন্থটি থেকে ভাস্কর্যমূর্তি রচনার নিয়মকানুনগুলি সুন্দরভাবে ঋষি ব্যক্ত করেছেন। তাল, মান বিষয় নিয়ে গ্রন্থটিতে

আলোচিত হয়েছে। চিত্রসূত্রের ক্ষেত্রে কোন কোন নিয়ম মেনে চিত্ররচনা করতে হবে তাও বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি শিল্পকলার একটি আকর গ্রন্থ বিশেষ। কিন্তু এই গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে, গ্রন্থকার সাহিত্য ও শিল্প নিয়ে কোন মত প্রকাশ করেননি। গ্রন্থে কোথাও বলা হয়নি যে শিল্পকলা সাহিত্য নির্ভর। সাহিত্যকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য - একথা কোথাও বলা হয় নি। শিল্পের ভিত্তি যে সাহিত্য এবং তাদের আভ্যন্তরীণ তত্ত্বগুলির কথাও উল্লিখিত হয়নি - কিসের উপর দাঁড়িয়ে আছে সাহিত্য ও শিল্পকলার সম্পর্কের ভিত্তি তারও স্পষ্ট কোনও উল্লেখ নেই এই গ্রন্থে। তাই নানা প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে এই গবেষণাপত্র রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছি।

অপর একটি গ্রন্থপাঠ আমাকে এই গবেষণপত্র রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে তা হল Kapila Vatsyayan -এর লেখা *Classical Indian Dance in Indian Literature and the Arts* (New Delhi, 2007)। এই গ্রন্থে ধ্রুপদী নৃত্য ভারতীয় সাহিত্য ও শিল্পকলায় কিভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। নৃত্যের প্রভাব যে সাহিত্য ও শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে এ গ্রন্থ তারই পরিচয়বাহী। গ্রন্থটিতে নৃত্যের সঙ্গে শিল্পকলার আন্তরসম্পর্ক রয়েছে। নৃত্যের সঙ্গে চিত্রের সম্পর্ক সেই প্রাচীন কাল থেকেই, ধ্রুপদী নৃত্যকলা ধ্রুপদী শিল্পের নির্মাণের আকরস্বরূপ - এ গ্রন্থ এই তথ্য প্রদান করেছে। কিন্তু গ্রন্থে চিত্র ও নৃত্যের আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক বিষয়ে বিশদে কোথাও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে তাই একাধিক প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে, যার ফল স্বরূপ এই গবেষণাপত্র। মূলতঃ এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে শিল্পকলা ও সাহিত্যের মূল ভিত্তি কি? শিল্প ও সাহিত্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব কিসের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত? শিল্প ও সাহিত্যের আন্তরছন্দ যে রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতি অলংকারতত্ত্বগুলি যে বিষয়ে প্রাথমিক একটি ধারণা তৈরী হয়েছে উক্ত গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে।

আরেকটি গ্রন্থের কথা বিশেষ বলা প্রয়োজন, তা হল C. Sivaramamurti -এর লেখা *Sources of History Illumined by Literature* (New Delhi, 1979)। এই গ্রন্থে সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে ব্যাখ্যা করেছেন গ্রন্থকার। সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে শিল্পকলা সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠেছে এই তথ্যটিই এই গ্রন্থে তুলে

ধরা হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য, নাটক কিভাবে ভারতীয় শিল্পকলার বিকাশে সহায়তা করেছে, কোন নাটকে শিল্পকলার প্রসঙ্গ উত্থিত হয়েছে, সংস্কৃতকাব্যে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রসঙ্গ কিভাবে এসেছে তা এই গ্রন্থে বিশদে আলোচিত হয়েছে। তাই এই গ্রন্থ পাঠ করে গবেষণার প্রাথমিক ধারণাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি। গ্রন্থপাঠ করার সময় নানান প্রশ্ন মনে উদয় হয়েছে। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সক্ষম হয়েছি আমার গবেষণাপত্রে। আমার গবেষণার মূল বিষয় - রস, রীতি, ধ্বনি সম্পর্কিত কোনও তথ্য এই গ্রন্থে না থাকলেও মোটামুটিভাবে একটি ধারণার সন্ধান পেয়েছি, যা আমার গবেষণার বিষয়টিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

আরেকটি গ্রন্থ হল বরেন্দ্রনাথ নিয়োগীর লেখা — *অজন্তা চিত্রদর্শন* (কোলকাতা, ১৯৯৯)। গ্রন্থটিতে আজন্তা চিত্রকলার প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচিত হয়েছে। অজন্তা চিত্রকলা গড়ে ওঠার পিছনে যে জাতকের ভিন্ন কাহিনী রয়েছে, তা গ্রন্থটিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। লেখক এই গ্রন্থে সাহিত্য নির্ভর শিল্পকলার কথা আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থ আমাকে একথা ভাবতে উৎসাহিত করেছে যে, সাহিত্যের বিষয় নিয়ে শিল্পকলা নির্মিত হতে পারে। জাতকের কাহিনীগুলি যেমন অজন্তা গুহাচিত্রের আকর স্বরূপ, তেমনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত কবিদের কাব্য, নাটক, প্রভৃতি গুপ্তযুগীয় চিত্রকলা ও ভাস্কর্য আকরস্বরূপ। সংস্কৃত একাধিক নাট্যসাহিত্য যথা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্শীয়, ভবভূতির উত্তরামচরিতম্, মালতীমাধব-এ দেখা যায় নায়ক-নায়িকারা পরস্পরের চিত্রাঙ্কণ করছেন। আবার সংস্কৃত কাব্য নাটকে যেখানে শিব-পার্বতীর বর্ণনা করা হয়েছে, অনুরূপ ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে তৎকালীন শিল্পকলায়। তাই অজন্তা চিত্রকলার পেছনে যে বৌদ্ধ সাহিত্য প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা এই গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু এই গ্রন্থে চিত্রকলা যে সাহিত্য নির্ভর - এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও, কোথাও বলা হয়নি যে সাহিত্যের মূল বিষয়গুলি রস, রীতি, ধ্বনি - এগুলিই সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্য নির্মাণ করেছেন। এই তত্ত্বকথৌর অভাব উপলব্ধি করে আমার গবেষণাপত্রে এই তত্ত্বই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি যে সাহিত্য ও শিল্পকলা রস, রীতি ও ধ্বনি প্রভৃতি অলংকার তত্ত্বনির্ভর।

অজন্তা গুহাচিত্রের প্রেক্ষাপটে রচিত অপর একটি শিল্পগ্রন্থ হল - G. Yazdani-এর *Ajanta : The colour and Monochrome Reproductions of the Ajanta Frescoes based on Photography* (Oxford University Press, London, 1930) । এই বইটিতে অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিটি ভিত্তিচিত্রের নিখুঁত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। জাতকের গল্প অনুযায়ী যে চিত্রগুলি অঙ্কণ করেছেন অজন্তার শিল্পী সে বিষয়ে বহু আলোচনা আছে। বিশেষতঃ শিবিজাতক, শঙ্খপাল জাতক, মহাজনকজাতক, চাম্পেয় জাতক - এগুলির কাহিনীর সঙ্গে যে চিত্রের হুবহু সাদৃশ্য বর্তমান, তা লেখক তথ্যনির্ভর নিবন্ধ রচনা করেছেন। জাতকে যে যে ভাবে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে অজন্তার চিত্রশিল্পী সেভাবেই চিত্রগুলির নিখুঁত রূপ অঙ্কণ করেছেন। এছাড়াও বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির চিত্র বিষয়ক আলোচনা বিশদে করেছেন লেখক। গ্রন্থটির প্রথমভাগে রয়েছে বিস্তারিত বিবরণ এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে তার চিত্রগুলি। চিত্রঅনুযায়ী বর্ণনা করেছেন লেখক। যেমন ধরা যাক - 'বোধিসত্ত্বপদ্মপাণি' বিষয়ক চিত্রটিতে যে যে বিষয়ক তথ্যাবলী লেখক তুলে ধরেছেন তা হল - বোধিসত্ত্বের দেহাবয়ব নির্মিত হয়েছে মহাপুরুষের লক্ষণকে সামনে রেখে। শালপ্রাংশু মহাভুজ সদৃশ দেহাবয়ব যা উচ্চবংশজাত বলে প্রমাণ করে। উন্নত প্রশস্ত বক্ষরাজি তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছে। দেহাবয়ব সহ তার মুখের ভঙ্গীতে ব্যঞ্জিত হয়েছে করুণাঘন দৃষ্টি, যা জগতকে রক্ষা করবে, হস্তে ধৃত পদ্ম যা ধ্বনিত করেছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীককে। লেখক কোথাও স্পষ্টভাবে এই ভিত্তিচিত্রের রস, রীতি, ধ্বনি পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। অথচ এই চিত্রটির মধ্যে রস, রীতি, ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ স্পষ্ট। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির চিহ্নগুলি খুব স্পষ্টভাবে ধরা হয়েছে চিত্রটির মধ্যে। বাৎসায়ণের কামসূত্রে বর্ণিত চিত্রকলার ষড়ঙ্গের বৈশিষ্ট্যগুলিও স্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে। অজন্তা চিত্ররীতিতে যে যে শিল্পশৈলী দেখা যায় তাও এই চিত্রে বর্তমান। অথচ কোথাও রীতি বা শৈলীগত তথ্য গ্রন্থকার প্রেরণ করেননি। রসের কথাও পৃথকভাবে উল্লিখিত হয়নি। আমার মনে হয়েছে এটিও গবেষণার একটি দিকদর্শন হতে পারে যে রস, রীতি, ধ্বনির দ্বারা কিভাবে এই চিত্রটিকে আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এই গ্রন্থপাঠের মধ্য দিয়ে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি রস, রীতি, ধ্বনি - এই অলঙ্কার তত্ত্বগুলির প্রয়োগ কিভাবে শিল্পকলাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার অনুসন্ধানে।

অপর একটি গ্রন্থ যা আমাকে এই গবেষণাপত্র রচনায় অনুপ্রাণিত করেছে তা বাংলা ভাষায় রচিত বিখ্যাত চিত্রকর অসিত কুমার হালদারের *অজন্তা* (কলকাতা, ২০১০) গ্রন্থটি। এই চিত্রকর প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার স্বরূপ বিশেষতঃ অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকৃতি অঙ্কণ করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি হল প্রকৃত শিল্পীর চোখে অজন্তা চিত্রদর্শনের অভিজ্ঞতা যা শিল্পের কদর বাড়িয়ে দেয়। শিল্পী স্বয়ং চিত্রগুলির অনুকৃতি রচনার সময় সেইসব চিত্রের হুবহু বর্ণনা তুলে ধরেছেন তাঁর গ্রন্থে। কেবল চিত্রকলা নয়, ভাস্কর্যের স্বরূপও স্পষ্ট এ গ্রন্থে। এই গ্রন্থে চিত্রগুলির আভ্যন্তরীণ রস, রীতি বা ধ্বনির আলোচনার অভাববোধই আমাকে এই গবেষণাপত্র লেখায় উৎসাহিত করেছে। এই গ্রন্থে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির তথ্য আলোচনার দিকটির কোনো হদিস পাওয়া যায় না।

শিল্পকলা বিষয়ক একটি গ্রন্থ E. B. Havell এর লেখা *The Art Heritage of India : Comprising Indian Sculpture and Painting and Ideals of Indian Art* (Bombay, D. B. Taraporavala Sons & Co. Private Ltd., 1965)। এই গ্রন্থের Indian Mural Painting অধ্যায়ে সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন গ্রন্থকার। তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন, যেখানে চিত্রাঙ্কণের প্রসঙ্গ এসেছে। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে যে রাজা অগ্নিমিত্র নায়িকা মালবিকার প্রতিকৃতি অঙ্কণ করেছিলেন চিত্রশালায় তা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। কবি কালিদাসের অপর নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্ক জুড়ে রয়েছে চিত্রাঙ্কণের কথা। সেখানে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতিকৃতি অঙ্কণ করছেন। তাঁর বর্ণনা গ্রন্থকার বিস্তারিত করেছেন। এছাড়াও সমগ্র নাটকটি যেন একটা চিত্রশালায় প্রদর্শিত চিত্রের সঙ্গে তুলনীয়। এর সঙ্গে এসেছে অজন্তা চিত্রকলার প্রসঙ্গ। বৌদ্ধসাহিত্য যে অজন্তা চিত্রকলা গড়ে ওঠার অন্যতম প্রধান আকর সেকথা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্রাঙ্কণের প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন - অজন্তার চিত্রাঙ্কণ পর্ব তৎকালীন শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে। এই শিল্পশাস্ত্রের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে সাহিত্য

তৎকালীন শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছিল। সাহিত্য ছাড়া শিল্পকলা গড়ে ওঠা সম্ভব ছিল না। সাহিত্য ও শিল্পকলার সম্পর্কটি গ্রন্থকার বিশদে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর গ্রন্থে।

C. Sivaramamurti-এর লেখা - *Sculpture inspired by Kālidāsa* (Madras, 1942) — এই গ্রন্থটি সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, যা গবেষণকার্যে বিশেষ সহায়তা করেছেন। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যজগতের বিখ্যাত কবি যাঁকে শিল্পী কবিও বলা যায়। তৎকালীন চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর কালিদাসের কাব্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন। কালিদাসের বিখ্যাত কাব্য মেঘদূতের যক্ষের বর্ণনা অনুযায়ী প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার নির্মিত হয়েছে যক্ষের ভাস্কর্য মূর্তি। যক্ষ ও যক্ষিনী মূর্তি প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পে বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় মূর্তি যা মৌর্য, সুঙ্গ, সাতবাহন যুগের শিল্পকলায় এর দেখা মেলে। কল্পবল্লী নামক ভাস্কর্যমূর্তি সাঁচীর রেলিং-এ দেখা মেলে, সাহিত্যে যার ভূমিকা বৃক্ষে পদস্পর্শ করে পুষ্প প্রস্ফুটিত করা। কালিদাস তাঁর মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে এইরূপ কল্পবল্লীর উল্লেখ করেছেন যা যক্ষিনীর একরূপ। আর আছে কল্পবৃক্ষের বর্ণনা যা কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল দৃশ্যকাব্যের ৬ষ্ঠ অঙ্কে দেখা যায়, একই সাথে ভাস্কর্যেও এই কাহিনীরূপ ব্যক্ত হয়।

ক্ষৌমং কেনচিদিন্দুপাণ্ডু তরুণা মাঙ্গল্যমাবিষ্কৃতং
নিষ্ঠ্যূতশ্চরণোপভোগসুলভো লাক্ষারসঃ কেনচিৎ।
অন্যেভ্যো বনদেবতাকরতলৈরাপর্বভাগোত্থিতৈ-
র্দত্তান্যাভরণানি তৎকিসলয়োদ্ভেদপ্রতিদ্বন্দ্বিভিঃ।।[৭]

এই কল্পবৃক্ষ এবং কল্পবল্লীর ভাস্কর্য দেখা যায় ভারহুতের ভাস্কর্যে। কালিদাসের মেঘদূতের বিখ্যাত শ্লোক —

হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননেশ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারু কর্ণে শিরীষং
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্।।[৮]

অজন্তা গুহাচিত্রে এইরূপ বর্ণনার প্রতিরূপ অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে নারীর কর্ণভূষণ শিরীষফুল।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যে যক্ষ, কিন্নর এদের যে কাব্যিক বর্ণনা পাই পাশাপাশি অজন্তা চিত্রকলায় এদের উল্লেখ পাই। এছাড়াও সাঁচীস্তূপের তোরণে এরকম রিলিফ দেখা যায়। এছাড়াও অজন্তা গুহাচিত্রের মধুপানের দৃশ্যটির কাব্যিক বর্ণনা রঘুবংশে পাই। মেঘদূত কাব্যে যেভাবে যক্ষীর বর্ণনা করেছেন কবি কালিদাস তা কুষাণযুগের যক্ষিনী মূর্তি ভাস্কর্যের অনুরূপ। তোরণশালভঞ্জিকা - সাঁচীস্তূপের তোরণে যে ভাস্কর্য মূর্তির দেখা মেলে তাও মেঘদূতে বর্ণিত যক্ষিনীর রূপ বর্ণনার অনুরূপ। এলিফ্যান্টা ও ইলোরার ভাস্কর্য মূর্তিগুলি কালিদাসের বর্ণনার হুবহু মূর্তি ভাস্কর্য। বাদামীর নৃত্যরতা শিবের মূর্তি ভাস্কর্য যা কালিদাসের বর্ণনাতে দেখা যায়। এই গ্রন্থটি গবেষণাকার্যের অনুপ্রেরণা স্বরূপ। এই গ্রন্থে রস, রীতি, ধ্বনির প্রসঙ্গটি কোথাও আলোচিত হয়নি, তাই এই গবেষণাপত্রে মৌলিক তথ্য রূপে আলোচিত হয়েছে।

রঘুনাথ ঘোষ - এর লেখা, *‘শিল্প, সত্তা ও যুক্তি’* (কলকাতা, ২০১০) গ্রন্থটিতে *‘শিল্প ও লোকোত্তর আনন্দ’* শীর্ষক অধ্যায়ে শিল্পকলা ও সাহিত্যের সম্পর্কের চিত্রটি পরিস্ফুট হয়েছে। গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, নৃত্যকলা আমাদের এক লোকোত্তর আনন্দের সন্ধান দেয়। এই আনন্দ থেকে রসের সঞ্চার হয়। কাব্যের রসাস্বাদনের জন্য একাত্মতা খুবই প্রয়োজন। এই একাত্মতা থাকে বলেই ব্যক্তিগত কোন অনুভব নৈর্ব্যক্তিক অনুভবে পরিণত হয়, ফলে সেই অনুভবকে উপভোগ করে লোকোত্তর আনন্দ লাভ হয়। সাহিত্যে রস, রীতি, ধ্বনি, অলঙ্কার প্রভৃতি যে কাব্যের অঙ্গ এবং কাব্যের আত্মা নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সকলেই মনে করেন যে বাক্য রসনিষ্ণাত হলেই তা সার্থক কাব্য বা সাহিত্যের মর্যাদা পায়। বামনের রীতিবাদ, আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ এবং ভরতের রসবাদী ভাবনাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের জন্ম হয়েছে, তা পাঠ করে সহৃদয় পাঠক আনন্দলাভ করে থাকেন। গ্রন্থে লেখক বলেছেন - যদিও সংস্কৃত আলংকারিকগণ নান্দনিক তত্ত্বগুলোকে শুধুমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রে বা literary art-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা ভেবেছেন, তবুও একথা আমাদের ধরে নিতে হবে যে

যা কিছু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা অনান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন সহৃদয়ত্বের ধারণা শুধুমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক তা নয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, নৃত্যের ক্ষেত্রে ও চিত্রের ক্ষেত্রেও তা বিদ্যমান। লেখক আরও বলেছেন যে, শিল্পের মধ্যে রস আছে বলেই তা আনন্দের সন্ধান দেয়। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের মতে শিল্পকর্মে রস সবসময় ব্যঞ্জিত হয়, আর শিল্প ব্যঞ্জনার দ্বারা রসকে সূচিত করে। এই গ্রন্থটি গবেষণালব্ধ বিষয়টিকে নির্বাচন করতে সহযোগিতা করেছে, সর্বোপরি রস, রীতি, ধ্বনি - এই অলংকারতত্ত্বগুলি যে সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকেও সমৃদ্ধ করে তুলেছে আলোচ্য গ্রন্থটি সেই ভাবনায় ভাবিত হতে সহায়তা করেছে।

শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ করে গবেষণা সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। যে প্রশ্নগুলির উত্তর অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ এই নিবন্ধপত্র রচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থগুলির তথ্যাবলী নতুন করে ভাবিয়েছে, চোখের সম্মুখে মেলে ধরেছে তথ্যভাণ্ডার। যে তথ্যভাণ্ডার আবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে, এই প্রশ্নগুলি যদি মনে উদয় না হতো, তাহলে তার উত্তর খোঁজার তাগিদ অনুভব হতো না। একমাত্র উত্তর খোঁজার আগ্রহ থেকেই এই নিবন্ধ পত্র রচিত হয়েছে। এইসব গ্রন্থাবলীর কাছে ঋণস্বীকার করা হল, না হলে এই গবেষণাপত্র বাস্তবায়িত হতো না।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে - *ওঁ শিল্পানি সংসন্তি। দেবশিল্পন্যেতেষাং বৈ শিল্পানমনুকৃতী'শিল্পমধিগম্যতে - হস্তী কংসোবাসো হিরণ্যমশ্বতরীরথঃ শিল্পম্।*[৯] শিল্প সৃজনের মাধ্যমেই শিল্পীরা বিশ্বশিল্পীর স্তব করে চলেছেন। কবিরা কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে চলেছে সত্যকে। কবিদের মতো কাব্যতাত্ত্বিকরাও খুঁজে চলেছেন অজানাকে, যুগ যুগ ধরে শিল্পের অন্তঃরহস্যকে, সৌন্দর্যের অতীন্দ্রিয়তাকে। খ্রিষ্টপূর্ব যুগে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র দিয়ে শুরু হয়েছিল এই পথচলা। এর আগেও অবশ্য সহস্রাক্ষ, পুলস্ত, নন্দিকেশ্বর, উপমন্যু প্রমুখ সৌন্দর্যের সন্ধান করেছেন।[১০] ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে ভামহ, বামন, আনন্দবর্ধন, কুন্তক, অভিনবগুপ্ত ও বিশ্বনাথের তত্ত্বকথা কবিদের পথ দেখিয়েছে। অলংঙ্কারশাস্ত্রমতে একদিকে যেমন কবিরা সার্থক কাব্যরচনার মাধ্যমে সহৃদয় পাঠকের মনে আনন্দসঞ্চার করেছেন তেমনি শিল্পীরা সৌন্দর্যশাস্ত্রানুযায়ী শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে সহৃদয় দর্শকমনে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। প্রতীচ্যের মতো প্রাচ্যে মূলতঃ প্রাচীন ভারতে এই

সৌন্দর্য নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় অলংঙ্কারশাস্ত্রগুলি হল সৌন্দর্যশাস্ত্র, ইংরেজীতে যাকে বলে Aesthetic of Poetry। আচার্য বামনের মতে *কাব্যংগ্রাহ্যমলঙ্কারাৎ,*[১১] *সৌন্দর্যমলঙ্কারঃ*।[১২] অর্থাৎ, কাব্যের সৌন্দর্যই অলঙ্কার, সৌন্দর্য আছে বলেই কাব্য সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়। আচার্য বামন 'রীতি'কে কাব্যসৌন্দর্যের মূল শক্তি বলেছেন। কাব্যের আত্মাকে রীতি নাম দিয়ে আচার্য বামন বলেছেন কবিরা যখন পদ নিয়ে বাক্য তৈরী করেন, তখন বিশেষ ধরণের বিন্যাসে রীতির সৃষ্টি হয়। বিশেষ রীতিটি ফুটে ওঠে মূলতঃ গুণের জন্যই। কাব্যের সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে তিনি গুণকেই বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন, গুণকে নয়। *রীতিরাত্মা কাব্যস্য।* [১৩] কাব্যের দেহকে যদি পদরূপে চিহ্নিত করা হয়, তবে কাব্যরচনায় সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য তাতে যুক্ত করা হয় গুণাত্মক পদ। এই ধরণের পদে গুণ যুক্ত হলে তবেই রীতি সৃষ্টি হয়, তাহলে রীতির সৃষ্টি হচ্ছে পদে কাব্যগুণ যুক্ত করে রচনা করলে। কাব্য রচনার সঙ্গে গুণ যুক্ত হয়ে তবেই রীতি আসে। অর্থাৎ রীতির স্থানগুণের ওপরে, তাই আচার্য বামন রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। একাধিক গুণ কাব্য রচনায় মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় এক একটি নতুন রীতির, এই রীতিই হয়ে ওঠে কাব্যের আত্মাস্বরূপ। আচার্য বামনের কৃতিত্ব এখানেই, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কাব্যের এই অভিনব অন্তঃসৌন্দর্যকে, কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণ এটা ধরতে পারেননি।

এভাবে অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিবাদের উদ্ভব হয়েছে। ধ্বনিবাদীরা মূলতঃ ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত কাব্যের সৌন্দর্যসৃজনে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ভরতমুনি প্রোক্ত রসকে আচার্য বিশ্বনাথ কবিরাজ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর পাশাপাশি আচার্য ক্ষেমোন্দ্র ঔচিত্যকে ও আচার্য জগন্নাথ সৌন্দর্যবাচক রমণীয় শব্দকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। সুতরাং অলঙ্কার শব্দটিকে আলঙ্কারিকগণ ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছিলেন। অলঙ্কারকে তাঁরা বলেছেন সৌন্দর্যের স্বরূপ। এই অলঙ্কার বাইরের কোনও আরোপিত বস্তু নয়, তা কাব্যে আত্মভূত বা অঙ্গীভূত। কাব্য হল নান্দনিক নিদর্শন; ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে নাটকের উদ্দেশ্যস্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে পাঠকদের আনন্দদানের কথা বলেছেন।[১৪] আচার্য বামন বলেছেন - কাব্যের উদ্দেশ্য হল প্রীতি বা কীর্তি দান করা।[১৫] বামন প্রীতি শব্দের সমর্থক করেছেন আনন্দ। তাই কাব্যের মূখ্য উদ্দেশ্যই হল আনন্দদান।

খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকের আলঙ্কারিক আচার্য মম্মটও এই সত্যটি স্বীকার করেছেন। এই আনন্দ বিশুদ্ধ, শৈল্পিক ও নান্দনিক। এই আনন্দের মাধ্যমে পাঠকের আত্মোপলব্ধি ঘটে।

কাব্যং যশসে'র্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে।। [১৬]

অর্থাৎ, অনান্য কারণের সাথে সদ্য সমুদ্ভুত আনন্দ প্রাপ্তির জন্য কাব্যের প্রয়োজন হয়। আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে, যে শব্দার্থময় রচনা সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ বা চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে, তাই কাব্য।

সহৃদয়-হৃদয়াহ্লাদি শব্দার্থময়ত্বমেব কাব্য-লক্ষণম্। [১৭]

পাশ্চাত্য দার্শনিক *অ্যারিস্টটল* তাঁর *পোয়েটিক্স* গ্রন্থে কাব্যের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গে বলেছেন - কাব্যের উদ্দেশ্যই হল প্রকাশকে সুন্দর করে তোলা ও আনন্দ দান করা। [১৮]

দেখা যাচ্ছে, প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের সকল দার্শনিকই কাব্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আনন্দদানের প্রসঙ্গই বলেছেন। কাব্য পাঠ করে রসিক হৃদয়ে আনন্দদানই হল মুখ্য। এই আনন্দ নিশ্চিতরূপেই প্রকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রকাশে শুধু কাব্য সৃষ্টি হয় না, এই প্রকাশের মাধ্যমে কবি নিজেকে রসিকের হৃদয়েও প্রতিষ্ঠিত করতে চান। কাব্যের সার্থকতা শুধু কবির ভাবনার উপরই নয়, সহৃদয় রসিকের উপরেও নির্ভরশীল। সুতরাং কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্যই হল আনন্দ। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ আনন্দ শব্দটিকে হ্লাদ, নিবৃর্তি, আহ্লাদ, চমৎকার, রস, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

রসবাদী, ধ্বনিবাদী, অলঙ্কারবাদীরা কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য আনন্দদানের কথাই বলেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা রস, রীতি, ব্যঞ্জনা, অলঙ্কারকে বিষয় ধরেছেন। কাব্যের রসাস্বাদন হয়ে গেলে গৌণ উদ্দেশ্য সেখানেই অবস্থান করে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। আচার্য অভিনবগুপ্ত কাব্যরসের আস্বাদকে ঘন আনন্দস্বরূপ চেতনা বলেছেন। ব্রহ্মের আস্বাদ বা কাব্যের আস্বাদ মূলতঃ একই।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের আলঙ্কারিক আচার্য বামনই রীতিবাদের প্রথম প্রবক্তা। প্রাচ্য বা প্রতীচ্যের বিভিন্ন আলঙ্কারিকদের মতো তিনিই বলেছিলেন — সৌন্দর্য সৃজনের মধ্যেই কোনও কবির কাব্যভাবনা নিহিত, আর সেটা সম্ভব রীতি, অলঙ্কার ইত্যাদির সাহায্যে - একথা তিনি জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর মতে রীতিই কাব্যের আত্মা। *রীতিরাত্মা কাব্যস্য।* [১৯] এটা নিশ্চিতরূপেই কাব্যের একটা বড় গুণ। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তা আজও পথের দিশা হয়ে আছে। রীতিই হল কাব্যের মূল সুর বা আত্মা। রীতিকে বাদ দিয়ে কখনই কোনও কাব্য সার্থকতা লাভ করতে পারে না। এই রীতির উদ্ভব হয় গুণাত্মক পদ রচনার মধ্য দিয়ে। পাশ্চাত্য দার্শনিক প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে অনেকেই রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। যদিও পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞান (stylistics) ও রীতিবাদ সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয়। এই রীতির কথা ভারতবর্ষে প্রথম বলেছিলেন আচার্য বামন। তিনি তাঁর গ্রন্থের প্রথমদিকে বলেছেন যে, অলঙ্কারের জন্যই কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তৎকালীন আলঙ্কারিকগণ বহু শব্দালঙ্কারের কথা বললেও আচার্য বামন নির্দিষ্ট কোনও অলঙ্কারকেই বিশেষভাবে এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেছিলেন যে, কাব্য যার দ্বারা সৌন্দর্যে অন্বিত হয়, সেটাই হল অলঙ্কার। এর পরেই তিনি বলেন — *রীতিরাত্মা কাব্যস্য।* [২০] এর থেকে সহজেই অনুমেয়, রীতিকেও তিনি পরোক্ষভাবে অলঙ্কার বলে চিহ্নিত করেছিলেন। যথার্থ রীতি বা ভঙ্গি প্রয়োগে কাব্য গুণময় হয়ে ওঠে। বামন রীতিকে চিত্রশিল্পীর রেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন চিত্রশিল্পী যেমন রেখার সাহায্যে কোনও চিত্রকে পরিপূর্ণ করে বা রেখার সাহায্যে পরিপুষ্টি ঘটায়, ঠিক তেমনি রীতিও কাব্যে সামঞ্জস্য আনে। কাব্য সমগ্রতা পেয়ে সৌন্দর্যময় হয়।

এতাসু তিসৃসু রীতিসু রেখাস্বিত চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতামিতি [২১]

রেখাসমূহের মধ্যে যেমন চিত্র পরিলক্ষিত হয়, তেমনি বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী - এই তিনটি রীতির মধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয় কাব্য। এখানে চিত্রকলা ও রীতি একে অপরের পরিপূরক। রেখা যেমন কোনও ছবিকে প্রতিষ্ঠা করে, ঠিক তেমনি রীতির দ্বারাই কাব্য সৌন্দর্যলাভ করে। চিত্রে রেখার যে ভূমিকা, কাব্যে একই ভূমিকা পালন

করে অলঙ্কার এবং গুণ। যে কোনও চিত্র মূলতঃ রেখার ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে, কাব্যেও তেমনি গুণ এবং অলঙ্কার সৌন্দর্যবৃদ্ধি করে।

আচার্য বামনের রীতিবাদ ভাবনা বিশেষভাবে গ্রহনীয় এই জন্য, কারণ তিনিই প্রথম কাব্যের আত্মা নিয়ে ভেবেছেন। কাব্যের আত্মা সম্পর্কে তত্ত্ব লিখেছেন। এটি নিশ্চিতভাবেই কাব্যের অন্তরঙ্গ ভাবনা। আচার্য বামনের পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকগণ, ভামহ বা দণ্ডী কাব্য সম্পর্কে বহু কথা বললেও তাঁর কেউই কিন্তু কাব্যের আত্মিক দিক নিয়ে ভাবেননি। তাঁদের দৃষ্টি ছিল - কাব্যের বাইরের দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

আচার্য বামনের মতে, সমস্ত গদ্য ও পদ্যাত্মক কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সম্পূর্ণ হল - নাটক বা দৃশ্যকাব্য।

সন্দর্ভেষু দশরূপক শ্রেয়ঃ। [২২]

এই দশপ্রকার রূপক অর্থাৎ দৃশ্যকাব্য চিত্রপটের ন্যায় বিচিত্র।

তদ্ধি চিত্রং চিত্রপটবদ্বিশেষ সাকল্যাৎ। [২৩]

নিপুণ শিল্পীর দ্বারা অঙ্কিত চিত্রপট যেমন রেখা ও রঙের সাহায্যে ভাব ও রূপের সামঞ্জস্য বিধানহেতু জীবন্ত বলে দর্শকের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ নট কর্তৃক নিপুণ অভিনয়ের সাহায্যে নাট্যোপনিবদ্ধ বিষয়বস্তু সহৃদয় সামাজিকের দৃষ্টির সম্মুখে চিত্রপটের ন্যায় আবির্ভূত হয়। নিপুণ অভিনয়ের দ্বারা নাটকের বিষয়বস্তু দর্শকের নিকট প্রত্যক্ষ হয়, তাই সহৃদয় দর্শকগণ পরিস্ফুটরূপে রসের আস্বাদ পেয়ে থাকেন। এই জন্য সর্বপ্রকার কাব্যের মধ্যে নাটক প্রভৃতি দৃশ্যকাব্য শ্রেষ্ঠ।

কাব্যের প্রাণরূপ তিনি যেমন রীতিকে চিহ্নিত করেছেন, ঠিক তেমনই নাটকের প্রাণরূপে চিহ্নিত করেছেন - রসকে। রস সম্পর্কে আচার্য বামন কোন গভীর আলোচনা করেননি, কেবল কাব্যসমূহের মধ্যে দশরূপককে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে নাট্যরস সম্পর্কে তিনি দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন।

আচার্য অভিনবগুপ্ত আচার্য বামনের ঐ অভিমত উদ্ধৃত করে দশরূপকের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। তিনি বলেছেন - *কাব্যং তাবদ্ মুখ্যতো দশরূপকান্তমেব।* কাব্য বাস্তবপক্ষে দশরূপক বা নাটক সমূহের স্বভাব সম্পন্ন। কাব্য বস্তুতঃ নাট্যই। তাই *বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্* [২৪] বললে তা দৃশ্যকাব্য বা নাটকেও নির্দেশ করে থাকে। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন, আচার্য মম্মট, অভিনবগুপ্তের অভিমত সমর্থন করেছেন।

কাব্যতত্ত্ব বিষয়ে আচার্য বামনের সমস্ত আলোচনার মূলে দাঁড়িয়ে আছে রীতিবাদ। তিনি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে যেভাবে রীতিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা নিশ্চিতরূপেই অভিনব। কিন্তু পরবর্তী আলঙ্কারিকদের অভিমত যে, শুধুমাত্র রীতিবাদের দ্বারাই কখনই কাব্যবিচার সম্ভব নয়। তাই পরবর্তীকালে জন্ম নিয়েছে আরও অজস্র মতবাদ। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধ্বনিবাদ। ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদের জনক বলা হয় খ্রিস্টীয় নবম শতকের আলঙ্কারিক আচার্য আনন্দবর্ধনকে। তাঁর আগে অনেক আলঙ্কারিক ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করলেও আনন্দবর্ধন সর্বপ্রথম কাব্যে ধ্বনির অস্তিত্ব, মৌলিকতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রসকে নির্ভর করে তিনি যেভাবে ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা বলাই বাহুল্য। তিনিই প্রথম বলেছিলেন - ধ্বনিই কাব্যের আত্মা। তাঁর আগের আলঙ্কারিকগণ বাচ্যার্থকে গুরুত্ব দিলেও প্রতীয়মান অর্থকে গুরুত্ব দেননি। তাঁর মতে প্রতীয়মান অর্থই অনুভূতিবেদ্য, তো এই অর্থকে গুরুত্ব দিয়েই তাঁর ধ্বনিবাদের প্রতিষ্ঠা। আচার্য আনন্দবর্ধনের মতে - *কাব্যস্যাত্মাধ্বনিঃ।* [২৫] এই ধ্বনি বা বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি নয়। এটি হল রসধ্বনি।

তাঁর মতে - কাব্যের ধ্বনি শব্দার্থকে অতিক্রম করে শব্দার্থ থেকে আক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। এই ধ্বনিই যদি সহৃদয়ের হৃদয়ে আহ্লাদ সৃষ্টি করে তবে, সেটাই হবে আদর্শ বা রসধ্বনি। আনন্দবর্ধন মূলতঃ কাব্যের ধ্বনি বলতে রসধ্বনিকেই বুঝিয়েছেন। আনন্দবর্ধনের মতে ধ্বনি হতে হলে তাতে ব্যঙ্গের প্রাধান্য থাকবে। তিনি বৃত্তিকে বলেছেন —

ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ। [২৬]

মূল ধ্বনিতে বাচ্যার্থ নয়, ব্যঙ্গার্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান থাকে। রসধ্বনি এই ধরণের ধ্বনির অন্তর্গত। বাচ্যার্থের অবসানের পরে ব্যঙ্গার্থের সূচনায় এই ধরণের ধ্বনি রসধ্বনির রূপ পায়। আনন্দবর্ধনের মতে, এই ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কাব্যার্থের সামর্থ্যের দ্বারা যে ব্যভিচারী ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে, তা থেকেই রসের উদ্ভব হয়ে থাকে। আনন্দবর্ধন মনে করেছিলেন যে শব্দ ও অর্থ সম্পৃক্ত হয়েই ব্যঙ্গার্থের সৃষ্টি হয়। ব্যঙ্গার্থ যখন অভিধানগত অর্থকে অতিক্রম করে প্রতীয়মান অর্থের কথা বলে, ঐ প্রতীয়মান অর্থই ধ্বনি। যাকে আমরা সাধারণতঃ ব্যঞ্জনা বলে থাকি, তাকেই আনন্দবর্ধন বলেছিলেন ধ্বনি। নারীদেহ যেমন অলঙ্কার পরলেও তা সৌন্দর্যময়ী হয় না, যদি না দেহে লাবণ্য থাকে। এখানে অলঙ্কার হলো বাইরের গুণ বা সৌন্দর্য, আর লাবণ্য হল আভ্যন্তরীণ গুণ বা সৌন্দর্য। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাই হল কাব্যের আভ্যন্তরীণ গুণ বা সৌন্দর্য। এই গুণ বা সৌন্দর্যই কাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়, প্রতিভাত হয়, শোভিত হয়। সুতরাং, ধ্বনিত অর্থই কাব্যের আত্মা। যদি কোনও কাব্যে অর্থ ধ্বনিত বা ব্যঞ্জিত না হয়, তবে সেই কাব্য কখনই সুন্দর বা সার্থক হয় না। এখানে ধ্বনি শব্দটিকে আনন্দবর্ধন পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। ধ্বনি মূলতঃ কাব্যের এমনই একটি অর্থ যা আভাসে-ইঙ্গিতে বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বোঝা যায়। ধ্বনি যেহেতু কাব্যের আত্মা, তাই আত্মার অলঙ্কার যোগ করলে তা ব্যঞ্জনার বা সৌন্দর্যের আরও একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কাব্যে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি না থাকলে অলঙ্কারের কোন মানেই হয় না, এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন আনন্দবর্ধন।

আচার্য আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই রসবাদকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রসহীন কাব্যকে কাব্য বলে মানেননি তিনি। রসকেই তিনি কাব্যের প্রধান বিষয় মনে করেছিলেন। রস-ধ্বনিকেই তিনি কাব্যধ্বনি বলেছিলেন। অর্থাৎ কাব্যের আত্মা। তিদি ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন মূলতঃ কাব্যরসের ওপর ভিত্তি করেই। কবি প্রতিভার প্রসঙ্গে তিনি কল্পনার কথা বলেছেন। প্রতিভাতত্ত্বে আনন্দবর্ধন কল্পনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কবি যে কোনও বিষয়কে সর্বজনীন করতে পারেন, যদি তাঁর মধ্যে কল্পনাশক্তি থাকে। আভিধানিক অর্থকে ছাড়িয়ে প্রতীয়মান অর্থকে ব্যঞ্জিত করার মধ্যেও কল্পনাশক্তিকেই দেখেছিলেন তিনি। কল্পনার মধ্য দিয়েই কবি যে ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরেন তার মধ্যেই থাকে কাব্যগুণ, অলঙ্কার ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে

চলে আসে রীতির কথা। আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, কাব্যের রীতি রসের ওপরই নির্ভরশীল। রীতিই হল রসের ধর্ম। তবে আনন্দবর্ধনের মতে রীতির দ্বারা কাব্যতত্ত্বকে ধরা যায় না। কাব্যতত্ত্বের বীজ লুকিয়ে আছে ধ্বনিবাদের মধ্যে। আনন্দবর্ধনের মতে ধ্বনিবাদ দিয়েই কাব্যত্তত্বকে বোঝানো সম্ভব। আনন্দবর্ধন ধ্বনিবাদের কথা প্রথমে বললেও তাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। ধ্বন্যালোক গ্রন্থের লোচন টীকাকার অভিনবগুপ্তই তা সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আনন্দবর্ধন কথিত ধ্বনি কাব্যের আত্মা - বলতে তিনি বুঝিয়েছিলেন রসধ্বনিই কাব্যের আত্মা। সেই দিক থেকে বলা যায় তিনি রসকেই কাব্যের প্রাণ বলেছিলেন। কাব্যের মধ্যে যে বিষয়বস্তু ও অলঙ্কার থাকে তা তো রসের দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনিবাদ ও রসবাদ নামে যে দুটি ভিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়, এই দুটি ধারার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন অভিনবগুপ্ত। তাঁর মতে ধ্বনি তিন প্রকার - বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি। বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনি শেষ পর্যন্ত রসে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। সুতরাং বলতে বাধা নেই প্রকারান্তরে রসকেই কাব্যের আত্মা বলেছিলেন অভিনবগুপ্ত। কারণ, অনেক সময় দেখা গেছে বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি কাব্যে প্রতীয়মান অর্থকেই নির্দেশ করে, কিন্তু তাদের পরিণতি সেই রসধ্বনিতেই। বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি অনেক সময় গুণীভূত ব্যঙ্গ কাব্যের সৃজন করতে পারে কিন্তু কখনই ব্যঙ্গ কাব্যকে নয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন রসধ্বনির। তবে রসধ্বনির প্রয়োগ একমাত্র মহৎ কবিরাই করতে পারেন। আসলে বস্তুধ্বনি ও অলঙ্কারধ্বনিকে অভিনবগুপ্ত কাব্যের প্রাণ বলতে চেয়েছেন কারণ এই দুটি ধ্বনি কাব্যিক বিষয়কেই রসের কাছাকাছি নিয়ে যায়। আর রসধ্বনি, বস্তুধ্বনি বা অলঙ্কারধ্বনি নামক প্রাণকে পেয়ে উর্ত্তীণ হয় আত্মায়। অভিনবগুপ্ত রসকে কাব্যের আত্মা বলেই মনে করেছিলেন। আনন্দবর্ধন যে রসধ্বনির কথা বলেছিলেন, তাকে নতুন ভাবনায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তিনি।

পরবর্তীকালে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ আচার্য আনন্দবর্ধনের ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন যে, ধ্বনি নয়, রসই কাব্যের আত্মা।

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র গ্রন্থ সাহিত্যদর্পণের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রসের আলোচনায় তিনি বলেছেন - *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।* [২৭] যা আগে কোনও আলঙ্কারিক বলতে পারেননি। বিশ্বনাথ কবিরাজের হাতে রসবাদ নামে একটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে। সেই অর্থে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে রসবাদের জনক হলেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। যদিও বহুপূর্বে ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে 'রস' বিষয়ক আলোচনা করেছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে 'রসবাদের' প্রবর্তন করেছিলেন।

কাব্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্বনাথ বলেছেন — *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্* । [২৮] এই সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে জানা যায় - রসযুক্ত বাক্যই হচ্ছে কাব্য। এই ভাবনাটি আসলে আনন্দবর্ধন বা অভিনবগুপ্তের ভাবনাকেই সমর্থন করছে। রসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আনন্দের। কারণ রসই পাঠককে আনন্দদান করে। তাই আনন্দদায়ক বাক্যই হল কাব্য। রসই হল কাব্যের মূখ্যার্থ। যা আস্বাদিত হয়, তাই রস। বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বলেছেন —

রস্যতে ইতি রসঃ ইতি বুৎপত্তিযোগাদ্ ভাব-তদাভাসাদয়ো'পি গৃহ্যন্তে। [২৯]

যদিও আচার্য ভারতমুনি বহু আগেই একথা নাট্যশাস্ত্রে বলেছিলেন। রসনিষ্পত্তি বলতে বিশ্বনাথ আস্বাদের নিষ্পত্তিকে বুঝিয়েছেন। রস অখণ্ড। বিভিন্ন ভাব সহযোগে গঠিত বলে রসকে খণ্ডিত করা যায় না। রসের স্বাদ তাই ব্রহ্মস্বাদের সঙ্গে তুলনীয়। বিশ্বনাথ রসের ব্যাখ্যা করেছেন সুসংবদ্ধ ও স্পষ্টভাবে। তাঁর মতে লোকোত্তর চমৎকারিত্বই রসের প্রাণ। আচার্য ভরতমুনির দেখানো পথেই তিনি শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত রসের পাশাপাশি নবম রসরূপে শান্ত রসকে স্বীকার করেছেন।

শৃঙ্গার হাস্য-করুণরৌদ্রবীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসো'দ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ।। [৩০]

এর পাশাপাশি বাৎসল্য রসকে অন্তর্ভূক্ত করে মোট দশটি রসের কথা বলতে চেয়েছেন। নয়টি স্থায়িভাবে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

আচার্য ভরতমুনির রসভাবনা কেবল নাটকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর মতে নাটকের প্রাণই হল রস। ভরতের মতে —

ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে। [৩১]

অর্থাৎ, তার মতে রস ছাড়া নাটকের কোন বিষয়ই হতে পারে না। এই রসের সৃষ্টি হয় ভাব থেকে। ভাব সাধারণতঃ নাটকে বাচিক, আঙ্গিক, সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। আচার্য ভরতের মতে নাটকে স্থায়িভাব আটপ্রকার —

রতিহাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধাৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। [৩২]

এই আটটি ভাব থেকেই সাধারণতঃ আটটি রসের সৃষ্টি হয় —

শৃঙ্গার হাস্য করুণা রৌদ্রবীর ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুত সংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃস্মৃতাঃ।। [৩৩]

আচার্য ভরত রস নিষ্পত্তির কথা বলেছেন —

তত্র বিভাবানুভাব ব্যভিচারসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ। [৩৪]

শিল্পকলায় কাব্যের মূল উদ্দেশ্যটাই খাটে। শিল্পের মূল উদ্দেশ্যই হল সহৃদয় পাঠকের রসিকজনের চিত্তে আনন্দের সঞ্চার ঘটানো। শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টি করেন, তখন তিনি দর্শকের আনন্দদানকেই বড় করে দেখেন। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে শিল্প শব্দের বুৎপত্তিকরা হয়েছে — *শিল্পং কৌশলং শীল সমাধৌ* ।[৩৫] অর্থাৎ সকল শিল্পই কৌশলোৎপন্ন, সে কৌশল মানবাচিত্তবৃত্তির একাগ্রতা সমুদ্ভাবিত, তা অনুকৃতি নয়, সৃষ্টি। কোষশাস্ত্রে বলা হয়েছে — *শিল্পং কলাদিকং কর্ম্ম* । শতপথব্রাহ্মণে বলা হয়েছে — *যদ্বৈ প্রতিরূপং তচ্ছিল্পম্* । ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে শিল্পবিদ্যা দেবগণবিদ্যার অন্তর্গত। [৩৬] শিল্পকলার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় - (১) স্থাপত্য,

(২) ভাস্কর্য (৩) চিত্রকলা। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রটির যে যুগবিভাগ দেখা যায়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সময়কাল হল গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রটি। এই সময় শিল্পকলা উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। মূলতঃ সাহিত্য ও শিল্পকলা পাশাপাশি উৎকর্ষলাভ করে। সাহিত্যের থেকে রসদ সংগ্রহ করে শিল্পীরা তাঁদের শিল্পকর্ম নির্মাণ করেন। গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার ভিত্তি হল তৎকালীন সংস্কৃত কবি যথা কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক প্রমুখ কবির সাহিত্যের বিষয়। এইসব কবির সাহিত্যকে উপজীব্য করে নানান ভাস্কর্য ও চিত্রকলা নির্মিত হয়। এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডারকে, বিশেষতঃ বৌদ্ধসাহিত্য জাতকের গল্পকে বিষয় করে গড়ে ওঠে অজন্তা গুহাচিত্র। ভাস্কর্যসমূহের বিষয় হয়ে ওঠে তৎকালীন সাহিত্য।

শিল্পের জগৎ আনন্দময়। শিল্পের আনন্দময়স্বরূপ প্রকাশিত হয় রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতির দ্বারা। একদিকে ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রের অন্তর্গত তত্ত্বসমূহ রস, রীতি, ধ্বনি - এই বিষয়গুলি যেমন কাব্যের উৎকর্ষ সাধন করে, তেমনি শিল্পকলাকেও প্রভাবিত করে। কাব্যের ক্ষেত্রে রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতির স্বরূপ পরিস্ফুট হয় শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে রস, রীতি, ধ্বনির স্বরূপ প্রকাশ করা কবির ক্ষেত্রে অনেক সহজ, কিন্তু শিল্পীর ক্ষেত্রে রস সম্পূর্ণই বিমূর্ত এবং কাব্য অপেক্ষা অনেক কঠিন। যেদিক থেকে কাব্য সচল চিত্র বা ভাস্কর্য অচল। কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তির কাছে এরা উভয়েই সচল।

গবেষণাপত্রের নির্বাচিত বিষয় নাট্যসাহিত্য বা দৃশ্যকাব্য এবং শিল্পকলা (চিত্রকলা ও ভাস্কর্য) উভয়ই আনন্দলাভের বিষয়। কাব্যের সঙ্গে শিল্পকলার সম্পর্ক স্থাপনে অলৌকিক আনন্দলাভ হয়। প্রসঙ্গত, রস ধাতুর অর্থ হল আস্বাদন করা। যা রসন অর্থাৎ আস্বাদন করা যায়, তাই রস। চিত্রেও বর্ণ, রেখা প্রভৃতি সব কিছুই যথাযথ থাকলেও তাতে রস না থাকলে সে চিত্র সার্থক হয় না। সেদিক থেকে রসই চিত্রের প্রাণ।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *নাট্যশাস্ত্র,* ১.১১৬।

২। *কামসূত্র,* ৩.১২।

৩। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* তৃতীয় অধ্যায়, ২.৫।

৪। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩.৩৫.৫-৭।

৫। *কামসূত্র,* ৩.১২।

৬। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

৭। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ৬.৫।

৮। *মেঘদূতম্,* ২.২।

৯। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ,* ৬.৫.১।

১০। *কাব্যমীমাংসা,* ২.৬।

১১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.১.১।

১২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.১.২।

১৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

১৪। *বিনোদজননং লোকে নাট্যেমেতদ্ ভবিষ্যতি, নাট্যশাস্ত্র,* ১.১২০।

১৫। *কাব্যংসদ্ দৃষ্টা'দৃষ্টার্থং প্রীতিকীর্তিহেতুত্বাৎ, কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.১.৫।

১৬। *কাব্যপ্রকাশ,* ১.২।

১৭। *ধ্বন্যালোক,* ১ম উদ্যোত, ১।

১৮। *Aristotle's Poetics,* (Tr.) by S. H. Butcher. Page - 49.

১৯। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

২০। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

২১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১৩।

২২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.৩.৩০।

২৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.৩.৩১।

২৪। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

২৫। *ধ্বন্যালোক,* ১.১।

২৬। *ধ্বন্যালোক,* ১.২।

২৭। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

২৮। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

২৯। *সাহিত্যদর্পণ,*১.৩।

৩০। *সাহিত্যদর্পণ,* ৩.১৮২।

৩১। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৩২। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৭।

৩৩। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৫।

৩৪। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৩৫। *শতপথব্রাহ্মণ,* ৩.২.১.৫।

৩৬। *ছান্দোগ্য উপনিষদ,* ৭.২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ (রস, রীতি, ধ্বনি)

ভারতীয় আলংকারিকেরা কাব্যদেহ গঠিত হওয়ার রহস্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়ে যেমন নানা কিছুর সন্ধান পেয়েছেন, তেমনি কাব্যাত্মার সন্ধানে তৎপর হয়েও তাঁরা একটি বিশেষ সিধান্তে উপনীত হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে নানা মুনির নানা মত। কাব্যাত্মা-সন্ধানী আচার্য বামন খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যা আধুনিক ইউরোপীয় কাব্য সমালোচকদের অনেকেই প্রকারান্তরে মেনেছেন। তিনি রীতিকেই কাব্যের আত্মা মেনেছেন। অপরদিকে খ্রিস্টীয় নবম শতকের আলংকারিক আচার্য আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিবাদ' প্রবর্তন করে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাকেই কাব্যের আত্মা বলেছেন। আবার প্রাচীন আলংকারিক আচার্য ভরত রসকেই কাব্যের আত্মা বলে মেনেছেন যা পরবর্তী আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজেও মত। অতএব রসবাদী, রীতিবাদী ও ধ্বনিবাদী – সবাই তাঁদের আলোচনায় কাব্যের আত্মার কথা বলেছেন। কাব্যের আত্মা কিন্তু কাব্যের বহিরঙ্গ বিষয় নয়, এটি অন্তরঙ্গ বিষয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে কোনও বিশেষ একটি মতবাদ এককভাবে কাব্য সৃষ্টি করতে পারে না। এগুলি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের আলোচনায় তাই উঠে এসেছে রীতি ও ধ্বনির সমন্বয়ে রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে কাব্য। আপাতদৃষ্টিতে রীতি কাব্যশরীর তৈরী করলেও 'রীতি' হল কাব্যের আত্মা। আবার কাব্যশরীর নির্মাণ করতে গেলে 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দার্থের প্রয়োজন হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এই ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যই 'রসে' পর্যবসিত হয়। আচার্য বামন, আচার্য ভরত ও আচার্য আনন্দবর্ধন প্রমুখ আলংকারিকগণের আলোচনায় যে কাব্যের আত্মার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে সেগুলি অলংকারশাস্ত্রের তত্ত্বগত আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। তাই কাব্য অলংকারের মূলতত্ত্ব ফুটে উঠেছে রস, রীতি, ধ্বনির মধ্য দিয়ে। তাই রীতিবাদ, রসবাদ ও ধ্বনিবাদের আলোচনার মধ্য দিয়ে অলংকারশাস্ত্রের তত্ত্বগতদিকগুলির অনুসন্ধানের একটি প্রয়াসমাত্র।

ঃ রীতিবাদ ঃ

ভারতীয় অলংকার ভাবনায় আচার্য বামনের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনিই সর্বপ্রথম সূত্রাকারে অলংকারশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। রীতিবাদের প্রথম প্রবক্তা তিনি। প্রতীচ্যের বিভিন্ন আলংকারিকদের মতো তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন সৌন্দর্য সৃজনের মধ্যেই কোনও কবির কাব্যভাবনা নিহিত। আর সেটা সম্ভব রীতি, অলংকার প্রভৃতির সাহায্যে — সে কথা তিনি জোরের সাথেই ঘোষণা করেছিলেন। কাব্য সম্বন্ধে তার উক্তি —

কাব্যংগ্রাহ্যমলংকারাৎ। [১]

সৌন্দর্যম্ অলংকারঃ। [২]

কাব্যের আত্মা কি — এই যখন আলংকারিকদের জিজ্ঞাসা, তখন - খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামন ঘোষণা করলেন — *রীতিরাত্মা কাব্যস্য,* [৩] অর্থাৎ রীতিই কাব্যের আত্মা।

রীতি কি? এর উত্তরে বামন বলেছেন — *বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।*[৪] এই রীতি হল বিশিষ্ট পদরচনা। পদরচনার বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় গুণের দ্বারা। গুণাত্মক পদরচনার মধ্য দিয়ে রীতির উদ্ভব হয়ে থাকে। রীতির বৈশিষ্ট্য হল — *বিশেষো গুণাত্মা।*[৫] কাব্যের আত্মা বলতে যে কাব্যশরীরের আত্মা বোঝানো হচ্ছে তা স্বয়ং বামন বৃত্তিতে বলেছেন। *শরীরস্য ইব ইতি।* অর্থাৎ শব্দার্থযুগল কাব্যের শরীর আর সেই শরীরের অধিষ্ঠাতা আত্মা হল - রীতি। রীতিকে বাদ দিয়ে কখনোই কোনও কাব্য সার্থকতা লাভ করতে পারে না।

শব্দার্থযুগলং শরীরং, তস্যাধিষ্ঠাতা রীতির্নাম আত্মা[৬]

এখানে শরীর ও আত্মা হিসেবে বলাটা যে, নিতান্ত গৌণপ্রয়োগ, তা বলাই বাহুল্য। *রীতিরাত্মত্বম্ ইব শব্দার্থযুগলস্য শরীরত্বম্ ঔপচারিকম্* ।[৭]

এই কাব্যশরীরের শোভাবর্ধক অলংকার কখনোই কাব্যের আত্মা হওয়া সম্ভব নয়। বরং কাব্যগুণাধার পদসংঘটনা অর্থাৎ রীতির মধ্যেই নিহিত আছে চারুত্ব - একথা বলা চলে। রীতিবিদরা তাই সঙ্গতভাবেই বলেন — *রীতিরাত্মা কাবস্য*।[৮]

'রীতি' শব্দটি সংস্কৃত রী-ধাতুতে ক্তিন্ বা ক্তি (তি) প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন। রী-ধাতুর দুটি রূপ, একটি রীঙ্, যার রূপ হয় রীয়তে, রীয়েতে, রীয়ন্তে ইত্যাদি। এর অর্থ স্রবণ অর্থাৎ তরল পদার্থের গড়িয়ে যাওয়া। (তুলনীয় রীঙ্ স্রবণে)। দ্বিতীয় রী-ধাতুর রূপ রীণাতি, রীণীতঃ, রীণন্তি ইত্যাদি। এর দুটি অর্থ — (ক) যাওয়া (খ) রেষণ বা বৃক শব্দ (নেকড়ের আওয়াজ) করা। অমরকোষে স্রবণ ও গতি এই দুটি অর্থ মনে রেখে বলা হয়েছে; প্রচরণ ও স্যন্দন অর্থে রীতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। অমরকোষে বলা হয়েছে - *প্রচারস্যন্দয়ো রীতিঃ* (নানার্থবর্গ)। স্যন্দ্-এর অর্থ প্রস্রবণ। 'প্রচার'-এর অর্থ লোকাচার (তুলনীয় প্রচারঃ লোকাচারঃ)। স্যন্দঃ প্রস্রবণম্ — অর্থাৎ তরল পদার্থের গড়িয়ে যাওয়া। রীতি শব্দের আর এক অর্থ পিতল বলে অমরকোষে নির্দিষ্ট হয়েছে। *রীতিঃ স্ত্রিয়াম্ আরকুটো ন স্ত্রিয়ামথ তাম্রকম্* — বৈশ্যবর্গ। এটিও নিশ্চয় গলিত পদার্থের স্রবণ মনে রেখেই করা হয়েছে।

যাইহোক, সাহিত্যমীমাংসায় ব্যবহৃত রীতি শব্দটি গমনার্থক বা স্রবণার্থক রী-ধাতু থেকে নিষ্পন্ন হয়ে যৌগিক অর্থের (etymological meaning) অতিরিক্ত একটি পারিভাষিক অর্থ অর্জন করেছে। লোকাচার অর্থে শব্দটির ব্যবহার যোগরূঢ় কিংবা রূঢ় অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের সূচক। সাহিত্যশাস্ত্রীরা আরও উর্দ্ধে নিতান্ত পারিভাষিক অর্থে রীতি শব্দ ব্যবহার করেছেন বলেই সংজ্ঞা নির্দেশিত হয়েছে — *বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ* বা *পদসংঘটনা রীতিঃ।*[৯]

রাজশেখর *কাব্যমীমাংসায়* বলেছেন — *বচনবিন্যাসক্রমো রীতিঃ*।[১০] সর্বত্র, শব্দবিন্যাসের বিশেষ পদ্ধতিকে রীতি বলতে চাওয়া হয়েছে। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তির কামধেনুর ব্যাখ্যান অনুযায়ী — *রীণন্তি গচ্ছন্ত্যস্যাংগুণা ইতি রীয়তে ক্ষরত্যস্যাং বাঙ্‌মধুধারা ইতি বা রীতি*।[১১] ওজঃ প্রসাদ ইত্যাদি গুণ যাতে অনুগত থাকে কিংবা কাব্যবাণীর মধুধারা যাতে ক্ষরিত হয় তাকেই বলে রীতি। এখানে রী-ধাতুর সঙ্গে অধিকরণ বাচ্যে ক্তিন্ প্রত্যয় যোগে রীতিশব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। অপরদিকে *সাহিত্যদর্পণ*-এর টীকাকার মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মন্তব্য করেছেন — *রীয়তে জ্ঞায়তে গুণবিশেষোনয়া ইতি রীতিঃ, গত্যর্থকরীধাতোঃ করণে ক্তি। রীতিঃ প্রথা ব্যবহার ইতি পর্যায়ঃ*।[১২] অর্থাৎ রীতি, প্রথা ও ব্যবহার শব্দ সমার্থক, অর্থাৎ এর সাহায্যে সাহিত্যের বিশেষগুণ অবগত হওয়া যায় — এই হলে রীতি শব্দের অর্থ। গতিবোধক রী-ধাতুতে করণবাচ্যে ক্তি-প্রত্যয়যোগে রীতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কাব্যে বিভিন্নপদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্নিবেশকেই রীতি বলা হয়, আর এই সন্নিবেশঘটিত চারুতার মূলে আছে গুণ — এই ছিল আচার্য বামনের সিদ্ধান্ত।

এইভাবে রীতি মুখ্যত শব্দবিষয়ক হলেও *বিশেষবতী পদানাং রচনা রীতিঃ* [১৩] — বৃত্তিতে বামনাচার্য এইভাবে স্পষ্টভাষায় পদনিষ্ঠ রীতির কথা বললেও অর্থবিষয়েও রীতিশব্দের গৌণপ্রয়োগ তাঁর অভিপ্রেত। *অর্থেষু ঔপচারিকী রীতিরঙ্গীকর্তব্যা*। অর্থকে রীতিহীন বলার অর্থ কাব্যশরীরে আংশিক নৈরাত্ম্যবাদ স্বীকার করা। *অর্থানাম্ আত্মভূতরীতিবৈধুর্যে কাব্যশরীরান্তঃপাতো দুষ্করঃ তস্যাম্ অর্থগুণসম্পদ্ আস্বাদ্যা।* [১৪] অর্থাৎ বৈদর্ভীরীতিতে শব্দের মত অর্থাংশেও আস্বাদনযোগ্য গুণসম্পদ্ থাকে — একথা বলে স্বয়ং বামনাচার্য আর্থী রীতিকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের (৭৭৯-৮১৯ খ্রিষ্টাব্দ) সভাকবি হিসেবে তিনি এই মত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

অলংকারবাদে যে অলংকারমণ্ডিত শব্দার্থসমষ্টির কাব্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই তত্ত্ব দীর্ঘকাল সুধীজনের মনোরঞ্জন করতে পারেনি। কেবল অলংকারযুক্ত শব্দার্থ

সমষ্টিকে কাব্য বললে ব্যবহারিক জীবনে ব্যবহৃত অলংকারযুক্ত শব্দার্থময় বাক্যকে কাব্য বলতে হয়। কেননা, কবির বাক্যে শব্দবিন্যাস একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে হয়ে থাকে, যা সাধারণ বাক্যে থাকে না। এইভাবে অলংকারপ্রস্থানের সীমা ছাড়িয়ে রীতিপ্রস্থান কালক্রমে কাব্যের আত্মা হিসেবে গণ্য হয়েছিল। সুতরাং শব্দবিন্যাসের এই বিশিষ্টভঙ্গী কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য যাকে আলংকারিকগণ কাব্যের আত্মা বলেছেন। আচার্য বামনের মতে, কাব্যে অলংকার অপেক্ষা গুণের অধিক গুরুত্ব। তাঁর মতে কাব্যসৌন্দর্য্যের মূল উৎস হল গুণ। অলংকার ঐ সৌন্দর্যের উৎকর্ষবর্ধন করে মাত্র। রীতি কেবল পদসন্নিবেশের কৌশলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। তা কাব্যগুণের সূচক এবং রসেরও পরিপোষক হয়ে ওঠে। সাহিত্যদর্পণে বলেছেন — পদসংঘটনা হল - *রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ। উপকর্ত্রী রসাদিনাম্।* আচার্য বামনের মতে —

কাব্যশোভায়াঃ কর্তারো ধর্মাগুণাস্তদতি'য়হেতবস্তূলঙ্কারাঃ। [১৫]

কাব্যে বিভিন্নপদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সন্নিবেশকেই রীতি বলা হয়, আর এই সন্নিবেশঘটিত চারুতার মূলে আছে গুণ — এই হল বামনের সিদ্ধান্ত। রীতির গুণেই কাব্য হয়ে ওঠে দোষমুক্ত অর্থাৎ যথার্থ রীতি বা ভঙ্গী প্রয়োগে কাব্য দোষমুক্ত হয়ে গুণময় হয়ে ওঠে। বামন রীতিকে চিত্রশিল্পীর রেখার সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন চিত্রশিল্পী যেমন রেখার সাহায্যে কোনও চিত্রকে পরিপূর্ণ করেন বা রেখার সাহায্যে পরিপুষ্টি ঘটান, ঠিক তেমনি রীতিও কাব্যে সামঞ্জস্য আনে। কাব্য সমগ্রতা পেয়ে সৌন্দর্যময় হয়। বামন বলেছেন - *এতাসু তিসৃষুরীতিষু, রেখাস্বিব চিত্রং কাব্যং প্রতিষ্ঠিতমিতি*। তিনি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন যে, রেখা যেমন কোনও ছবিকে প্রতিষ্ঠা দেয়, তেমনি তেমনি রীতির দ্বারাই কাব্য সৌন্দর্যলাভ করে। চিত্রে রেখার যে ভূমিকা, কাব্যে একই ভূমিকা পালন করে অলংকার ও গুণ।

আচার্য দণ্ডী মার্গ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রীতিবাদের পূর্বাভাস দিয়েছেন মাত্র। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক S. K. Dey বলেছেন — 'The first step towards this is indicated by the general trend of Daṇḍin's Work'.[১৬] তাঁর সময় বহু প্রকার মার্গ বা রীতির প্রচলন ছিল তা তিনি উল্লেখ করেছেন —

অস্ত্যনেকঃ গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্।

এই প্রসঙ্গে তিনি বৈদর্ভ ও গৌড়মার্গের ভেদ বিশদে আলোচনা করেছেন। ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থে এই ৩টি রীতি ছাড়াও আবন্তিকা, লাটীয়া ও মাগধী রীতি স্বীকৃত হয়েছে। *সাহিত্যদর্পণ* মতে রীতি চারটি, যথা - বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী।

আচার্য বামন কাব্যের আত্মা প্রসঙ্গে রীতির প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে রীতিই কাব্যের আত্মা এবং তিনি তিনপ্রকার রীতি মেনেছেন, যথা — বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী। এই তিনটি রীতিরই নামকরণ হয়েছিল মূলতঃ দেশের নাম অনুসারে। বিদর্ভ, গৌড় ও পাঞ্চাল দেশবাসী কবিদের লেখনশৈলীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে যথাক্রমে - বৈদর্ভ, গৌড়ী, পাঞ্চালী রীতিগুলির নামকরণ হয়েছে। বিদর্ভ বা তার আশেপাশের অঞ্চলে বৈদর্ভী রীতি প্রচলিত ছিল। আচার্য বামন বলেছেন —

বৈদর্ভ-গৌড়-পাঞ্চালেষু-তত্রত্যৈঃ কবিভিঃ যথাস্বরূপমুপলব্ধত্বাৎ। [১৮]

আচার্য বামন বৈদর্ভী রীতিকে শ্রেষ্ঠ রীতি স্বীকার করেছেন। আচার্য বামনের মতে —

সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী। [১৯]

অর্থাৎ, আচার্য বামন ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌধুমার্য, উদারতা, সমতা, শ্লেষ, কান্তি, অর্থব্যক্তি ও সমাধি এই দশটি গুণ স্বীকার করেছেন। ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য ইত্যাদি গুণের উপস্থিতিতে বা তার অভাবে এই বাক্‌পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বম্ ওজঃকান্তিসমাধয়ঃ।। [২০]

বৈদর্ভী রীতিতে সবগুলিগুণের উপস্থিতির কথা আচার্য বামন বলেছেন। বর্ণনীয় বিষয়ের চমৎকারিতা ও সমগ্র সৌন্দর্যশালিতার জন্য বৈদর্ভী রীতি কবিদের প্রিয়। এছাড়াও গৌড় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল গৌড়ীরীতি।

ওজঃ কান্তিমতী গৌড়ীয়া। [২১]

গৌড়ীয়রীতিতে ওজঃ ও কান্তিগুণের উপস্থিতি স্বীকার করা হয়। মাধুর্য্য ও সৌকুমার্যের অভাব, সমাসবাহুল্য ও উৎকটপদবিন্যাস তার বৈশিষ্ট্য।

পাঞ্চাল দেশে প্রচলিত ছিল পাঞ্চালী রীতি। পাঞ্চালীরীতির লক্ষণটি হল — *মাধুর্য্য সৌকুমার্যোপপন্না পাঞ্চালী।* [২২]

অর্থাৎ, মাধুর্য্য ও সৌকুমার্য গুণে ভূষিত রীতিকে বলা হয় পাঞ্চালী। গাঢ়বন্ধ ও সমাস এখানে প্রায় থাকে না।

তিনটি রীতির মধ্যে বৈদর্ভী রীতিকে তিনি সকল গুণবিভূষিতা বলে প্রশংসা করেছেন। তবে এটা ঠিক সব রীতিকেই কাব্যের আত্মা বলে মেনে নেননি তিনি। যে রীতি গুণসম্পন্ন, যা বিষয়বস্তুকে চমৎকার করে তোলে সেই গুণান্বিত রীতিকেই বামন কাব্যের আত্মা বলেছেন। আলংকারিক রুদ্রট চারপ্রকার রীতির উল্লেখ করেছেন — বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটিয়া ও গৌড়ীয়া।[২৩]

ধ্বনিবাদের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রীতিবাদের গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। ধ্বনি-রসবাদ অবশ্য রীতিবাদীদের এই নির্ণয়ে দোষ সন্ধান করেই সিদ্ধান্তে পৌঁছয় — রীতি বলে যে কাব্যচারুত্ব চিহ্নিত করা হয়েছে, তা আসলে রস বা রসধ্বনির অস্ফুটস্ফুরিত রূপ ছাড়া কিছু নয়। ধ্বনিবাদের প্রবক্তা আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলেছেন যে, যাদের কাছে ধ্বনিতত্ত্ব বোধগম্য নয়, তারাই রীতির প্রবর্তন ও সমর্থন করেন।

অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্ যথোচিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্তুং রীতয়ঃ সংপ্রবর্ত্তিতাঃ।। [২৪]

এতদ্ধ্বনিপ্রবর্ত্তনেন নির্ণীতং কাব্যতত্ত্বমস্ফুটস্ফুরিতং সদশক্নুবদ্ভিপ্রতিপাদয়িতুং বৈদর্ভীগৌড়ীপাঞ্চালী চেতি রীতয়ঃ প্রবর্ত্তিতাঃ। [২৫]

ধ্বনিকারকে অবলম্বন করে একাদশ শতাব্দীর আলংকারিক মম্মটভট্টও রীতির গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। আচার্য বিশ্বনাথ রীতিকে অবয়ব সংস্থান তুল্য সংঘটনা বিশেষ মনে করে কাব্যে তার প্রাধান্য স্বীকার করেননি।

যত্তু বামনেনোক্তং — রীতিরাত্মা কাবস্য ইতি, তন্ন। রীতেঃ সংঘটনাবিশেষত্বাৎ। সংঘটনায়াশ্চবয়বসংস্থানরূপত্বাৎ, আত্মনশ্চ তদ্ভিন্নত্বাৎ। [২৬]

আচার্য মম্মটের কাব্য প্রকাশের নবম উল্লাসে উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা তিনটি বৃত্তি যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির নামান্তর। এই তিনটি বৃত্তি বামনের গ্রন্থে তিনটি রীতিরূপে পরিগণিত হয়েছে।

এতাস্তিস্রো বৃত্তয়ো বামনাদীনাং মতে বৈদর্ভী-গৌড়ী-পাঞ্চাল্লাখ্যারীতয়ো মতাঃ। [২৭]

অবশ্য এর পূর্বেই খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*-এ বৈদর্ভী ও গৌড়রীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ পেয়েছি। পেয়েছি শব্দগুণ ও অর্থগুণের কথাও। ভারতীয় আলংকারিকেরা সঙ্কীর্ণতাবাদী ছিলেন না। দণ্ডী তাঁর *কাব্যাদর্শ*-এ বলেছেন যে প্রত্যেক কবির রচনারীতিতে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, বাক্‌প্রয়োগের নানবিধ পদ্ধতি আছে, তাঁর বিস্তৃত ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আচার্যদণ্ডীর মতে — *অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরম্*।[২৮] অর্থাৎ বাক্‌প্রয়োগের অনেক প্রকার পদ্ধতি আছে, তাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিদ্যমান এবং *তদ্‌ভেদাস্তু ন শক্যতে বক্তুং প্রতিকবিস্থিতাঃ।* [২৯] অর্থাৎ প্রত্যেক কবিপিছু এই যে বাক্‌প্রয়োগরীতির অনন্তভেদ, তা বলে শেষ করা যায় না।

গিরাং মার্গঃ অর্থাৎ বাক্‌পদ্ধতির অপর নাম রীতি। আচার্য দণ্ডী যে দশটি গুণের কথা স্বীকার করেছেন —

শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্যং সুকুমারতা।
অর্থব্যক্তিরুদারত্বম্ ওজঃকান্তিসমাধয়ঃ।।[৩০]

অর্থাৎ আচার্য দণ্ডী তাকেই বৈদর্ভী রীতি বলেছেন, যেখানে ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, সমতা, শ্লেষ, কান্তি, অর্থব্যক্তি ও সমাধি এই দশটি গুণের সবগুলি উপস্থিত থাকে। *বৈদর্ভী মার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতা।*[৩১] সেদিক থেকে বৈদর্ভীকে আদর্শ রীতি বলা তাঁর অভিপ্রায় মনে হয়। আচার্য বামনও বলেছেন — *সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী।*[৩২] অন্যদিকে *ওজঃকান্তিমতী গৌড়ীয়া*[৩৩] মাধুর্য ও সৌকুমার্যের অভাব, সমাসবাহুল্য ও উৎকটপদবিন্যাস তার বৈশিষ্ট্য। বলা হয় — *সমস্তাত্যুদ্ভটপদাম্ ওজঃ কান্তিগুণান্বিতাম্। গৌড়ীয়ামিতি গায়ন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ।* দণ্ডীর কথা অনুযায়ী *অসমস্তগুণা গৌড়ী*। গৌড়ীরীতিতে সবগুণ তো থাকেই না, উপরন্তু তা 'সমাসবহুলা'। একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ হল — *গৌড়েশ্বক্ষরডম্বরঃ*। কোনো গৌড়ীয়কবির লেখা দেখে এই রীতি গৌড়রীতির নাম মহিমা অর্জন করেছিল। এই ব্যাপারটি প্রাচীন, কারণ দণ্ডীর পূর্বে ভামহ বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির কথা উল্লেখ করেছেন। ভামহ যেগুলিকে অলংকার বলেছেন দণ্ডী সেগুলিকে গুণ বলেছেন এবং রস, অলংকার সবকিছুকেই গুণাত্মিকা রীতির অধীন গণ্য করেছেন। যেমন পাঞ্চালী রীতির বৈশিষ্ট্য মাধুর্য ও সৌকুমার্য। *মধুরাং সুকুমারাঞ্চ পাঞ্চালীং কবয়ো বিদুঃ।* গাড়বন্ধ ও সমাস তাতে প্রায় থাকে না। আচার্য বামন বলতে ভোলেননি যে, সর্বগুণাকর বৈদর্ভী রীতিই তাঁর মতে আদর্শ রচনাবলী। *তাসাং পূর্বা গ্রাহ্যা গুণসাকল্যাৎ*।[৩৪] কাব্যপ্রকাশ ও সাহিত্যদর্পণ মতে গুণ রসধর্ম। কাব্যপ্রকাশে বলা হচ্ছে —

যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ।।[৩৫]

অর্থাৎ কাব্যের অঙ্গী অর্থাৎ মুখ্য যে রস, তার ধর্মগুলি আত্মার শৌর্য ইত্যাদির মত। এরা অচলস্থিতি অর্থাৎ স্থায়ী ও উৎকর্ষসাধক। এদের গুণ বলা হয়।

সাহিত্যদর্পণ মতে —

রসস্যাঙ্গিত্বমাপ্তস্য ধর্মাঃ শৌর্যাদয়ো যথা গুণাঃ।[৩৬]

অর্থাৎ, রস যা কিনা অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান হয়ে থাকে, তার ধর্মগুলি আত্মার শৌর্য ইত্যাদি ধর্মের মত গুণ নামে পরিচিত হয়।

কাব্যাদর্শ ও *সাহিত্যদর্পণ* গ্রন্থে তিনটি গুণ স্বীকৃতি হয়েছে, যথা — মাধুর্য, ওজঃ, প্রসাদ। এদের মধ্যে মাধুর্য হল *চিত্তদ্রবীভাবময়ো হ্লাদঃ* অর্থাৎ ক্রোধ, বিস্ময়, হাস ইত্যাদি বিক্ষেপ থেকে মুক্ত দশায় রতি ইত্যাদি ভাবের আকারে আনন্দ উদ্বুদ্ধ হলে সহৃদয় পাঠকের চিত্তের আদ্রীভবন হয়। শৃঙ্গার, করুণ ও শান্ত রসের ক্ষেত্রে এর ফল প্রকট। কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে অবশ্য *আহ্লাদকত্বং মাধুর্য শৃঙ্গারে দ্রুতিকারণম্* এইভাবে চিত্তদ্রবীভাবের কারণকে মাধুর্য বলা হয়েছে। বর্গীয় পঞ্চমবর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণযোগে সংযুক্ত বর্ণ, অসংযুক্ত র, ন থাকা; ট, ঠ, ড ঢ পরিহার, সমাস না থাকা এবং খুবই অল্প থাকা - এই হল মাধুর্যগুণযুক্ত রচনার বৈশিষ্ট। সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে বলা হয়েছে — *অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা মধুরা রচনামতা* অন্যদিকে বীর, বীভৎস ও রৌদ্ররসের উপযোগী ওজঃগুণ বলতে বোঝায় *ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।* চিত্তের বিস্ময় ইত্যাদি কারণে বিস্ফারিত দশাই ওজঃ। বর্গের প্রথম তিনবর্ণের সঙ্গে শেষ দুই বর্ণের সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে, রেফ-রফলা থাকলে, ট, ঠ, ড, ঢ বর্ণ সংযুক্ত অথবা অসংযুক্তভাবে থাকলে, শ, ষ বর্ণ ব্যবহৃত হলে প্রচুর সমাস থাকলে ওজঃ হয়।

আর যে গুণ শুকনো কাঠে আগুন লাগার মত সমস্ত রস, সমস্ত রচনায় উপস্থিত থাকার অধিকারী হয়ে দ্রুত পাঠকচিত্তে ব্যাপ্ত হয় তা প্রসাদগুণ।

চিত্তং ব্যাপ্নোতি যঃ ক্ষিপ্রং শুষ্কেন্ধনশিবানলঃ।
স প্রসাদঃ সমস্তেষু রসেষু রচনাসু চ।।[৩৭]

শোনামাত্রই যেখানে শব্দ থেকে অর্থবোধ ঘটে, সেখানে প্রসাদগুণ আছে বুঝতে হবে। *শব্দাস্তদ্ব্যঞ্জকা অর্থবোধকাঃ শ্রুতিমাত্রতঃ*। যাইহোক, রীতি গুণাত্মিকা। এই সিদ্ধান্তটি রীতিবাদী ও অনান্যরা স্বীকার করে আসছেন। কাব্যপ্রকাশে উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা নামক বৃত্তি যথাক্রমে বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতির নামান্তর।[৩৮] মম্মট এই তিনটি রীতি স্বীকার করেন। *কাব্যমীমাংসা* ও *ধ্বন্যালোকে*[৩৯] এই তিনটি রীতির নামের উল্লেখ আছে। ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* গ্রন্থে এই তিনটি রীতির সঙ্গে আবন্তিকা, লাটীয়া ও মাগধী - এই আরও তিনটি রীতি স্বীকৃতি পেয়েছে। সাহিত্যদর্পণ মতে রীতি চারটি, যথা — বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। এদের মধ্যে মাধুর্যব্যঞ্জক বর্ণের সন্নিবেশ করে ললিত রচনা, যাতে সমাস থাকলেও যৎসামান্য, তাই বৈদর্ভী রীতির নমুনা।

মাধুর্যব্যঞ্জকৈবর্ণৈঃ রচনা ললিতাত্মিকা।
অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে।।[৪০]

ওজঃ প্রকাশক বর্ণরাশি দিয়ে গাঢ়বন্ধ সমাসবহুহ রচনায় গৌড়ী রীতি থাকে।

ওজঃ প্রকাশকৈর্বর্ণৈর্বন্ধ আড়ম্বরঃ পুনঃ।
সমাসবহুলা গৌড়ী।।[৪১]

মাধুর্য বা ওজঃ প্রকাশক নয়, এমন বণসমাবেশ করে পাঁচ-ছয় পদের সমাস দিয়ে গ্রথিত রচনায় পাঞ্চালী রীতি থাকে, বাণভট্টের কাদম্বরী যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। লাটী হল গৌড়ী ও পাঞ্চালীর মধ্যপন্থা। *কাব্যমীমাংসায়* বলা হয়েছে —

সমাসবদ্ - অনুপ্রাসবদ্ - যোগবৃত্তিপরম্পরাগর্ভং (বাক্যং) জগাদ্, সা গৌড়ীয়া রীতিঃ।

.... ঈষদসমাসম্ ঈষদনুপ্রাসম্ উপচারগর্ভঞ্চ (বাক্যং) জগাদ্, সাপাঞ্চালী রীতিঃ।

.... স্থানানুপ্রাসবদ্ অসমাসং যোগবৃত্তিগর্ভঞ্চ (বাক্যং) জগাদ্, সা বৈদর্ভী রীতিঃ। [৪২]

অর্থাৎ, সমাসবহুল, অনুপ্রাসবহুল, যোগবৃত্তি পরম্পরায় সমৃদ্ধ বাক্য হল গৌড়ীয়ারীতি। ... যত্‌কিঞ্চিত্‌ সমাস ও অনুপ্রাসযুক্ত এবং উপমাগর্ভ বাক্য হল পাঞ্চালী রীতি। যথাস্থানে অনুপ্রাসযুক্ত, সমাসহীন, যোগবৃত্তিগর্ভ বাক্য বললেন, তা হল বৈদর্ভীরীতি।

কাব্যমীমাংসায় আরও বলা হয়েছে — *তদাহুঃ বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি রীতয়স্তিস্রঃ। আসু চ সাক্ষান্নিবসতি সরস্বতী।*[৪৩] যদিও কোনো রীতির গুণাগুণের প্রসঙ্গ এখানে নেই। তবে সাহিত্যদর্পণ একথাও বলতে ভোলেননি যে — রচনারীতির বাঁধা ছক ধরে সাহিত্য চলে না। রচনার প্রকাশবিশেষ, প্রতিপাদ্য বিষয় ও চরিত্র বুঝে তা ব্যবহার করতে হয়। বিশ্বনাথ বলেছেন — নাটকে অভিনয়ের স্বার্থে এমনকি রৌদ্ররসের ক্ষেত্রেও দীর্ঘসমাসবহুল সংলাপ অপরিহার্য। আখ্যায়িকা শ্রেণীর গদ্যকাব্যে এমনকি শৃঙ্গাররসবহুল রচনাতেও মসৃণ বর্ণরাশি সাজানো চলে না, যেমন চলে না কথাশ্রেণীর গদ্যকাব্যে এমনকি রৌদ্ররসের ক্ষেত্রেও উদ্ধত বর্ণরাশির সমাবেশ।

'নাটকাদৌ রৌদ্রে'পি অভিনয়প্রতিকূলত্বেন ন দীর্ঘসমাসাদয়ঃ। এবমাখ্যায়িকাং শৃঙ্গারে'পি মসৃণবর্ণাদয়ঃ। কথায়াং রৌদ্রে'পি নাত্যন্তমুদ্ধতাঃ। [৪৪]

এইভাবে ক্রোধের বিষয় না থাকলেও নাটকের সংলাপ কর্কশাক্ষর হতে পারে। প্রতিপাদ্য বিষয় উদ্ধত হলে বক্তার স্বভাব যেমনই হোক, রচনারীতি উদ্ধত করতে হয় — ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে, কাব্যে প্রস্থানভেদ বা রীতিভেদ কোন সরল ঐকিক নিয়মে ঘটে না। গৌড়ী, লাটী, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী নামগুলি প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক

রচনা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। সেই সেই অঞ্চলের কবিদের লেখায় স্থানীয় প্রচলিত রীতির প্রভাব থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু ওজঃ, প্রসাদ, সৌকুমার্য, সমাসবদ্ধ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে এক এক রীতি চিহ্নিত হওয়ার পর তা কথাবস্তু, ভাব, রস, রচনার প্রকারবৈশিষ্ট্য, চরিত্রলিপির চাহিদা, এমনকি পাঠকসমাজের রুচি ইত্যাকার নানা আভ্যন্তর ও বাহ্য কারণ রীতিপদ্ধতির নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠে। কবিব্যক্তিত্ব কিংবা কবিপ্রতিভার স্বভাবভেদ তার একটি উপকরণমাত্র।

শরীরের অঙ্গসংস্থানে মতো কাব্যদেহে পদ-সংস্থানের এইসব প্রাতিস্বিক বৈশিষ্ট্য বা রীতি বাক্যগুণের সূচক হয়ে রসের উপকারক হয় — যা রসবাদীমাত্রই বলে থাকেন।

পদসংঘটনা রীতিরঙ্গসংস্থাবিশেষবৎ।
উপকর্ত্রী রসাদীনাম—।[৪৫]

মূলত রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাসের পরিপোষক পদবিন্যাস রীতি বলে গ্রাহ্য।

রসাদ্যুপকারকঃ পদবিন্যাসো রীতিরিতি রীতিলক্ষণং ফলিতম্।[৪৬]

ফলতঃ রসভাবহীন কাব্যে রীতি নেহাৎ বাক্সর্বস্ব চাতুরীতে পর্যবসিত হতে বাধ্য। রীতিকেই আত্মা বললে বাগর্থবিন্যাস কৌশলের উর্দ্ধে অন্যকিছুর প্রত্যাশা কাব্যের কাছে তা থাকার কথা নয়।

ভারতীয় সাহিত্যমীমাংসা বহিরঙ্গ অলঙ্কার থেকে অন্তরঙ্গ গুণ (গুণাত্মিকা রীতি) পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে যায়নি, সূক্ষ্মতম ধ্বনি ও রসকেও কাব্যের মূল বলে গণ্য করেছে। অলংকার, গুণ ও রীতি বিশ্লেষণে পূর্বসূরীরা যে অখণ্ড মনোযোগ দিয়েছিলেন, উত্তরসূরীরা তাঁদের মত সর্বাংশে পরিহার করেননি, সূক্ষ্মতর রসতত্ত্ব,

ধ্বনিতত্ত্বের পরিপোষক হিসেবে সেসবের উপযোগী স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। রীতিবাদীরা যে রসের কথা জানতেন না এমন নয়। তাঁদের মত ছিল রসকেও পদসংস্থানের অধীনে গণ্য করার অনুকূলে। ধ্বনিবাদ ও রসবাদীরা রীতিবাদীদের প্রধান-অপ্রধানের এই ছকটি পাল্টে দিয়েছিলেন মাত্র। কাব্যশোভার মূল সন্ধানে রীতিবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা রসবাদ ও ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল। যার হাত ধরে পরবর্তীকালে ধ্বনিবাদ আনন্দবর্ধন বলেছিলেন — *ধ্বনিরাত্মা কাব্যস্য।* [৪৭] এই মর্মে কাব্যাত্মস্বরূপধ্বনি (রসধ্বনি) পরবর্তীকালে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। এই সত্যটি রীতিবাদীরা তাঁদের যুগে করতে না পারার ফলেই রীতিকে ভুলক্রমে কাব্যাত্মা বলেছিলেন। তবে রীতিবাদীদের মধ্যেও যে অস্ফুটস্ফুরিত কাব্যতত্ত্বে ধ্বনির উপস্থিতি ছিল তা ধ্বন্যালোকে উচ্চারিত হয়েছে। প্রস্থানগুলি সর্বৈব পরস্পরবিরোধী নয়। এদের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আছে। এই প্রসঙ্গে, রীতিপ্রস্থানের সঙ্গে ধ্বনিপ্রস্থানের ঘনিষ্ঠতা বর্ণনা করতে গিয়ে ধ্বন্যালোক-কার আনন্দবর্ধন বলেছেন —

অস্ফুটস্ফুরিতং কাব্যতত্ত্বমেতদ্ যথোদিতম্।
অশক্নুবদ্ভির্ব্যাকর্তুং রীতয়ঃ সম্প্রবর্তিতাঃ।। [৪৮]

.... রীতিলক্ষণবিধায়িনাং হি কাব্যতত্ত্বমেতৎ স্ফুটতয়া
মনাক্ স্ফুরিতমাসীদিতি লক্ষ্যতে....। [৪৯]

অর্থাৎ যথোক্ত এই কাব্যতত্ত্ব অর্থাৎ 'ধ্বনি' রীতিবাদীদের অস্পষ্টভাবে স্ফুরিত হয়েছিল। তা বিশ্লেষণ করতে না পারায় তারা রীতিসমূহের কথা প্রবর্তন করেছিলেন। রীতিবাদীদের কাছে এ কাব্যতত্ত্ব স্পষ্টভাবে স্ফুরণ স্বল্পই হয়েছিল। যদিও তার প্রকৃত ব্যাখ্যা করতে পারেননি। রীতিবাদ এখানে ধ্বনিবাদে উত্তরণে সোপান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল।

আচার্য বামনের রীতিবাদ ভাবনা বিশেষভাবে গ্রহণীয় এইজন্য, কারণ তিনি সর্বপ্রথম কাব্যের আত্মা নিয়ে ভেবেছেন। আত্মা সম্পর্কে তত্ত্ব লিখেছেন। এটি নিশ্চিতরূপেই কাব্যের অন্তরঙ্গ ভাবনা। ভামহ বা দণ্ডী কাব্য সম্পর্কে অনেক কথা বললেও, তারা কিন্তু কেউই কাব্যের আত্মিক দিক নিয়ে ভাবেননি। তাঁদের দৃষ্টিটা ছিল কাব্যের বাইরের দিকের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বামন বলতে ভোলেননি যে, সর্বগুণাকর বৈদর্ভী রীতিই তাঁর মতে আর্দশ রচনাবলী। 'রীতি গুণাত্মিকা' এই সিদ্ধান্তটি রীতিবাদীগণ স্বীকার করে আসছেন। দশম শতাব্দীর আলংকারিক রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে রীতির ব্যাখ্যা করে বলেছেন - *বচনবিন্যাসক্রমো রীতিঃ*।[৫০] দশম শতাব্দীর বক্রোক্তিজীবিতকার আচার্য কুন্তক রীতিবাদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাতা।

কাব্যশোভার মূল সন্ধানে 'রীতিবাদ' একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা রসবাদ ও ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিল।

ভারতীয় রীতিবাদ ও পাশ্চাত্ত্য স্টাইল ঃ

পাশ্চাত্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল অনেকেই রীতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। অনেকে আবার রীতির সঙ্গে শৈলীকে এক করে ফেলেছেন। ভারতীয় সাহিত্য মীমাংসাশাস্ত্রে কথিত রীতি আর পাশ্চাত্যের style এক নয়। রীতি আলাদা, শৈলী আলাদা। সংস্কৃত রীতিবাদ এবং পাশ্চাত্ত্য শৈলীবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

Shorter Oxford Dictionary অনুযায়ী ইংরেজীতে স্টাইলিস্‌টিকস্‌ শব্দটির প্রয়োগ শুরু হয় ১৮৮২ থেকে। স্বভাবতই রীতিবাদ আর শৈলীবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য প্রায় হাজার বছরের। উভয়ের সৃষ্টিভূমি আলাদা, স্রষ্টাদের দেশকাল ও জীবনদর্শনও আলাদা। শৈলীবিজ্ঞানের তত্ত্বটি ক্রমাগত গড়ে উঠেছে আধুনিক পাশ্চাত্য

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখাকে কেন্দ্র করে। সেখানে বিষয় ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। তাই সাহিত্যক্ষেত্রে নানা ধরণের শৈলী প্রয়োগের অজস্র নিদর্শন ছিল সমালোচকদের চোখের সামনেই। কিন্তু ভারতীয় আলংকারিকদের সামনে সেই ধরণের নির্দশন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যের বিকাশের ধারা রুদ্ধ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার ধারাও রুদ্ধ হয়ে গেছে। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে শেষ প্রতিভাধর ব্যাখ্যাতা পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ মোঘল সম্রাট শাহজাহানের দরবারে স্থান পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো নতুন প্রস্থানের সূচনা করেননি। কেবলমাত্র পূর্বসূরীদের বিভিন্ন প্রস্থানের তিনি অসাধারণ মূল্যায়ন করেছিলেন। কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ এবং বামনের রীতিবাদ যেন শৈলীবিজ্ঞানের কাছাকাছি এক তত্ত্ববিশেষ। ব্যুফোঁর বিখ্যাত উক্তি 'style is the man himself' অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তাঁর সৃষ্ট শব্দ ও রীতির বৈশিষ্ট্য লুকোনো থাকে – যা শৈলীবিজ্ঞানের তাৎপর্যকে স্বীকার করায়। লেখকের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতাই তাঁকে বিভিন্ন ধরণের শব্দ ও শৈলী ব্যবহারে অনুপ্রেরণা দেয় - এটাই শৈলীবিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ব্যক্তিভেদে লেখকের শব্দপ্রয়োগ বা বাক্যগঠনে যে স্বাতন্ত্র আসে শৈলীবিজ্ঞান সেটাই দেখিয়ে দেয়। প্রুস্ত বলেছিলেন যে – একজন চিত্রকরের কাছে ছবি আঁকার ব্যাপারে রঙের যে ভূমিকা, একজন লেখকের কাছে style তাই। সমালোচকদের ভাষায়, It is a matter not of technique but of a highly personal mode of vision. [৫২] রীতিবাদ সম্পর্কেও হয়তো একথা বলা চলে। রীতিবাদীরা কাব্যের অবয়ব সংস্থান নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল এই সংস্থানের মূলে যে শিল্পভাবনা আছে, তাকে খুঁজে বের করা।

প্রত্যেক লেখকের শব্দব্যবহার, শব্দগঠন, বাক্যগঠন বা শব্দ ও বাক্যকে সাজানোর পদ্ধতির মধ্যেই তার বিশেষ মানসিকতা লুকোনো থাকে - এটা শৈলীবিজ্ঞানীদের কথা। লুকাস যাকে বলেছিলেন ‘personality clothed in words’। সাহিত্য যেহেতু ভাষানির্ভর এবং ভাষাসর্বস্ব শিল্প, তাই বিভিন্ন প্রণালীতে ভাষা বিশ্লেষণের মাধ্যমে শৈলীবিজ্ঞান সাহিত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে আগ্রহী, the

close, even technical, study of language is the sure way to literary understanding.[৫২]

রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য style-এর সম্পর্কের কথা অনেক ক্ষেত্রেই আলোচিত হয়েছে। মিডলটন মারে তাঁর বিখ্যাত *The Problem of Style* গ্রন্থে বলেছেন যে সাধারণভাবে স্টাইল বা শৈলীকে তিনভাগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। Style, as personal idiosyncrasy; style, as technique of expression; style, as the highest achievement of literature.[৫৩]

অর্থাৎ লেখকের ব্যক্তিগত প্রকাশস্বাতন্ত্র্য, তাঁর ভাব প্রকাশের নিজস্ব কৌশল এবং সাহিত্য সৃষ্টির চরম উৎকর্ষের মাধ্যম। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত স্টাইল নিয়ে দাঁড়ায় যেন এই তিনটির মিশ্রিত রূপ। রীতিবাদ প্রসঙ্গে যে character of the poet-এর কথা বলা হয়ে থাকে, তার সঙ্গেও মারে কথিত personal idiosyncrasy-এর সাদৃশ্য আছে।

সুতরাং রীতিবাদের আধুনিকতা উপেক্ষা করা যায় না। আঞ্চলিক ভিত্তিতে রীতির নামকরণ, একটি বিশেষ আঞ্চলিক রীতির শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা - এই সব ক্ষেত্রে স্টাইলের সঙ্গে রীতির অবশ্যই পার্থক্য আছে। তাছাড়া সাহিত্যবিচারে এবং জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এবং ইউরোপ - উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীরও তফাৎ আছে। তবুও যে কোনও রচনাশৈলী আসলে কবি আত্মারই প্রতিচ্ছবি - এই সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে রীতি এবং স্টাইল সমার্থক হয়ে ওঠে।

ভারতীয় অলংকারিকরা রীতিবাদের সীমাবদ্ধতা অনুভব করেই পরবর্তীকালে ধ্বনিবাদ ও রসবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, তাই রীতির আলোচনা সেখানেই সমাপ্ত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে স্টাইলের আলোচনা ক্রমশ স্টাইলিস্‌টিক্‌স এর আলোচনায় পর্যবসিত হয়েছে। লেখক অনুযায়ী যে বাক্যগঠন এবং শব্দপ্রয়োগের বিভিন্নতা জন্মায় - এটিই শৈলীবিজ্ঞানের অন্যতম অনুসন্ধানের বিষয়। রীতিবাদের ক্ষেত্রে কাব্যশরীরের গঠন-পরিপাট্যের তথা অবয়ব সংস্থানের ওপর জোর দেওয়া

হয়েছে। স্টাইলিস্‌টিকস্‌ এর আলোচনাতেও অবয়ব সংস্থানকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এতেই বোঝা যায় যে, সাহিত্য সমালোচনার মূল তত্ত্বগুলি এক অদৃশ্য যোগসূত্রে গাঁথা রয়েছে।

আধুনিককালে শৈলীবিদ্যা নিয়ে গড়ে উঠেছে 'শৈলীবিজ্ঞান' (stylistics)। ফরাসী দার্শনিক বুঁফো বলেছেন — 'style is the man himself' অর্থাৎ শৈলী হল যে কোন মানুষের চিন্তন, অনুভবের নিজস্ব প্রকাশ। এর মধ্য দিয়েই তাঁর ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। এই রীতির কথা ভারতবর্ষে প্রথম বলেছিলেন আচার্য বামন। তিনি তাঁর গ্রন্থ কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তির প্রথম পর্বে বলেছিলেন - অলংকারের জন্যই কাব্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। তাঁর মতে কাব্য যার দ্বারা সৌন্দর্যে অন্বিত হয় সেটিই হল অলংকার। *সৌন্দর্যম্‌ অলংকারঃ*। এর পরেই তিনি বলেছেন - *রীতিরাত্মা কাব্যস্যঃ*। এর থেকে সহজেই বলা যায় রীতিকেও তিনি পরোক্ষভাবে অলংকার বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

রীতির নামকরণে গৌড়, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, লাট, অবন্তি দেশনাম সংশ্লিষ্ট দেখা যায়। যদিও তাদের পার্থক্য নির্দেশ করা হয়েছে, ওজঃ, প্রসাদ, মাধুর্য্য ইত্যাদি গুণের ভূমিকার ওপর নির্ভর করে। দেশবিদেশে প্রচলিত থাকার সুবাদে রীতির নামকরণে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয় না। যদিও পাশ্চাত্যে কেউ স্থানিক style এর কথা বলেন না। অ্যারিস্টটলের মতে তা নিতান্ত ব্যক্তিগত। কবি ব্যক্তিত্বই style এর ভেদক। সে অর্থে, হোমার, মিল্টন শেক্‌সপীয়র, ভার্জিল, পেত্রার্ক ইত্যাটি প্রত্যেক কবির পৃথক পৃথক style পৃথক পৃথক নামে চিহ্নিত হয়ে হয়ে আসছে। যদিও সংস্কৃত কাব্যে কালিদাসের বৈর্দভী রীতি প্রিয়তা - প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। কবিদের লেখনশৈলী এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের style-এর সমর্থক বলা যেতে পারে।

সাহিত্যবিচারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের লক্ষ্য, দৃষ্টিভঙ্গী ও কালের ভেদরীতি ও style কে সমর্থক ভাবতে দেবে না। তবুও উভয়ক্ষেত্রেই বাক্‌শিল্পে অবয়বসংস্থানের যোগ্য সমাদর দৃষ্টি এড়ায় না।

ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন রসানুকূল শব্দার্থবিন্যাসকে বৃত্তি আখ্যা দিয়েছেন। আচার্য ভরত মুনি *নাট্যশাস্ত্র* গ্রন্থে বাচ্যার্থকে অবলম্বন করে প্রসিদ্ধ চারটি বৃত্তির উল্লেখ করেছেন, যথা - কৈশিকী, আরভটী, সাত্বতী, ভারতী এবং বাচক শব্দকে অবলম্বন করে তিনপ্রকার বৃত্তি যথা — উপনাগরিকা, পরুষা ও কোমলা।

রসাদ্যনুগুণত্বেন ব্যবহারো'র্থশব্দয়োঃ।
ঔচিত্যবান্ যস্তা এতা বৃত্তয়ো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।।[৫৪]

ব্যবহারো হি বৃত্তিরিত্যুচ্যতে। তত্র রসানুগুণ ঔচিত্যবান্ বাচ্যাশ্রয়ে যো ব্যবহারস্তা এতাঃ কৈশিক্যাদ্যা বৃত্তয়ঃ। বাচকাশ্রয়াশ্চোপনাগরিকাদ্যাঃ বৃত্তয়ো হি রসানিতাৎপর্য্যেণ সংনিবেশিতাঃ কামপি নাট্যস্য কাব্যস্য চ ছায়ামাবহন্তি।[৫৫]

পাশ্চাত্যে style-এর আলোচনাক্রমে stylistics আলোচনার উত্তীর্ণ হলেও প্রাচ্যের রীতিবিজ্ঞানে প্রণালী নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

পাশ্চাত্যে style-এর চর্চা দু-হাজার বছরের ঐতিহ্য নিয়ে এক নতুন মাত্রায় উন্নীত হতে পেরেছে। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল যথাক্রমে আদর্শবাদ ও বস্তুবাদী এর আদি প্রবক্তারূপে গণ্য হন। লেখকের নাম, রচনাকাল, ভাষা, দেশ, বিষয়বস্তু, দর্শক ও পাঠক, এবং উদ্দেশ্য অনুসারে style নির্ধারণের কথা সূত্রাকারে অ্যারিস্টটল বলেছিলেন। আর তারপর - বুফোঁ, শোপেনহাওয়ার, ফ্লবেয়ার, স্তাঁদাল, মিডলটন মারে, ম্যাথু আর্নল্ড ইত্যাদি মনীষীদের হাতে style-এর নতুন সংজ্ঞা নির্দেশ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঘটেছে। বুফোঁই বলেছেন — 'Style is the man', ম্যাথু আর্নল্ডের কথায় — style 'a peculiar recasting and heightenning', লুকাসের ভাষায় - 'Personality clothed in words', নিউম্যানের মতে - 'Thinking out into language', শোপেনহাওয়ার-এর মতে - 'Physiognomy of the mind' ওয়র্সফোল্ডের ভাষায় - "the element of literary composition in which...the writen unconsciouly express his one temperament or circumstances" ইত্যাদি।

সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যা 'রীতিবাদ' রূপে গড়ে উঠেছে, তাই ভারতীয় শিল্পকলায় শৈলী বা style-এর নামান্তর। রীতিবাদ অনুযায়ী বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, গৌড়ী ইত্যাদিতে গুণের প্রাধান্য যেমন রয়েছে, সেভাবেই ভারতীয় চিত্রকলা তথা ভাস্কর্যে গুণের প্রভাব লক্ষনীয়। সাহিত্যের রীতি ও শিল্পকলার রীতি পারস্পরিক সংযোগটি এখানে সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করা যায়।

সাহিত্যে কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ কবিগণ বৈদর্ভী রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন, সেইরকম শিল্পকলার ক্ষেত্রটিতে দেশ, কাল অনুযায়ী নানান শিল্পরীতির দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এক এক যুগের এক এক শিল্পরীতি। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে দৃষ্টি ফেরালে দেখা যাবে, নানান শৈলীর ভাঙ্গা গড়া যুগে যুগে নিরন্তরভাবে চলে এসেছে। তাই খুব সহজেই গুপ্তযুগের শিল্পরীতির থেকে কুষাণযুগের শিল্পরীতি, গান্ধার, মথুরা শিল্পরীতিকে পৃথক করা যায়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেরূপ দেশনাম অনুযায়ী বৈদর্ভী, পাঞ্চালী, লাটী, গৌড়ীরীতিতে কাব্য রচনা হয়েছিল, ঠিক সেইরকমভাবেই শিল্পকলায় যুগবিভাগ অনুযায় ভিন্ন ভিন্ন শিল্পরীতির প্রবেশ ঘটেছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে 'রীতি' কথাটির পরিবর্তে style বা শৈলী কথাটি যথার্থ।

কাব্যের ক্ষেত্রে রীতি যেমন বিভিন্ন কবির লেখনীকে সমৃদ্ধ করেছে, এক একজন কবি এক একটি রীতিকে আশ্রয় করে কাব্য রচনা করেছেন, তেমনি শিল্পকলার ক্ষেত্রেও এক একজন রাজার শাসনকালে এক একটি শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল এবং শিল্পীরা রাজতন্ত্রের অধীনে এক একটি বিশেষ শৈলী বা রীতিকে আশ্রয় করে তাঁদের শিল্পসৃষ্টি করে গেছেন।

রীতিগুলির নামকরণ থেকে বোঝা যায়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লেখার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেই তা করা হয়েছে। আচার্য বামন বলেছেন —

বিদর্ভাদিষু দৃষ্টাত্বাৎ তৎসমাখ্যা। [৫৬]

তবে সেই বৈশিষ্ট্য যখন রীতিরূপে প্রতিষ্ঠা পায়, তখন তা দেশের গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারে এবং যায়ও। সুতরাং দেশ নয়, লেখার বৈশিষ্ট্যই রীতিনির্ধারক।

ন পুনর্দেশঃ কিঞ্চিৎ উপক্রিয়তে কাব্যানাম্।[৫৭]

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.১.২।

৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

৪। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৭।

৫। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৮।

৬। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* কামধেনুটীকা, ১.১.৭।

৭। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* কামধেনুটীকা, ১.২.৮।

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১।

৯। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৭।

১০। রাজশেখর, *কাব্যমীমাংসা,* ৩.৬।

১১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* কামধেনু, ১.২.৬।

১২। *সাহিত্যদর্পণ,* ৯.১ টীকা।

১৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*, বৃত্তি ১.২.৭।

১৪। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.২০।

১৫। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১-২।

১৬। S. K. Dey, *History of Sanskrit Poetics*, Vol.II, P. 66.

১৭। *কাব্যাদর্শ,* ১.১০।

১৮। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*, ১.২.১০।

১৯। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১১।

২০। *কাব্যাদর্শ,* ১.১০।

২১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১২।

২২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১৩।

২৩। *কাব্যালংকার,* ২.৪-৬।

২৪। ধ্বন্যালোক, ৩.৪৬।

২৫। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.২.১৩।

২৬। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.২, বৃত্তি।

২৭। *কাব্যপ্রকাশ,* ৯ম উল্লাস।

২৮। *কাব্যাদর্শ,* ১.৪০।

২৯। *কাব্যাদর্শ,* বৃত্তি, ১.১৯।

৩০। *কাব্যাদর্শ,* বৃত্তি, ১.৪১।

৩১। *কাব্যাদর্শ,* বৃত্তি, ১.৪২।

৩২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১১।

৩৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১২।

৩৪। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১৪।

৩৫। *কাব্যাদর্শ,* ৮.৬৬।

৩৬। *সাহিত্যদর্পণ,* ৮.১।

৩৭। *সাহিত্যদর্পণ,* ৮.১৬।

৩৮। *কাব্যপ্রকাশ,* ৯ম উল্লাস।

৩৯। *ধ্বন্যালোক,* ৩.৪৬।

৪০। *সাহিত্যদর্পণ,* ৯.২।

৪১। *সাহিত্যদর্পণ,* ৯.৩।

৪২। *কাব্যমীমাংসা,* ৩.৪।

৪৩। *কাব্যমীমাংসা,* ৫.২।

৪৪। *সাহিত্যদর্পণ,* ৯.৮।

৪৫। *সাহিত্যদর্পণ,* ৮.১।

৪৬। *হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ,* পৃ. ৬২।

৪৭। *ধ্বন্যালোক,* ১.১।

৪৮। *ধ্বন্যালোক,* ৩.৪৬।

৪৯। *ধ্বন্যালোক,* ৩.৪৬।

৫০। *কাব্যমীমাংসা,* ৩.২।

৫১। Stephen Ullman, *Meaning and Style*, P. 42.

৫২। Graham Haugh, *Style and Stylistics*, P. 32.

৫৩। Middleton Mare, *The Problem of Style*, P. 73.

৫৪। *ধ্বন্যালোক,* ৩.৩৩।

৫৫। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ৩.৩৩।

৫৬। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১১।

৫৭। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১২।

ঃ রসবাদ ঃ

নাট্যশাস্ত্রের আদিপুরুষ তথা রসবাদের প্রবর্তক ভরতমুনির মতে —

ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে।[১]

অর্থাৎ রসব্যতীত কোন কাব্যই প্রবর্তিত হতে পারে না। কাব্যতত্ত্বে বলা হয়েছে *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্*।[২] এই ভাবনার বহুপূর্বে উপনিষদে বলা হয়েছে — *রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দীভবতি। কো হ্যেবানাৎ কঃ প্রাণাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো না স্যাৎ।* [৩]

অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ। এই জীব সেই রসাত্মা ব্রহ্মকে লাভ করেই আনন্দিত হয়। হৃদয়াকাশে যদি তিনি না থাকতেন, কে শরীরে অপানক্রিয়া বা নিম্নমুখী বায়ু চালনা করত, কেই বা প্রাণনক্রিয়া বা শ্বাসপ্রশ্বাস চালাত।

উপনিষদে আরও বলা হয়েছে যে — *আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন* অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দকে যিনি জানেন কিছুতেই তার ভয় নেই।

বিশ্বজগতের সারাৎসার মূলতত্ত্ব উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম, যা রসাত্মক আনন্দস্বরূপ। তাকে উপলব্ধি করার অর্থ 'আনন্দী' হওয়া। আনন্দবোধের এই দর্শনই শিল্পসাহিত্যবোধের রসবাদী দৃষ্টিকোণ নির্ধারণের মূলে নিহিত আছে। বেদান্তে ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার শোক মোহাতীত অপার চৈতন্যসমুদ্রে জীবের আত্মবিলয় ঘটায়; রসবাদী সাহিত্যমীমাংসক ও রসিকহৃদয় শিল্প ও অনুধাবনজনিত অপার আনন্দের উৎসার

মানেন, যা 'রসচর্বনা' ও 'ব্রহ্মস্বাদ সহোদর' নামে পরিচিত। উপনিষদের আলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অর্থ হল ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ - *যত্র ত্বস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ ...... তৎ কেন কং বিজানীয়াদ্ .... এতাবদরে খল্বমৃতম্ ইতি* [৫]

অর্থাৎ, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদশায় সব কিছুই আত্মা বলে উপলব্ধি হয়, তখন কে কাকে দেখবে ..... কে কাকে জানবে? কারণ কর্তা, কর্ম, ক্রিয়া সবভেদ তখন লুপ্ত। ... এ হল গিয়ে সেই অমৃত। এতেই ভেদবুদ্ধির অবলুপ্তি, যে ভেদবুদ্ধিদশায় অজ্ঞানবশে *ইতর ইতরং পশ্যতি, ... ইতর ইতরং বিজানতি*। এক অন্যকে দেখে, একে অন্যকে জানে অর্থাৎ কর্তৃ-কর্মভেদ তখন বিদ্যমান। শিল্পসাহিত্যের রসিক বোদ্ধার রসাপ্লুতি দশাও প্রায় ব্রহ্মজ্ঞানীর মত। শিল্পবস্তুর দিক্-দেশ-কাল-ব্যক্তি-সাপেক্ষ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে সাধারণীকরণের গুণে বোদ্ধাএমন এক মানসস্তরে তখন উন্নীত হয় যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য যায় ঘুচে, শিল্পভাবনায় একাত্ম হয়ে যাওয়ার ফলে অজ্ঞানাবরণভঙ্গে রসচৈতন্য হয় স্ফুরিত। এই তাঁর ব্রহ্মাস্বাদসহোদর শিল্পরসাস্বাদন। Alienation কিংবা শিল্পনিরপেক্ষ শিল্পিবিবেক এ তত্ত্বের সঙ্গে বেমানান। কেননা বিচার নয়, রসাপ্লুতির আনন্দ-উন্মাদনায় আত্মবিলয় এখানে কাঙ্খিত। ব্রহ্মজ্ঞানীর আর ভেদবুদ্ধিতে প্রত্যাবর্তন হয় না। শিল্পের সাময়িক আনন্দলোক থেকে কিন্তু আটপৌরে প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখশোকমোহময় লোকে প্রত্যাবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং ব্রহ্মরসস্বরূপ হলেও শিল্পসাহিত্য অনুভবজনিত রস ব্রহ্মাস্বাদ থেকে ন্যূন হতে বাধ্য। উপনিষদ্ যথার্থ বলেছেন — মানুষের আনন্দের শত শতগুণ মাত্রায় ব্রহ্মানন্দকে বুঝতে হয়।[৬] অবশ্য শিল্পসাহিত্য অনুভবজনিত আনন্দও নেহাৎ প্রাকৃত 'মানুষ' আনন্দ নয়, তা যে 'লোকোত্তরশ্চমৎকারঃ' অর্থাৎ অলৌকিক আহ্লাদ তা প্রতিপাদন করতে আচার্য্যরা ভোলেননি।

কাব্যের মৌলিক উপকরণ হল বাক্য। শ্রব্য বা দৃশ্য যাই হোক, কাব্যমাত্রই বাক্যময়। বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন — *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্*। অলঙ্কারসূত্রকার আচার্য শৌদ্ধোদনিক বলেছেন — *রসাদিমদ্ বাক্যং কাব্যম্*, অর্থাৎ বাক্য হলেই হবে না, কাব্য হতে গেলে তা রসাদিমৎ হতে হবে। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ* কাব্যে ভোজ

বলেছেন — *নির্দোষং গুণবৎ কাব্যম্ অলঙ্কারৈরলঙ্কৃতম্। রসান্বিতং কবিঃ কুর্বন্ কীর্তিং প্রীতিঞ্চ বিন্দতি।* [৭] অর্থাৎ, তিনি গুণ-অলংকার-রসসমন্বিত কাব্যের প্রশংসা করেছেন। বাগ্‌ভট এর মতে *গুণালঙ্কাররীতিরসোপেতঃ সাধুশব্দার্থসন্দর্ভঃ কাব্যম্।* অর্থাৎ গুণ, অলঙ্কার, রীতি ও রস যুক্ত হলে শুদ্ধ শব্দ ও অর্থের সন্দর্ভ কাব্য হিসেবে গণ্য হয়।

রসবাদী *কাব্যপ্রকাশ, সাহিত্যদর্পণ* ইত্যাদি গ্রন্থ রসকে কাব্যের কেন্দ্রবিন্দু বা আত্মা বলেছেন। কাব্যপ্রকাশের প্রারম্ভশ্লোকে পাই —

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধাতী ভারতী কবির্জয়তি।। [৮]

অর্থাৎ, যে কাব্যবাণী নিয়তির নিয়ম-নিষেধের উর্দ্ধে, যা স্বতন্ত্র, আনন্দময়, নয়টি রসের উৎস হিসেবে উপভোগ্য ও বাঙ্‌নির্মিতির আধার, তারই জয় হয়। হ্লাদৈকময়ী নবরসরুচির নির্মিতির আধার কবিভারতীই এখানে কাব্য।

কাব্যপ্রকাশের অষ্টম উল্লাসে এই মতের স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। সেখানে বলা হয়েছে — যেমন জীবাত্মার শৌর্যগুণ ভুলক্রমে শরীরের শৌর্য বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়, তেমনি কাব্যের আত্মা যে রস তার উৎকর্ষ বিধায়ক গুণ ভুলক্রমে শব্দগুণ বা অর্থগুণ বলে কথিত হয়।

যে রসস্যাঙ্গিনোধর্মা শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ।। [৯]

অর্থাৎ, শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার যথাক্রমে শব্দ ও অর্থ কাব্যের এই দুই অঙ্গের উৎকর্ষ বিধান করে অঙ্গী অর্থাৎ আত্মা যে রস তারই উপকার করে।

রাজশেখর তাঁর কাব্যমীমাংসা গ্রন্থে — কাব্যপুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই মত পোষণ করে বলেছেন — *শব্দার্থৌ তে শরীরং... রস আত্মা।* অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ হল কাব্যের শরীর, রস হলো তার আত্মা। তাই রসহীন কাব্য অসম্ভব।

ভরতমুনিকে বলা হয় নাট্যশাস্ত্রের আদিপুরুষ। তিনিই প্রথম ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে রসবাদের প্রবর্তন করেছিলেন। রসভাবনা ও অলংকারের সমন্বয়ে যে কাব্যশাস্ত্রের সুচনা হয়েছে, তারই প্রবক্তা ছিলেন ভরতমুনি।

রসবাদের মূলতত্ত্ব বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ গন্থে উপনিবদ্ধ করেছেন —

বাক্যং রসাত্মক কাব্যম্। [১০]

অর্থাৎ, রসই কাব্যে আত্মা। এই তত্ত্বটির আদি উৎস ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নিহিত। ভরত বলেছেন — রস ব্যতীত কোন কাব্যই প্রবর্তিত হতে পারে না।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তর্গত রসসূত্রটি হল —

'তত্র বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ'। [১১]

মূলকথা বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব-এর সংযোগে রসনিষ্পত্তি হয়ে থাকে। নাট্যশাস্ত্রের টীকাকার অভিনবগুপ্ত তাঁর *অভিনবভারতী* টীকায় বলেছেন —

আলংকারিকদের ভাষায় রস হচ্ছে — *সহৃদয়হৃদয়সংবাদী*। তত্ত্বগত দিক থেকে আলংকারিকরা বলেন — কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয়জনেরর মনের বাইরে রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে — রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে — *আস্বাদনত্বাৎ*। অর্থাৎ, আস্বাদনই হচ্ছে রস। লৌকিক দৃষ্টান্ত দিয়ে আচার্য ভরত বুঝিয়েছেন — লোক ব্যঞ্জন সহযোগে অন্নগ্রহণ করে খাদ্যরস আস্বাদন করে; অভিনবগুপ্তের মতে —

ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ [১২]

শিল্পরসিক তেমনি নানাভাবে কায়িক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ে অভিব্যক্তি রতি ইত্যাদি স্থায়িভাব আস্বাদন করে আনন্দ পান।

যথা হি নানাব্যঞ্জনসংস্কৃতমন্নং ভুঞ্জানা রসান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি, তথা নানা ভাবাভিনয়ব্যঞ্জিতান্ বাগঙ্গসত্ত্বোপেতান্ স্থায়িভাবান্ আস্বাদয়ন্তি সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ, হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছন্তি।[১৩]

প্রাচীনতর শ্লোকটি হল —

যথা বহুদ্রব্যযুতৈর্ব্যঞ্জনৈর্বহুভির্যুতম্।
আস্বাদয়ন্তি ভুঞ্জানা ভক্তং ভক্তবিদো জনাঃ।।
ভাবাভিনয়সম্বদ্ধান্ স্থায়িভাবাংস্তথা বুধাঃ।
আস্বাদয়ন্তি মনসা ...... ।।[১৪]

অর্থাৎ, নানা উপকরণ দিয়ে তৈরী নানা ব্যঞ্জন মিশিয়ে খাদ্যরসিক যেমন ভাত খেতে খেতে ভাতের আস্বাদ অনুভব করেন, ভাব ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ স্থায়িভাবগুলিকে রসিকজন তেমনি অন্তঃকরণ দিয়ে আস্বাদ করে থাকেন।

আয়ুর্বেদ, রসায়ন, ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনের বাস্তব রসতত্ত্ব থেকে শিল্পসাহিত্যের রসতত্ত্বে উত্তরণ ঘটবার যুক্তি এখানে স্পষ্ট বোঝা যায়। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত বলেছেন - নানা ব্যঞ্জন, ওষধি ও দ্রব্যের সংমিশ্রণে রস নিষ্পন্ন হয়। যেমন গুড় ইত্যাদি দ্রব্যের সঙ্গে ব্যঞ্জন ও ওষধি মিলে ষাড়ব ইত্যাদি পানীয় তৈরী হয়। একইভাবে নানাভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্থায়িভাব সাহিত্যে রস সৃষ্টি করে।

যথাহি নানাব্যঞ্জনৌষধিদ্রব্যসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তির্ভবতি। যথাহি গুড়াদিভির্দ্রব্যৈর্ব্যঞ্জনৌধিভিশ্চ ষাড়বাদয়ো রসা নির্বর্তন্তে, তথা নানাভাবোপগতা অপি স্থায়িনো ভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি।[১৫]

রসনা নামক ইন্দ্রিয় দ্বারা আস্বাদ্যমান ছয়টি রসের কথা বলা হয়েছে যথা — মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু, কষায় ও লবণ।

রসস্তু রসনাগ্রাহ্যো মধুরাদিরনেকধা [১৬]

মহাত্মা দ্রুহিণের মত উল্লেখ করে *নাট্যশাস্ত্রে* আটটি নাট্যরসের উল্লেখ আছে -

এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা। [১৭]

এবং ভরত মুনির মতে আটটি ভাবের থেকেই সাধারণত আটটি রসের সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা —

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। [১৮]

অর্থাৎ, শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত - এই আটপ্রকার রস।

তবে শান্ত রস এই তালিকায় যুক্ত হওয়ায় রসে সংখ্যা হল নয়টি। আচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁর ‘অভিনবভারতী’ টীকায় শান্তরসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

শান্তো নাম শমস্থায়িভাবাত্মকো মোক্ষপ্রবর্তকঃ। [১৯]

প্রতিটি রসের একটি করে স্থায়ীভাব আছে। যথা - রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। [২০]

অ্যারিস্টটল তাঁর *কাব্যগ্রন্থে* রসনিষ্পত্তির কথা বলেছিলেন। ভরতমুনিও রসনিষ্পত্তির কথা বলেছিলেন এইভাবে —

বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।[২১]

অর্থাৎ, উপযুক্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে, অর্থাৎ এই এক একটি স্থায়িভাব এক একটি রস হয়ে ওঠে। 'ভাব'কে ভরতমুনি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন —

বিভাবৈরাহৃতো যো'র্থস্তনুভাবেন গম্যতে।
বাগঙ্গসত্ত্বাভিনয়ৈঃ স ভাব ইতি সংজ্ঞিতঃ।।[২২]

শৃঙ্গার রসের স্থায়িভাব → রতি
হাস্য রসের স্থায়িভাব → হাস
করুণ রসের স্থায়িভাব → শোক
রৌদ্র রসের স্থায়িভাব → ক্রোধ
বীর রসের স্থায়িভাব → উৎসাহ
ভয়ানক রসের স্থায়িভাব → ভয়
বীভৎস রসের স্থায়িভাব → জুগুপ্সা
অদ্ভুত রসের স্থায়িভাব → বিস্ময়
শান্ত রসের স্থায়িভাব → শম

রসের বিশ্লেষণে আলংকারিকগণ মানসিক ও বাহ্যিক উপাদানের কথা বলেছেন। রসের মানসিক উপাদান হল মনের 'ভাব' নামে চিত্তবৃত্তি বা ইমোশানগুলি। এর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মতো, তা বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্ট কাব্যের জগৎ থেকে। আলংকারিকদের মতে, কাব্যজগতের ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের ভাব রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়। সুতরাং আলংকারিকদের মতে 'রস' লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে সব ভাব রসে রূপান্তরিত হয়, তারা কিন্তু অবশ্যই লৌকিক। লৌকিক জগতের সঙ্গে ভাবের অস্তিত্ব

আছে। কিন্তু এই ভাব বা 'ইমোশান' রস নয়। ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্যজগতের, এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলংকারিকগণ বলেন যে — রস ও কাব্যের জগৎ হল অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোক হর্ষাদি লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক হর্ষাদি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। ঐ সব লৌকিক ভাব ও তাদের লৌকিক কারণ কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে ঐ-সব লৌকিকভাবের যে বৃত্তি বা বাসনা আছে, তাদের এক অলৌকিক বস্তু 'রস' এ পরিণত করে। রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও তার পরিমাণ যে রস নিত্য আনন্দের হেতু। কারণ লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়ার কথা সাহিত্যদর্পণে উক্ত হয়েছে।

হেতুত্বং শোকহর্ষাদের্ গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ।।
অলৌকিকবিভাবত্বং প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ সর্বেভ্যে'পীতি কা ক্ষতিঃ।। [২৩]

আলংকারিকদের মতে কাব্য নির্মাণ কৌশলের তিনটি ভাগ যথা - বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

বিভাব প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে —

'রত্যাদ্যুদ্‌বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।' [২৪]

লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই বিভাব বলে যেমন —

যে হি লোকে রামাদিগতরতিহাসাদীনামুদ্‌বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো বিভাব্যন্তে অস্বাদাঙ্কুর প্রাদুর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি-ভাবাঃ এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে। [২৫]

লৌকিক জগতে যে সীতা ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি হর্ষ প্রভৃতিভাবের উদ্‌বোধের কারণ, তাই যখন কাব্যে ও নাট্যে নিবেশিত হয়, তখন তাকে বিভাব বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনে রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে যে, তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।

অনুভাব প্রসঙ্গে সাহিত্য দর্পণকার বলেছেন যে —

উদ্‌বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরং গহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্যরূপঃ সো' নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ ।। [২৬]

মনে ভাব উদ্বুদ্ধ হলে, যে সব সামাজিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের এই সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের অনুভাব।

আলংকারিকরা বিভাব ও অনুভাব ছাড়া সঞ্চারী নামে কাব্য কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হলে, ভাবেব মনোবিজ্ঞানগত রসতত্ত্বের ভিত্তির বিবরণ দিতে হয়।

মানুষের মনের ভাব বা 'ইমোশন' অনন্ত। কারণ 'ইমোশন' শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভুতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের ভাষায় ইমোশন হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ ইমোশন বা ভাবের সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি idea বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বিদ্যমান থাকে। এই আইডিয়া পুঞ্জের কোন অংশের কিছু পরিবর্তন ঘটলেই ইমোশন বা ভাব নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। আইডিয়ার সংখ্যা অনন্ত এবং তাদের পারস্পরিক যোগ-বিয়োগের প্রকার অসংখ্য। সুতরাং ভাব বা ইমোশন সংখ্যাতীত। এবং কোন ভাব অন্যভাবের সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দের মত আলংকারিকরাও কাজের সুবিধার জন্য অগণ্য স্বলক্ষণ

ভাবের মধ্যে কয়েকপ্রকারের ভাবকে, সাদৃশ্যবশতঃ কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত করে পৃথক করে দিয়েছেন। আলংকারিকরা নয়প্রকার ভাব স্বীকার করেছেন।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমো'পি চ।। [২৭]

এই ভাবকে তাঁরা বলেছেন স্থায়িভাব। কারণ —

বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং
যথোপলভ্যতে স স্থায়িভাবঃ। [২৮]

অর্থাৎ, ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুরূপে প্রতীয়মান হয় সেটিই স্থায়িভাব। আলংকারিকদের মতে এই নয়টিভাব, কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে, যথাক্রমে শৃঙ্গারাদি নয়টি রসে পরিণত হয় —

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসো'দ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসা শান্তস্তথা মতঃ।। [২৯]

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু ভাব আছে, এবং তার মধ্যে অনেকভাব, কাব্যের বিভাব ও অনুভাবে আলংকারিকদের কথায়, আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়। আলংকারিককেরা নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ প্রবৃতি এরকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন এবং তা ছাড়া যে আরও অনেক ভাব আছে, তা স্বীকার করেছেন।

এইসব ভাবকে আলংকারিকেরা বলেছেন সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী ভাব। তাঁদের মতে, এইসব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনো না কোনো স্থায়িভাবের সম্পর্কেই মনে যাতায়াত করে সেই স্থায়িভাবের অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য তাদের সঞ্চারী বা ব্যাভিচারী নামকরণ।

স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেণ চরণাদ্ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।[৩০]

ভাবের এই থিয়োরি থেকে স্বভাবতই রসেই এই থিয়োরি এসেছে যে, কাব্যে সঞ্চারীভাবের স্বতন্ত্র রসমূর্তি নেই, তাদের আস্বাদ্যমানতা স্থায়িভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানা রকমের পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নবরসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই সঞ্চারীর আস্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলংকারিকরাই স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, সঞ্চারী ভাবের পরিণতিকে রস বলতে রাজি নন। অভিনবগুপ্ত বলেছেন —

স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ শেষাস্তু সংঞ্জারিণ ইতি ব্যাচক্ষ্যতে।
ন তু রসানাং স্থায়িসঞ্চারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা।[৩১]

অর্থাৎ, স্থায়িভাবের পরিণতিই রস, বাকিগুলিকে বলে সঞ্চারী। রসের মধ্যে আবার স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস এইভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।

অভিনবগুপ্তের মতই অধিকাংশ আলংকারিকদের মত। কিন্তু স্থায়ী ও সঞ্চারীর এই প্রভেদ কিছু মূলগত প্রভেদ নয়।

রসেরও কি আবার স্থায়ি ও সঞ্চারী ভেদ আছে? এর উত্তরে বলা যায় — অবশ্যই আছে। এবং সকল আলংকারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই ভেদটি আপেক্ষিক। কারণ, এক কাব্যপ্রসঙ্গে যখন নানা রস থাকে তখন দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটি রস প্রধান এবং স্থায়ী ভাবের পরিণতি অন্য রস তার পরিপোষক হয়ে সঞ্চারীর কাজ করছে।

রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি।[৩২]

অর্থাৎ, এক রস অন্য রসের ব্যভিচারীর কাজ করে।

প্রসিদ্ধে'পি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একে রসো'ঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা।।[৩৩]

অর্থাৎ, এক কাব্য প্রবন্ধে নানা রস একত্র থাকলেও দেখা যায়, কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটি রসকেই প্রধান করেন। এবং বাকি রসগুলি তার পরিপোষক বা সঞ্চারী। এই সঞ্চারী কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, সঞ্চারী দিয়ে পরিপুষ্ট না হয়ে রসের রসত্বই হয় না।

পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্।[৩৪]

বিশ্বনাথ কবিরাজ সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থের যে কারিকায় রসের উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন তা হল —

বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা।
রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়িভাবঃ সচেতসাম্।।[৩৫]

অর্থাৎ, 'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব, কাব্যের বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে রসে পরিণত হয়।

আচার্য অভিনবগুপ্ত কাব্যরসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল —

শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত - প্রাঙ্‌নিবিষ্ট রত্যাদি বাসনানুরাগসুকুমার - স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার - রসনীয়- রূপো রসঃ।[৩৬]

রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদ রূপ একটি ব্যাপার। অভিনবগুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে বলেছেন - 'সকলহৃদয়ে সম-বাদী'। কারণ, এই বিভাব ও অনুভাব লৌকিক ভাবের রসমূর্তি; লৌকিকভাব ব্যক্তির হৃদয়ে

আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়। কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন তা বর্ণরূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ ভাব বা চরিত্র। তার মধ্যেই সহৃদয় পাঠক নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এইজন্য কবি যখন কাব্যের ভাবকে রসের মূর্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবে লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে ওঠেন। লৌকিকভাবের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাকলে যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

২। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

৩। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ২.৭।

৪। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ২.৯।

৫। *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,* ৪.৫.১৫।

৬। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,* ২.৮.১-৪।

৭। *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ,* ১.২।

৮। *কাব্যপ্রকাশ,* ১.১।

৯। *কাব্যপ্রকাশ,* বৃত্তি, ৮.৬৬।

১০। *সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

১১। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

১২। *অভিনবভারতী,* ২.৪।

১৩। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

১৪। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩৩-৩৪।

১৫। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

১৬। *কারিকাবলী* ১০১।

১৭। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৭।

১৮। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৬।

১৯। *অভিনবভারতী*, ৫.৩।

২০। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.১৮।

২১। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৩১।

২২। *নাট্যশাস্ত্র*, ৭.১।

২৩। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.৬।

২৪। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.৩৩।

২৫। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.৩৩।

২৬। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.১৩৬।

২৭। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.১৭৯।

২৮। *অভিনবভারতী*, ৩.২৪।

২৯। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.১৮২।

৩০। *সাহিত্যদর্পণ*, বৃত্তি, ১.১৪১।

৩১। *অভিনবভারতী*, ৫.৮।

৩২। *ধ্বন্যালোক*, ৪.২৪।

৩৩। *ধ্বন্যালোক*, ৩.২১।

৩৪। *ধ্বন্যালোক*, বৃত্তি, ৩.২৪।

৩৫। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.২৮।

৩৬। *অভিনবভারতী*, ৫.১২।

ঃ ধ্বনিবাদ ঃ

খিস্টীয় নবম শতাব্দীর অলংকারিক প্রথিতযশা আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিবাদ' প্রবর্ত্তন করে, ধ্বনিকে কাব্যের আত্মা বলেছেন।

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ।[১]

কাব্যের মূলতত্ত্ব হল ধ্বনি - একথা কাব্যতত্ত্ববিদ্ বিজ্ঞজনেরা বহু আগে থেকেই বলে আসছেন। ধ্বনিতত্ত্বের প্রথম সৃষ্টিকর্তা বৈয়াকরণগণ, স্ফোটের অভিব্যঞ্জক নাদশব্দবাচ্য শ্রূয়মাণ বর্ণকে ধ্বনি অ্যাখ্যা দিয়েছেন। আনন্দবর্ধন বৈয়াকরণদের কাছে ঋণ স্বীকার করে বলেছেন —

'প্রথমে হি বিদ্বাংসো বৈয়াকরণা, ব্যাকরণমূলত্বাৎ সর্ববিদ্যানম্।
তে চ শ্রূয়মাণেষু বর্ণেষু ধ্বনিরিতি ব্যবহরন্তি।'[২]

এর লোচনটীকায় আচার্য অভিনবগুপ্ত বলেছেন — *শ্রূয়মাণা যে বর্ণা নাদশব্দবাচ্যা অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যস্ফোটাতিব্যঞ্জককাণ্ডে ধ্বনিশব্দেনোক্তাঃ।*[৩]

পতঞ্জলি বলেছেন —

প্রতীতপদার্থকো লোকে ধ্বনিঃ শব্দ ইত্যুচতে।[৪]

ধ্বনি শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - যা প্রকাশ করে অথবা যা প্রকাশিত হয়, তাই ধ্বনি।

ধ্বনতীতি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যতে ইতি ধ্বনিঃ।

শ্রূয়মান বর্ণ স্ফোটকে প্রকাশ করে তাই ধ্বনিপদবাচ্য। ধ্বনি = ব্যঞ্জনা, প্রতীয়মান অর্থ। যে কাব্যে বাচক গুণীভূত থেকে ব্যঙ্গ - ব্যঞ্জককে প্রধান করে সেই প্রতীয়মান অর্থকে প্রকাশ করে, তাকে ধ্বনি বলে।

ধ্বনি অলংকার শাস্ত্রের একটি পারিভাষিক শব্দ। কাব্যের ধ্বনি বলতে বোঝায় কাব্যের এমন একটি অর্থ, যা বাচ্যার্থের দ্বারা সাক্ষাৎ বোঝায় না, তা ইঙ্গিতে, আভাসে, ব্যঞ্জনার দ্বারা বোঝায় কাব্যের বাচ্যার্থের অনুরণন ক্রমে। বাচ্যার্থ যখন বাধিত না হয়ে, পাঠকের চিত্তে নিজ স্বরূপে প্রকাশিত হয়, অথচ তাকে অতিক্রম করে পাঠকের চিত্তে ঐ একই সময়ে আর একটি অর্থ প্রতীয়মান হয়, তখন সেই প্রতীয়মান অর্থটিকে বলা হয় ধ্বনি (spirit/suggested sense) যে ব্যাপারের ফলে এই ধ্বনি প্রতীয়মান হয়, তাকে বলে - দ্যোতনা, ব্যঞ্জনা বা ধ্বনন ব্যাপার (suggestion)।

ধ্বনিবাদীগণ বলেন — *কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ*। ধ্বনি যে কাব্যের আত্মা - এই প্রসঙ্গটি আনন্দবর্ধনের পূর্বের পণ্ডিতগণ যে জানতেন তা নিম্নোক্ত কারিকাটি থেকে জানা যায় —

কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিরিতি বুধৈর্যঃ সমাম্নাত -পূর্ব্ব
স্তস্যাভাবং জগদুরপরে ভাক্তমাহু স্তথান্যে।
কেচিদ্ বাচাং স্থিতমবিষয়ে তত্ত্বমূচুস্তদীয়ং
তেন ব্রূমঃ সহৃদয়-মনঃ-প্রীতয়ে তৎস্বরূপম।।[৫]

ধ্বন্যালোকের কারিকাসমূহ পাঠ করলে বোঝা যায় যে - পূর্বে আলোচনা-পরম্পরা না থাকলে হঠাৎই এইরূপ অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ক মতবাদ গ্রন্থনিবদ্ধ হতে পারে না।

মূলতঃ ব্যঞ্জনা-ব্যাপারের আলোচনা ও উল্লেখ অলংকারাচার্যগণের অলংকার প্রকরণে পাওয়া যায়, বস্তুতঃ অলংকার থেকেই ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির উৎপত্তি।

পরবর্তীকালে আলংকারিকগণ বৈয়াকরণদের ধ্বনিতত্ত্বের মূল নীতি গ্রহণ করেছেন এবং তাকে পরিবর্ধিত ঔ পরিসংস্কৃত করে অভিনব ধ্বনিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈয়াকরণদের অনুবর্তন করে কাব্যতত্ত্বার্থদর্শীরা শব্দার্থশরীরযুক্ত কাব্যকে ধ্বনি বলেছেন। আলংকারিকদের মতে - বাচকশব্দ ও বাচ্য অর্থ স্বয়ং অপ্রধানীভূত হয়ে প্রধানীভূত ব্যঙ্গ্য অর্থকে যে কাব্যে প্রকাশ করে সেই কাব্যবিশেষকে ধ্বনি বলে।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।'[৬]

বৈয়াকরণগণ কেবল ব্যঞ্জকবর্ণকে ধ্বনি আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু আনন্দবর্ধন ব্যঞ্জক, ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনা ব্যাপার ও কাব্যকে ধ্বনি বলে গ্রহণ করেছেন।

'কাব্যতত্ত্বার্থদর্শিভির্বাচ্যবাচকসম্মিশ্রশব্দাত্মা কাব্যমিতি ব্যপদেশো ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ।'[৭]

অভিনবগুপ্ত তাঁর লোচনটীকায় এর বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে —

'তেন বাচ্যো'পি ধ্বনিঃ বাচকো'পি শব্দঃ ধ্বনিঃ, দ্বয়োরপি ব্যঞ্জকত্বং ধ্বনতীতি কৃত্বা। সংমিশ্যতে বিভাবানুভাবসংবলনয়েতি ব্যঙ্গ্যো'পি ধ্বনিঃ, ধ্বন্যত ইতি কৃত্বা। শব্দনং শব্দঃ শব্দব্যাপারঃ। ন চাসাবভিধাদিরূপঃ, অপি ত্বাত্মভূতঃ, সো'পি ধ্বননং ধ্বনিঃ। কাব্যমিতি ব্যপদেশ্যশ্চ যৌ'র্থ সো'পি ধ্বনিঃ, উক্তপ্রকারধ্বনিচতুষ্টয়ময়ত্বাৎ। [৮]

আলংকারিকগণের মতে শব্দ তিনপ্রকার — বাচক, লাক্ষণিক ও ব্যঞ্জক। অর্থ তিন প্রকার - বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য এবং শব্দগত অর্থবোধক শক্তিও তিনপ্রকার - অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা।

বাচক শব্দ থেকে অভিধা শক্তির দ্বারা বাচ্য বা মুখ্য অর্থের প্রতীতি হয়। লাক্ষণিক শব্দ থেকে লক্ষণাশক্তির দ্বারা লক্ষ্য বা গৌণ অর্থের প্রতীতি হয়। এবং ব্যঞ্জক শব্দ বা অর্থবোধক ব্যঞ্জনা শক্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্যঅর্থের প্রতীতি হয়। ব্যঙ্গ্য অর্থের বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রাধান্য তাকে ঘটলে ধ্বনি বলে।

ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে ধ্বনিঃ।[৯]

বাচ্য বা ব্যঙ্গ অর্থের প্রাধান্য নিরূপিত হয় চারুত্বের উৎকর্ষের দ্বারা। আনন্দবর্ধন বলেছেন —

চারুত্বোৎকর্ষনিবন্ধনা হি বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ প্রাধান্যবিবক্ষা।[১০]

ব্যঙ্গার্থের প্রাধান্য বা অপ্রাধান্য অনুসারে ধ্বনিবাদিগণ কাব্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। যে কাব্যে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান তা ধ্বনি বা উত্তমশ্রেণীর কাব্য। যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থ প্রধান তা গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যমশ্রেণীর কাব্য। এবং যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের সদ্ভাব থাকলেও ব্যঙ্গ্যার্থ চমৎকারজনক নয়, সেটি কাব্যচিত্র বা অধমশ্রেণীর কাব্য।

ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ। অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যে তু মধ্যমং শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্।[১১]

সমাসোক্তি, পর্যায়োক্ত, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, দীপক প্রভৃতি অলংকারে ব্যঙ্গ্যার্থ থাকলেও তা বাচ্যার্থের চারুত্ব নিষ্পাদক বলে অপ্রধান। সুতরাং উক্ত অলংকারপ্রধানকাব্য গুণীভূত ব্যঙ্গশ্রেণীর। তা ধ্বনিকাব্য নয়। আনন্দবর্ধন বলেছেন —

ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থোনুগমে'পিবা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে।।[১২]

ধ্বনি তিনপ্রকার — বস্তুধ্বনি, অলংকার ধ্বনি ও রসধ্বনি। এই তিনপ্রকার ধ্বনির মধ্যে রসধ্বনি কাব্যের আত্মা। কিন্তু আনন্দবর্ধন *ধ্বন্যালোকগ্রন্থের* প্রথমেই *কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ* - এই বাক্যে ধ্বনিসামান্যকে কাব্যের আত্মা বলেছেন, তা বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক উৎকর্ষ সূচনা করার জন্য।

তেন রস এব বস্তু আত্মা, বস্ত্বলঙ্কারধ্বনী তু সর্বথা রসং প্রতি পর্য্যবস্যেতে ইতি বাচ্যাদুৎকৃষ্টৌ তাবিত্যভিপ্রায়েণ ধ্বনিঃ কাব্যস্যাত্মেতি সামান্যেনোক্তম্। [১৩]

ধ্বনিবাদিগণের এই অভিমত রসবাদের প্রতিধ্বনিমাত্রে। রসবাদে আচার্য ভরত বলেছেন —

ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ত্ততে। [১৪]

এই তত্ত্বকে উপজীব্য করে রসকে কাব্যের আত্মা বা প্রধান উপাদান বলা হয়েছে। পণ্ডিত বলেছেন — The Dhvani theory is only an extension of the Rasa-theory.[১৫]

ধ্বনিবাদে রসধ্বনি কাব্যের আত্মভূত বলে, এরই পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের দোষ, গুণ ও অলঙ্কারের স্বরূপ নির্ণীত হয়েছে।

যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলাস্থিতয়ো গুণাঃ।।
উপকুর্বন্তি তং সন্তং যে'ঙ্গদ্বারেণ জাতুবিৎ।
হারাদিবদলঙ্কারাস্তেইনুপ্রাসোপমাদয়ঃ।। [১৬]

ধ্বনিকাব্যের আসল চমৎকারিতা যেখানে, সেই ব্যঞ্জনাগম্য ব্যঙ্গার্থ (suggested meaning) কেও ধ্বনি বলা হয়েছে। সেটিই কাব্যের আত্মা। কাব্যে প্রাথমিক শব্দার্থ, অলঙ্কার, গুণ, রীতি বক্রোক্তি পেরিয়ে অন্তর্গূঢ় ধ্বনিতে পৌঁছতে হয়।

আলংকারিকদের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতিই হল — বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যাঞ্জ্যনার নাম দিয়েছেন - 'ধ্বনি'।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্গ্যঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ। [১৭]

যেখানে, কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেছেন। এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলংকারিক পরিভাষা হল — 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেছেন, এই ধ্বনি বা ব্যঙ্গ্য হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।

কাব্যের এই ধ্বনি উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি যে সব অলংকার তার বাচ্যবাহকের - অর্থ ও শব্দের - চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিস।

'বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপামাদিভ্যো'নুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব [১৮]

কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে, এসব অলংকারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ অলংকার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিককেরা জানেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে ধ্বনি তা সেখানে নেই। কারণ, সেখানেও বাচ্যই প্রধান; ধ্বনির আভাস যেটুকু আছে, তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে ধ্বনি, তাই তার প্রধান বস্তু। ব্যঙ্গ যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ী মাত্র, যেমন সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালংকার, ধ্বনি নয়।

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।

সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ।। [১৯]

আবার, ব্যঙ্গ্য আভাসমাত্র থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হলে, তাকে ধ্বনি বলে না; কারণ ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়।

ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমে'পি বা।

ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে।। [২০]

আবার, যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়, সুতরাং সংকরালংকার আর ধ্বনি এক নয়।

তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতিস্থিতৌ।

ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ।। [২১]

বাক্যে যে কোনো ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। সমাসোক্তি ও সংকরালংকারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা কাব্যের আত্মা, ধ্বনি নয়। এমনকি যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা নয়।

যে ধ্বনি কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়। কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, তখন মহাকবির কথা এক অন্যজগতে পাঠককে নিয়ে যায়, এই অন্য জাগতিক গমনই হল ধ্বনির নামান্তর।

ধ্বনিবাদীদের মতে, কাব্যের আত্মা ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা মূলতঃ 'রস'গত ভাবেই হয়ে থাকে। তাঁরা দেখিয়েছেন - বাক্য যদি কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না।

রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের ধ্বনি হচ্ছে রসের ধ্বনি। পূর্বপরিচিত অর্থ ও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ করে বসন্তের নবকিশলয় খচিত বৃক্ষের মতো নতুন বলে প্রতীয়মান হয়।

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ।।[২২]

মূলত যাঁরা কাব্যের আত্মা ধ্বনি বলেছেন, তাঁরাই কাব্যের আত্মা রস বলে উপসংহার করেছেন।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।[২৩]

কাব্য হল সেই বাক্য, রস যার আত্মা।

আচার্য ভরতমুনির রসবাদ, আচার্য বামনের রীতিবাদ ও আচার্য আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ-এর আলোচনায় কাব্যের আত্মা প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই সম্প্রদায়গুলি কাব্যের আত্মা বলতে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব যথাক্রমে রস, রীতি ও ধ্বনিকেই স্বীকার করেছেন। কোনো একক তত্ত্বকে যেহেতু সব আলংকারিক কাব্যের আত্মা বলে মানেন নি, তাই সব তত্ত্বগুলিরই কাব্যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়েছে। রস, রীতি, ধ্বনির পারস্পরিক সাহচর্যে কাব্য রমণীয় হয়ে ওঠে। কাব্যের পাশাপাশি এই তত্ত্বগুলি শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকেও কিভাবে প্রভাবিত করে চলেছে তাই এই সব গবেষণাপত্রের অনুসন্ধেয় বিষয়। সাহিত্য সর্বদা তত্ত্বনির্ভর, আর এই সাহিত্যের তত্ত্বগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় শিল্পকলায়। কবি যখন কাব্য রচনা করেন এবং শিল্পী যখন শিল্প সৃষ্টি করেন, তখন তাঁদের একই উদ্দেশ্য - সহৃদয় পাঠক - দর্শকমননে চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করে আনন্দ দান করা।

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।।[২৪]

তাই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে সাহিত্যের রীতি ও শিল্পকলার রীতি, সাহিত্যের রস ও শিল্পের রস এবং সাহিত্যের ধ্বনি ও শিল্পকলার ধ্বনির পারস্পরিক সম্পর্ক ও তত্ত্বকথার প্রয়োগের দিকটির অনুসন্ধান চলবে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *ধ্বন্যালোক,* ১.১।

২। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.১৩।

৩। *ধ্বন্যালোক,* লোচনটীকা, ১.১৩।

৪। *মহাভাষ্য,* ২.৬।

৫। *ধ্বন্যালোক,* ১.১।

৬। *ধ্বন্যালোক,* ১.১৩।

৭। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.১৩।

৮। *ধ্বন্যালোক,* লোচন, ১.১৩।

৯। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.১৩।

১০। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.১৩।

১১। *কাব্যপ্রকাশ,* ১.৫-৬।

১২। *ধ্বন্যালোক,* ১.১৩।

১৩। *ধ্বন্যালোক,* লোচন, ১.১৩।

১৪। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

১৫। S. K. Dey, *History of Sanskrit Poetics,* পৃ. - ৩৮৭।

১৬। *কাব্যপ্রকাশ,* ৮.১-২।

১৭। *ধ্বন্যালোক,* ১.১৩।

১৮। *ধ্বন্যালোক,* বৃত্তি, ১.১৩।

১৯। *ধ্বন্যালোক*, ১.১৪।

২০। *ধ্বন্যালোক*, ১.১৫।

২১। *ধ্বন্যালোক*, ১.১৬।

২২। *ধ্বন্যালোক*, ৪.৪।

২৩। *সাহিত্যদর্পণ*, ১.৩।

২৪। *কাব্যপ্রকাশ*, ১.১।

তৃতীয় অধ্যায়

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রস, রীতি, ধ্বনি ঃ

ক) নাট্যকার কালিদাস।

খ) নাট্যকার ভবভূতি।

গ) নাট্যকার শূদ্রক।

(ক) নাট্যকার কালিদাস

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভাধর কবি কালিদাস। কালিদাস বলতে আজ আমরা এক ব্যক্তিকেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশেষযুগকে বুঝি। যে যুগের সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক মহাকবি কালিদাস। আনুমানিক খ্রিস্টীয় ২য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যবর্তী কোনও সময়ে কবি কালিদাসের আবির্ভাব ঘটেছিল।[১] যদিও ভারতবর্ষের কোন নগরীতে কোন সময় কালিদাসের জন্ম হয়েছিল, তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিজীবন যেমন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তেমনি জীবৎকালও ঐতিহাসিক প্রমানাদির ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্যভাবে নিরূপিত হয়নি। কালিদাসের নাটকত্রয় — *মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয়* ও *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* । নাটক তিনটির মূল কাহিনী বহুবল্লভ রাজার প্রেম ও তদ্ঘটিত দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ও নৈতিক বাধাবিঘ্নের অবসানে বিরহের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার মিলনান্ত পরিণতি। এই নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* [২]।

কালিদাসের নাটকগুলিতে চিত্রের বহু উদাহরণ আছে যার অধিকাংশই প্রতিকৃতি এবং এইসব চিত্র প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের একটি রীতিই হল — তাতে প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কনের উল্লেখ থাকবে। রাজা বা রাজকুমারীরা যখনই বিরহকাতর হয়েছেন, তখনই তাঁরা চিত্রফলক নিয়ে বসেছেন ও প্রণয়িণী বা প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন অথবা একে অন্যের প্রতিকৃতি দর্শনে প্রেমমুগ্ধ হয়েছেন এবং পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন - এটি গবেষণার বিষয়। সেইসঙ্গে রস, রীতি, ধ্বনি এই অলঙ্কারশাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলি কবি কালিদাসের দৃশ্যকাব্যগুলিকে কিভাবে সমৃদ্ধশালী করেছে, তারও অনুসন্ধান করা হয়েছে এই গবেষণাপত্রে।

কবি কালিদাসের দৃশ্যকাব্যের রীতি ঃ

প্রত্যেক কবির নির্দিষ্ট রচনারীতি বা শৈলী থাকে, কবি কালিদাসও তার ব্যতিক্রম নন। কবি কালিদাস বৈদর্ভী রীতির কবি।

বৈদর্ভী রীতি সন্দর্ভে কালিদাসঃ প্রগলভতে। [৩]

রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামনের কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি অনুযায়ী বৈদর্ভী, গৌড়ি, পাঞ্চালী — এই তিন রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রীতি হল - বৈদর্ভী।[৪] আচার্য বামনের মতে - *সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী।* [৫] অর্থাৎ ওজঃ, প্রসাদ, প্রভৃতি ১০টি গুণে সমৃদ্ধ রীতি হল বৈদর্ভী।

এই বৈদর্ভী রীতিতে রচনায় মহাকবি কালিদাস অনন্য, অদ্বিতীয়। কালিদাসের প্রথম নাট্যকৃতি *মালবিকাগ্নিমিত্র* — এই বৈদর্ভী রীতিতে রচিত দৃশ্যকাব্য। রাজপরিবারের প্রণয়লীলা অবলম্বনে রচিত এই নাটকে সুন্দরী রাজকন্যা মালবিকার দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনায় কবি কালিদাস নানান উপমার ব্যবহার করেছেন। এই নাটকের ভাষা সরল, স্বচ্ছন্দ এবং প্রসাদগুণে রমনীয় যা কালিদাসীয় রচনানীতির প্রাণ।

কালিদাসের অপর নাটক *বিক্রমোবর্শীয়* এক সুসংহত নাট্যকৃতি। এই নাটকটিও বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। উর্বশী ও লতার মধ্যে এক দীপ্ত উপমা প্রয়োগ করেছেন কবি কালিদাস। নিরূপম উপমার সৃষ্টি কবি কালিদাসের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। *মালবিকাগ্নিমিত্র* নাটকের চতুর্থ অঙ্কে যে লিরিকধর্মিতা রয়েছে তা কালিদাসের কবি প্রতিভার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কবি কালিদাস যে বৈদর্ভী রীতির কবি তা এই নাটকের রচনারীতিতে স্পষ্ট।

কবি কালিদাসের শ্রেষ্ঠ নাটক *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* — বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। প্রচলিত উক্তি *বৈদর্ভী রীতি সন্দর্ভে কালিদাস্যে বিশিষ্যতে।*[৬] আবার নাটকের মধ্যে

অভিজ্ঞান-শকুন্তল শ্রেষ্ঠ — *কাব্যেষু নাটকং রম্যং তত্রাপি চ শকুন্তলা*।[৭] কালিদাসের নাটকের অপরগুণ হল অপূর্ব শব্দবিন্যাস, তাঁর লেখার একটিও বর্ণও পরিবর্তন করলে যেন কাব্যের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন থাকবে না। যেহেতু বৈদর্ভী রীতি সমস্ত গুণের সমাহারে সৃষ্টি — কালিদাস এই রীতিতেই কাব্য রচনা করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে একটি উক্তি প্রচলিত আছে যে, বাল্মীকি বৈদর্ভীর জন্ম দেন, ব্যাস একে লীলাময়ী করে তোলেন আর তারপরে বৈদর্ভী স্বয়ং কালিদাসকে পতিত্বে বরণ করেন।[৮] তাই বলা হয়ে থাকে —

লিপ্তা মধুদ্রবেণাসন্ যস্য নির্বিষয়া গিরঃ।
তেনেদং বর্ত্ম বৈদর্ভীং কালিদাসেন শোধিতম্।।[৯]

।।মালবিকাগ্নিমিত্রম্।।

কবি কালিদাস রচিত *মালবিকাগ্নিমিত্র* দৃশ্যকাব্যের মূল বিষয় বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ও বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকার প্রণয় কাহিনী যা পঞ্চাঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটির রচনাশৈলী দেখে এটি কবি কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা বলা যায়। পণ্ডিতদের মতে এই দৃশ্যকাব্যটি শুঙ্গ রাজা অগ্নিমিত্রের সন্মানার্থে রচিত।[১০]

নাটকের কাহিনী অনুযায়ী নায়ক বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র বর্ষীয়ান রাজা পট্টরাজ্ঞী পত্নী ধারিণীর পটে তার পার্শ্বচারিণী মালবিকার চিত্র দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হন। যদিও রাণী সর্বদা এই সুন্দরী তরুণীকে রাজার চোখের আড়ালে রাখতে চান। বিদুষকের কৌশলে মালবিকা অন্তঃপুরে নৃত্যপরীক্ষায় নৃত্য পরিবেশন করলেন। রাজা তখন মালবিকাকে সাক্ষাতে দেখলেন — এইভাবে উভয়ের মধ্যে পূর্বরাগ ঘনীভূত হল। অতঃপর প্রমোদকাননে নায়ক-নায়িকার নিভৃত সাক্ষাৎ ঘটল; অগ্নিমিত্র যখন মালবিকাকে আলিঙ্গনে উদ্যত, সেই সময় কনিষ্ঠা মহিষী ইরাবতী হঠাৎ উপস্থিত হয়ে অগ্নিমিত্রকে ভৎর্সনা করলেন। এরপর মালবিকাকে গৃহবন্দিনী করে রাখা হল, তা সত্ত্বেও পুনরায় বিদুষকের চাতুর্যে প্রেমিক-প্রেমিকার সাক্ষাৎ ঘটল; এবারেও রাণী ইরাবতীর আকস্মিক উপস্থিতির ফলে প্রণয়ভঙ্গ হল। এর কিছুদিন পর অজ্ঞাতকুলশীলা নায়িকা রাজকুমারী মালবিকার যথার্থ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল। জানা গেল যে মালবিকাকে অগ্নিমিত্রের হাতে সম্প্রদান করার জন্য তাঁর আত্মীয়া কৌশিকী এক বণিকের সঙ্গে যখন বিদিশায় আসছিলেন, তখন শবরদের দ্বারা আক্রান্ত হন ও ভাগ্যবলে ধারিণীর অসবর্ণ ভাই সীমান্তদুর্গের রক্ষক বীরসেনের সাক্ষাৎ পান এবং তার হাতেই মালবিকাকে ধারিণীর কাছে রক্ষণাবেক্ষনের জন্য অর্পণ করেন। এমন সময়ে পত্র মারফৎ সংবাদ এল যে

অগ্নিমিত্রের তরুণ পুত্র বসুমিত্র সিন্ধুতীরবর্তী যবনদের পরাস্ত করেছেন। পুত্রের যুদ্ধবিজয়ের আনন্দে আনন্দিতা ধারিণী ইরাবতীর সম্মতি নিয়ে মালবিকার সঙ্গে অগ্নিমিত্রের শুভ মিলন ঘটল। এভাবেই নাটকটির সমাপ্তি ঘটল।

এই দৃশ্যকাব্যে নায়ক রাজা অগ্নিমিত্রকে বহুবল্লভ রাজা রূপে পাওয়া যায়। যিনি মহিষী ধারিণী ও ইরাবতীর উপস্থিতিতে নবীনা নায়িকা মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, পরে তার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন। নাটকের মূলে রয়েছে একটি ঐতিহাসিক ঘটনার পটভূমি।[১১] কবি কালিদাস এই ঐতিহাসিক পটভূমিকে মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের অপরিচিত অবস্থা, প্রথম সাক্ষাৎ এবং পুত্রের যবনবিজয়ের আনন্দের মুহূর্তে মালবিকার পরিচয় প্রদান ও সেই হর্ষোৎফুল্ল সভায় রাণী ধারিণীর প্রযত্নে অগ্নিমিত্রের হাতে রাজকুমারী মালবিকাকে সমর্পণ পর্যন্ত ঘটনাবলীকে চমৎকার নাট্যসূত্রে গ্রথিত করেছেন।

এই নাটকের নায়িকা বির্দভের রাজকুমারী মালবিকা অসামান্য সুন্দরী ও শিল্পকলায় নিপুণা, সঙ্গীত ও নৃত্যে অদ্বিতীয়া। অপরদিকে নায়ক বিদিশারাজ অগ্নিমিত্র ধীরললিত দক্ষিণ নায়ক, যিনি সর্বদা প্রেমবিহ্বল। এই অপ্রতিহত নায়ক শিল্পকলায় নিপুণ ছিলেন। নাটকের প্রথম অঙ্কে দেখা যায় মালবিকার ছবি দেখে রাজা অগ্নিমিত্র তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। ছবিতে ইরাবতীর পাশে তাঁকে আঁকা হয়েছে; রাণী ইরাবতী ছবিঘরে গিয়ে গুরুজীর আঁকা, যার রঙ তখনও শুকোয়নি এমন ছবিগুলি দেখছিলেন, তখন রাজা অগ্নিমিত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে ছবিতে রাণীর পাশে অঙ্কিত মেয়েটির প্রতি চমৎকৃত হয়ে তাঁর নাম জানতে উৎসাহিত হন। মালবিকাগ্নিমিত্র এমন একটি নাটক যেখানে নায়ক নায়িকা পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন চিত্রফলকে ছবি দেখে। চিত্রফলকে রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার ছবি দেখার পর থেকে এই নাটকের ঘটনা এগিয়েছে। তাই এই নাটকে চিত্রফলক এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

প্রথম অঙ্কে রাজকন্যা মালবিকার দুই সখী কৌমুদিকা ও বকুলাবলিকার কথোপকথন থেকে এই বৃত্তান্তটি জানা যায়।

কৌমুদিকা ঃ সখি কুত্র প্রস্থিতাসি।

বকুলাবলিকা ঃ দেব্যা বচনেন নাট্যাচার্যমার্যগণদাসমুপদেশগ্রহণে কীদৃশী মালবিকেতি প্রষ্টুম্।

কৌমুদিকা ঃ সখি ঈদৃশেন ব্যাপারেণাসন্নিহিতাপি দৃষ্টা কিল সা ভর্ত্রা।

বকুলাবলিকা ঃ আম্। দেব্যাঃ পার্শ্বগতঃ স জনশ্চিত্রে দৃষ্টঃ।

কৌমুদিকা ঃ কথমিব।

বকুলাবলিকা ঃ শৃণু। চিত্রশালাং গতা দেবী প্রত্যগ্রবর্ণরাগাং চিত্রলেখা-মাচার্যস্যাবলোকয়ন্তী তিষ্ঠতি। তস্মিন্নন্তরে ভর্তোপস্থিতঃ।

কৌমুদিকা ঃ ততস্ততঃ।

বকুলাবলিকা ঃ উপচারানন্তরমেকাসনোপবিষ্টেনদ ভর্ত্রা চিত্রগতায়া দেব্যাঃ পরিজন-মধ্যগতামাসন্নপরিচারিণীং দৃষ্ট্বা দেবী পৃষ্টা।

কৌমুদিকা ঃ কিমিতি।

বকুলাবলিকা ঃ দেবি অপূর্বেয়ং দারিকা তবাসন্না লিখিতা কিংনামধেয়েতি।

কৌমুদিকা ঃ ননু আকৃতিবিশেষেষ্বাদরঃ পদং করোতি। ততস্ততঃ।

বকুলাবলিকা ঃ ততো'বধীরিত বচনো ভর্তা শঙ্কিতো দেবীং পুনঃ পুনর্নির্বন্ধুং প্রবৃত্তঃ। যাবদ্দেবী ন কথয়তি তাবৎ কুমার্যা বসুলক্ষ্ম্যা-খ্যাতমাবুত্ত এষা মালবিকেতি। [১২]

ছবিতে হঠাৎ দেখা মালবিকাকে রাজা অগ্নিমিত্র প্রত্যক্ষ করার উৎসাহবোধ করেন। একথা নাটকে বিদূষকের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে —

বিদুষক ঃ আজ্ঞপ্তো'স্মি তত্রভবতা রাজ্ঞা গৌতম! চিন্তয় তাবদুপায়ম্ যথা মে যদৃচ্ছাদৃষ্টপ্রতিকৃতির্মালবিকা প্রত্যক্ষদর্শনা ভবতীতি। [১৩]

রাজা অগ্নিমিত্র এরপর যখন মালবিকাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন - ছবিতে দেখে এর রূপলাবণ্য বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল; এখন মনে হচ্ছে, যে তার ছবি এঁকেছে সে মন দিয়ে আঁকতে পারেনি।

চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা।। [১৪]

এই দৃশ্যকাব্যে ছবি আঁকার ঘটনাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। নায়িকার ছবি দেখে নায়ক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন এবং চিত্রফলকে দেখা ছবিই তাদের একসাথে মিলিত করছে। চিত্রফলকে অঙ্কিত ছবিই এখানে নাটকের সার্থক পরিণতি ঘটাচ্ছে।

রাজা অগ্নিমিত্র রাজকুমারী মালবিকার দেহ-সৌন্দর্য বর্ণনা করছেন এইভাবে; চোখ দুটি টানা টানা, মুখখানি শরৎকালের চাঁদ, কাঁধ থেকে নেমে এসেছে দুটি বাহু, ঘন উন্নত স্তনযুগল যুক্ত বক্ষদেশ, প্রশস্ত নিতম্বযুক্ত —

দীর্ঘাক্ষং শরদিন্দুকান্তি বদনং বাহূ নতাবংসয়োঃ
সংক্ষিপ্তং নিবিড়োন্নতস্তনমুরঃ পার্শ্বে প্রমৃষ্টে ইব।
মধ্যঃ পাণিমিতো নিতম্বি জঘনং পাদাবরাঙ্গুলী
ছন্দো নর্তয়িতুর্যথৈব মনসঃ শ্লিষ্টং তথাস্যা বপুঃ।। [১৫]

নাট্যে বর্ণিত মালবিকাকে কালিদাস যেন তুলি নিয়েই চিত্রিত করেছেন। এই বর্ণনা পাঠকের কাছে চিত্রপটের মতোই বোধ হয়।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নায়িকার যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এই দেহাবয়ব কালিদাস বর্ণনা করলেন।[১৬]

এই নাটকে নৃত্যরতা মালবিকাকে দেখে রাজা অগ্নিমিত্র মোহিত হয়ে পড়লেন, তখন এইভাবে তিনি নৃত্যরতা মালবিকার বর্ণনা করেছেন —

বামং সন্ধিস্তিমিতবলয়ং ন্যস্য হস্তং নিতম্বে
কৃত্বা শ্যামাবিটপসদৃশং স্রস্তমুক্তং দ্বিতীয়ম্।
পাদাঙ্গুষ্ঠালুলিতকুসুমে কুট্টিমে পাতিতাক্ষং
নৃত্তাদস্যাঃ স্থিতমতিতরাং কান্তমৃজ্বায়তার্ধম্।। [১৭]

আলোচ্য শ্লোকটিতে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। রাজা অগ্নিমিত্র নায়িকা মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন, যার দ্বারা রতিভাবের প্রকাশহেতু শৃঙ্গার রস উপস্থাপিত হয়েছে।

তার শরীরের উর্ধ্বাংশ সোজা রেখে সুন্দর দাঁড়ানোর ভঙ্গী, শ্যামারুলতার মতো ডান হাতের ভঙ্গী, বাঁ হাত নিতম্বে স্থাপিত, আনত চোখের দৃষ্টি - প্রভৃতি ভঙ্গীতে তাকে অপরূপ করে রেখেছিল। এই অপরূপ নৃত্যভঙ্গীকে কালিদাস বর্ণনা করেছেন —

অঙ্গৈরন্তর্নিহিতবচনৈঃ সূচিতঃ সম্যগর্থঃ
পাদন্যাসো লয়মনুগতস্তন্ময়ত্বং রসেষু।
শাখাযোনির্মৃদুরভিনয়স্তদ্বিকল্পানুবৃত্তৌ
ভাবো ভাবং নুদতি বিষয়াদ্রাগবন্ধঃ স এব।। [১৮]

কালিদাস যে চিত্র তুলে ধরেছেন দৃশ্যকাব্যে, চিত্রে তারই প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অজন্তা শিল্পী। অজন্তা চিত্রকলায় নারীদেহ যেভাবে চিত্রিত হয়েছে, কালিদাসের কাব্যেও তার প্রতিরূপ দেখা যায়।

তার শরীরের অভিনয়ে এবং প্রকাশভঙ্গীতে গানের অর্থ সুস্পষ্ট হয়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপ লয়-অনুসারে প্রকাশিত হয়েছে, এখানে রস যেন তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, হাতের মুদ্রা ছিল সুকুমার, ভাবের বহু বিচিত্র রূপ ধরা দিচ্ছিল।

মালবিকার হাসিমুখকে রাজা বর্ণনা করলেন - সদ্য ফোটা পদ্মের সঙ্গে, যা চিত্রকলার ষড়ঙ্গসূত্রের 'সাদৃশ্য'তে প্রতিফলিত হয়।

স্ময়মানমায়তাক্ষ্যাঃ কিঞ্চিদভিব্যক্তদশনশোভি মুখম্
অসমগ্রলক্ষ্যকেসরমুচ্ছ্বসদিব পঙ্কজং দৃষ্টম্ ।।[১৯]

কবি কালিদাস বর্ণনা করলেন, মালবিকা যেন রূপেই সুন্দর নয়, তিনি শিল্পকলাতেও অদ্বিতীয়া তাই অকৃত্রিম সুন্দরী মালবিকাকে ললিতকলার সঙ্গে যুক্ত করে বিধাতা যেন কামদেবের একটি বিষযুক্ত বাণ সৃষ্টি করেছেন।

অব্যাজসুন্দরীং তাং বিজ্ঞানেন ললিতেন যোজয়তা।
পরিকল্পিতোবিধাত্রা বাণঃ কামস্য বিষদিগ্ধঃ ।। [২০]

নাটকে দেখা যায় রাজা তার প্রেমিকার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন, দয়িতার আলিঙ্গন সুখের অভাবে তাঁর শরীর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, তাকে দেখতে না পেয়ে চোখে জল ভরে আসছে। কবি কালিদাস সেই দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন এইভাবে —

শরীরং ক্ষামং স্যাদসতি দয়িতালিঙ্গনসুখে
ভবেৎ সাস্রং চক্ষুঃ ক্ষণমপি ন সা দৃশ্যতে ইতি।
তয়া সারঙ্গাক্ষ্যা ত্বমসি ন কদাচিদ্বিরহিতং
প্রসক্তে নির্বাণে হৃদয়! পরিতাপং বহসি কিম্ ।। [২১]

সাধারণতঃ কালিদাসের নাটকেই কেবল নয়, সব নাটকেই মোটামুটিভাবে নায়ক তার প্রিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্ট পাচ্ছেন — এ দৃশ্য দেখা যায়। এখানে প্রিয়াবিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য করুণরসের উদ্‌বোধন হচ্ছে।[২২] রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যে কষ্টভোগ করছেন, তা যেন সেই চিরপ্রাপ্তিকে লাভ করা সত্ত্বেও রাজা কষ্ট পাচ্ছেন।

বসন্তঋতুর আর্বিভাবে নাট্যকার কালিদাস প্রকৃতিরও বর্ণনা করেছেন : কোকিলের শ্রুতিমধুর কূজন, আম্রমুকুলের গন্ধে সুরভিত দক্ষিণা বাতাস, এগুলি যে রাজার মনোব্যথাকে লাঘব করার সহায়ক হয়েছে —

আমত্তানাং শ্রবণসুভগৈঃ কূজিতৈঃ কোকিলানাং
সানুক্রোশং মনসিজরুজঃ সহ্যতাং পৃচ্ছতেব।
অঙ্গে চূতপ্রসবসুরভির্দক্ষিণো মারুতো মে
সান্দ্রস্পর্শ করতল ইব ব্যাপৃতো মাধবেন।। [২৩]

আম্রমুকুলের সুরভি, কোকিলের কূজন এগুলি এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সূত্র। এই সূত্র ধরেই বসন্তঋতুর আগমন ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

কবি কালিদাসের বসন্তঋতুর বর্ণনা এররূপ - রক্তাশোকের শোভা বিম্বাধরের রক্তিমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, কুরুবকের শ্যামল এবং শ্বেত অরুনিমা মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, কাজলকালো ভ্রমরশ্রেণী শোভিত তিলক ফুলগুলি যেন সুন্দরী রমণীদের মুখের তিলকক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে, বসন্তের সৌন্দর্য যেন রমণীদের মুখপ্রসাধনকে হার মানিয়েছে।

রক্তাশোকরুচা বিশেষিতগুণো বিম্বাধরালক্তকঃ
প্রত্যাখ্যাতবিশেষকং কুরবকং শ্যামাবদাতারুণম্।
আক্রান্তা তিলকক্রিয়া চ তিলকৈর্লগ্নদ্বিরেফাঞ্জনৈঃ
সাবজ্ঞেব মুখপ্রসাধনবিধৌ শ্রীমাধবী ঘোষিতাম্।। [২৪]

এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা কবি বসন্তের বর্ণনা করলেন - বসন্তের শোভা রমণীদের মুখের প্রসাধনকে হার মানিয়েছে, অর্থাৎ রমণীদের প্রসাধনের থেকেও বসন্তঋতু অধিক সেজে উঠেছে। রক্ত অশোকের শোভা - ওষ্ঠের রক্তিমাকে অতিক্রম করেছে, তিলকফুলগুলি এতই সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে যে, তা রমণীদের মুখের তিলকক্রিয়াকে অতিক্রম করেছে। এখানে রমণীদের প্রসাধনের ব্যঞ্জনায় বসন্তঋতু শোভা বর্ণিত হয়েছে।

কবি কালিদাস নারীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত। এই দৃশ্যকাব্যে তিনি মালবিকার বর্ণনা করেছেন বহুবার। প্রতিবারই যে নবরূপে আমরা নায়িকা মালবিকাকে পাই, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় মালবিকার সদৃশ চিত্রকলা ও ভাস্কর্যমূর্ত্তি আমরা দেখি। এ থেকে মনে করা যেতে পারে শিল্পকলা সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে।

বিপুলং নিতম্ববিম্বে মধ্যে ক্ষামং সমুন্নতং কুচয়োঃ।
অত্যায়তং নয়নয়োর্মম জীবিতমেতদায়াতি।।
শরকাণ্ডপাণ্ডুগণ্ডস্থলেয়মাভাতি পরিমিতাভরণা।
মাধবপরিণতপত্রা কতিপয়কুসুমেব কুন্দলতা।। [২৫]

নাটকে যখন নায়িকা মালবিকার পদ-রঞ্জিত করা হয়েছে অশোকতরু প্রস্ফুটিত করার জন্য, সেই পদরঞ্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে মহাদেবের কোপে দগ্ধ কামবৃক্ষের প্রথম পল্লবের প্রকাশরূপে -

চরণান্তনিবেশিতাং প্রিয়ায়াঃ সরসাং পশ্য বয়স্য! রাগলেখাম্।
প্রথমামিব পল্লবপ্রসূতিং হরদগ্ধস্য মনোভবদ্রুমস্য।। [২৬]

নায়িকা মালবিকার রঞ্জিত পদশোভাকে কচি কিসলয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি কালিদাস। এখানে ষড়ঙ্গ সূত্রের 'সাদৃশ্য' দেখা যায়। যে রঞ্জিত পায়ে অশোকতরুকে আঘাত করলে, বৃক্ষের কুসুম প্রস্ফুটিত হবে।

নবকিসলয়রাগেণাগ্রপাদেন বালা স্ফুরিতনখরুচা দ্বৌ হন্তুমর্হত্যনেন।
অকুসুমিতশোকং দোহদাপেক্ষয়া বা প্রণমিতশিরসং-
বা কান্তমার্দ্রাপরাধম্।। [২৭]

বৃক্ষে পদাঘাত করলে পুষ্প প্রস্ফুটিত হবে, এই বিষয়ক ভাস্কর্য প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় দেখা যায়। সাঁচীর বৃক্ষকা মূর্তির তুলনা করা যায়, নারীরা যখন দোহদ পূর্ণ করেন, তখন পদাঘাতের ঘটনাটি ঘটে থাকে।

কখনও বা মালবিকার কোমল পা-দুটিকে নতুন পদ্মের সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। যার আঘাতে যদি অশোকতরুতে পুষ্পসমাগম না হয়, তাহলে সেই বৃক্ষের দোহদ বৃথা - একথা বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় নায়িকার পদশোভা বহুভাবে চিত্রিত হয়েছে। কখনও ভাস্কর্যে কখনও বা চিত্রকলায় পদশোভার অনুকৃতি দেখা গেছে।

অনেন তনুমধ্যয়া মুখরনূপুরারাবিণা
নবাম্বুরুহকোমলেন চরণেন সংভাবিতঃ।
অশোক! যদি সদ্য এব মুকুলৈর্ন সম্পত্স্যসে
বৃথা বহসি দোহদং ললিতকামিসাধারণম্।। [২৮]

চতুর্থ অঙ্কে চিত্রফলকে অগ্নিমিত্রকে দেখে মালবিকা তাঁর প্রতি তৃপ্ত বোধ করলেন। তৎকালীন যুগে চিত্রফলকই ছিল মিলনের প্রধান মাধ্যম। যেখানে কখনও নায়ক, কখনও নায়িকা চিত্রপটে পরস্পরকে দেখে তাঁর প্রতি মোহিত হচ্ছেন। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণেও বলা হয়েছে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে গৃহশোভার জন্য চিত্রফলক থাকবে। [২৯]

চিত্রফলকে অগ্নিমিত্রকে দেখে মালবিকার উক্তি —

সখি তদা সম্মুখস্থিতা ভর্তৃরূপদর্শনেন ন তথা বিতৃষ্ণাস্মি যথাদ্য ময়া বিভাবিতশ্চিত্রগতদর্শনো ভর্তা। [৩০]

অভিমানী মালবিকার দেহভঙ্গি বর্ণনা করেছেন কবি কালিদাস এইভাবে —

ভ্রূভঙ্গভিন্নতিলকং স্ফুরিতাধরোষ্ঠং
সাসূয়মাননমিতঃ পরিবর্তয়ন্ত্যা।
কান্তাপরাধকুপিতেষ্বনয়া বিনেতুঃ
সন্দর্শিতেব ললিতাভিনয়স্য শিক্ষা।। [৩১]

এইভাবেই অভিমানী নারীর দেহভঙ্গি চিত্রেও প্রকাশিত হয়, সেখানে নায়িকার ওষ্ঠ স্ফুরিত হয়, ভ্রুভঙ্গে তিলক ভিন্ন হয়ে ওঠে। কবি কালিদাস শৃঙ্গার রসের নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন। সহকার তরুর সাথে অতিমুক্তলতার মতো শোভিত হওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। এখানে নায়ক-নায়িকার মিলনের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। রতি ভাবের উদ্ভব হওয়ায় শৃঙ্গার রস পরিস্ফুট হয়েছে।

বিসৃজ সুন্দরি সংগমসাধ্বসং তব চিরাৎপ্রভৃতি প্রণয়োন্মুখে।
পরিগৃহাণ গতে সহকারতাং ত্বমতিমুক্তলতাচরিতং ময়ি।।[৩২]

শৃঙ্গার রসের অপর একটি দৃশ্য কবি কালিদাস তুলে ধরেছেন —

হস্তং কম্পবতী রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলিং
হস্তৌ স্বৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাত্।
পাতুং পক্ষ্মলক্ষচক্ষুরুন্নময়তঃ সাচীকরোত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যভিলাষপূরণসুখং নির্বর্তয়ত্যেব মে।।[৩৩]

রাজা অগ্নিমিত্র মালবিকাকে আলিঙ্গণ করতে চাইলে, মালবিকা রাজাকে বাধাদানে উদ্যত হন, কম্পিত শরীরে মালবিকা রাজার মেখলা উন্মোচনে ব্যস্ত আঙুলের হাতকে রুদ্ধ করছেন, জোর করে আলিঙ্গন করলে নিজের দুটি হাতে স্তনাবরণ করছেন, অধরসুধা পান করতে গেলে সুন্দর চোখযুক্ত মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, একান্তভাবে এগুলি রাজাকে অভিলাষপূরণের সুখদান করছেন।

এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার উদ্ভব হয়েছে — মিলনে বাধাদানের মধ্য দিয়ে যেন মিলনের ঔৎসুক্যকে ব্যক্ত করছে। এখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থ প্রবল। নায়িকা মালবিকার মধ্যে মিলনে বাধাদানের ঘটনা ঘটছে, তা সত্ত্বেও রাজাকে অভিলাষ পূরণের সুখ দান করেছেন নায়িকা মালবিকা। রতিভাবের উদ্বোধন হেতু এখানে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

কবি কালিদাস কনের সাজে সজ্জিতা মালবিকার বর্ণনা করেছেন —

অনতিলম্বিদুকূলনিবাসিনী বহুভিরাভরণৈঃ প্রতিভাতি মে।
উডুগণৈরুদয়োন্মুখচন্দ্রিকা গতহিমৈরিব চৈত্রবিভাবরী।।[৩৪]

বহু অলঙ্কারে সজ্জিত মালবিকাকে চৈত্রের নক্ষত্রশোভিত রাত্রির জোৎস্নার সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি। এরকম বহুচিত্র অজন্তা গুহা চিত্রকলায় দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় কোনো মহিলাকে তার সখীরা অলংকারে সজ্জিত করছেন, এরকম চিত্র দেখা গেছে। নতমুখ নায়িকা সখীবেষ্ঠিত রয়েছেন সেখানে। গুপ্তযুগীয় সংস্কৃত সাহিত্য যে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছিল, তার দৃষ্টান্ত এখানে দেখা গেল।

।। বিক্রমোর্বশীয়ম্।।

কালিদাসের অপর রচনা *বিক্রমোর্বশীয়* পঞ্চাঙ্ক নাটক যেটির কাহিনী হল পুরূরবা - উর্বশীর প্রেম। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাচীন ও জনপ্রিয় এই কাহিনীর নায়ক পুরূরবা। নায়িকা স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী। পুরূরবা বিক্রমবলে কেশীদানবের হাত থেকে মুক্ত করে উর্বশীকে লাভ করেছিলেন। তাই নাটকের নাম *বিক্রমোর্বশীয়*। *বিক্রমোর্বশীয়* কাহিনীর প্রাচীনতম উৎস *ঋগ্বেদ*।[৩৫] *ঋগ্বেদ*-এর বিয়োগাত্মক কাহিনীকে মিলনান্তক করেছেন কবি কালিদাস।

নাটকটির বিষয়বস্তু এইরূপ — কৈলাস পর্বত থেকে সঙ্গিনীদের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন কালে অপ্সরা উর্বশী যখন অসুরদের হাতে লাঞ্ছিতা হন, তখন মর্তের রাজা পুরূরবা ঐ স্থান দিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। অপ্সরার আর্তনাদ শুনে রাজা তাকে দানবের হাত থেকে রক্ষা করেন। প্রথম দর্শনেই উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। তারপর উর্বশী সখীদের সঙ্গে ফিরে গেলেন; কিন্তু তার মনে মর্ত্য রাজার প্রেমের স্মৃতি অম্লান রইল। প্রেমমুগ্ধ রাজা যখন প্রমোদ-উদ্যানে নর্মসহচর বিদূষকের কাছে গোপন কাহিনী প্রকাশ করে মনের কথা খুলে বলছেন, তখন উর্বশী সেখানে অলক্ষিতে উপস্থিত হয়ে সেই কথাবার্তা শুনে গভীর প্রেমে আবদ্ধা হলেন। কিন্তু উভয়ের সাক্ষাৎ না ঘটতেই উর্বশীকে সেই স্থান ত্যাগ করে দেবদূতের আহ্বান শুনে সত্বর স্বর্গের দেবসভায় ফিরে যেতে হল, কারণ সেখানে ভরত সম্পাদিত নাট্যাভিনয়ে নায়িকার ভূমিকায় তাকে অংশগ্রহণ করতে হবে। ভূর্জপত্রে লেখা অপ্সরার প্রেমপত্র প্রমোদবনে সবার অলক্ষ্যে পড়ে রইল। এমন সময় রাজমহিষী পরিচারিকার সঙ্গে সেখানে হাজির হলেন। দুর্ভাগ্যবশে উর্বশী রচিত

প্রেমপত্র রাণীর পরিচারিকা নিপুণিকার দৃষ্টিগোচর হল। নিপুণিকা সেটি কুড়িয়ে মহারাণীর হাতে দিলেন। গোপনে প্রেমের খবর ফাঁস হয়ে গেল; পুরূরবা হাতেনাতে ধরা পড়ে স্ত্রীর পায়ে ধরে মার্জনা চাইলেন। রাণী স্বামীকে ক্ষমা করলেন। অতঃপর চতুর রাজা মহারাণীর ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উদাসীন রইলেন। অন্যদিকে স্বর্গে লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নাটকে উর্বশী 'পুরযোত্তম' শব্দের পরিবর্তে 'পুরূরবা' শব্দ উচ্চারণ করে আচার্যের দ্বারা অভিশপ্তা হলেন যে স্বর্গ ত্যাগ করে মর্তে জীবন কাটাতে হবে। কিন্তু ইন্দ্রের অনুগ্রহে শাপ বরে পরিণত হল - সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত উর্বশী পুরূরবার সান্নিধ্য লাভ করবেন। মণিহর্ম্যপৃষ্ঠে অভিসারিকার বেশধারিণী উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার মিলন হল। রাজমহিষীর অনুগ্রহে পুরূরবা উর্বশীকে গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একদিন উর্বশী প্রণয়কোপে নিজের অজ্ঞাতে স্ত্রীলোকের নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করে লতায় পরিণত হলেন। প্রেমোন্মাদ রাজা বৃক্ষলতা-পশু-পাখীকে প্রিয়তমার সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তারপর দৈববশে 'সংগমন' মণির স্পর্শে উর্বশী পুনরায় স্বদেহ ফিরে পেলেন। প্রেমিক-প্রেমিকার পুণর্মিলন হল। অন্যদিকে তাদের পুত্র আয়ু পিতার অজ্ঞাতে বড় হচ্ছিল। একদিন এক বাণবিদ্ধ পাখী হঠাৎ পুরূরবা-উর্বশীর সামনে এসে পড়ল; উভয়ে লক্ষ করলেন সেই বাণে তাদের পুত্র আয়ুর নাম লেখা। কিছুক্ষণ পর জনৈকা স্ত্রীলোক আয়ুকে সঙ্গে করে তার মায়ের হাতে সঁপে দেওয়ার জন্য উর্বশীর কাছে উপস্থিত হলেন। এবার পুত্রমুখ দর্শনের ফলে উর্বশীকে স্বর্গে ফিরতে হবে। এই সময় দেবদূত নারদ হাজির হয়ে সমগ্র ঘটনা জানলেন এবং দেব-দানব সংগ্রামে দেবতাদের সাহায্য করতে পুরূরবাকে ইন্দ্রের আহ্বান জানালেন। অবশেষে পুরূরবা বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ আজীবন স্বর্গে অপ্সরা উর্বশীর সান্নিধ্য লাভের বর পেলেন। যদিও *বিক্রমোর্বশীয়* দৃশ্যকাব্যে চিত্রাঙ্কনের কোনো বর্ণনা কবি করেননি। তবুও সমগ্র নাটক জুড়ে যে রসের প্রয়োগ হয়েছে, ব্যঞ্জনার আভাস আছে, তা থেকে নাটকটির উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাটকের চতুর্থ অঙ্ক জুড়ে রয়েছে নাচগানের দৃশ্য। চর্চরী, চর্চরিকা, দ্বিপদিকা, কুটিলিকা প্রভৃতি নাচের দৃশ্য বর্ণনা এখানে পাই। নৃত্যের সঙ্গে যেহেতু চিত্রের যোগ রয়েছে, তাই সেই অর্থে এখানে চিত্রের প্রসঙ্গ উত্থিত হয়েছে।[৩৬]

নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে নাটকটিকে বিচার করলে, উর্বশীর রূপবর্ণনা কালিদাস রাজা পুরূরবার মাধ্যমে করেছেন। উর্বশীর আয়ত নয়নকে কবি বর্ণনা করেছেন — পদ্মলতা যেমন ভোরের পদ্মটি মেলে ধরে তেমনি।

গতং ভয়ং ভীরু সুরারিসম্ভবং
ত্রিলোকরক্ষী মহিমা হি বজ্রিণঃ।
তদেতদুন্মীলয় চক্ষুরায়তং
মহোত্পলং প্রত্যুষসীব পদ্মিনী।।[৩৭]

কবি কালিদাস ভীতা উর্বশীর বর্ণনা করে তাঁর হৃদয় কম্পনকে পদ্মবৃন্তের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মুঞ্চতি ন তাবদস্যাঃ কম্পং কুসুমসমবন্ধনং হৃদয়ম্।
পশ্য হরিচন্দনেন স্তনমধ্যোচ্ছ্বাসিনা কথিতম্।।[৩৮]

এখানে ভয় স্থায়িভাব থেকে ভয়ানক রসের সঞ্চার হয়েছে। পদ্মবৃন্ত ও পদ্মলতার ব্যঞ্জনায় এখানে উর্বশীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন কালিদাস।

পুরূরবার রথের বর্ণনা কালিদাস যেভাবে করেছেন, তা দেখে মনে হচ্ছে যেন ছবিতে আঁকা কোন দৃশ্যবর্ণনা —

অগ্রে যান্তি রথস্য রেণুবদমী চূর্ণীভবন্তো ঘনা-
শ্চক্রভ্রান্তিররান্তরেষু জনয়ত্যন্যামিবারাবলীম্।
চিত্রন্যস্তমিবাচলং হয়শিরস্যায়ামবচ্চামরং
যষ্ট্যগ্রে চ সমং স্থিতো ধ্বজপটঃ প্রান্তে চ বেগানিলাৎ।।[৩৯]

রথ এত দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে যে, দেখে মনে হচ্ছে ঘোড়ার মাথার দীর্ঘচামর স্থির হয়ে আছে, চাকা এত জোরে ঘুরছে যে শলাকাগুলোর মধ্যে আরও এক প্রস্থ

শলাকা যেন দেখা যাচ্ছে। দণ্ডের চূড়া এবং নিজের পরিধিপ্রান্ত পর্যন্ত পতাকাও টানটান হয়ে আছে জোর বাতাসে। কবি কালিদাস স্বয়ং এই দৃশ্য বর্ণনাকে 'চিত্রন্যস্ত' বা চিত্রে অঙ্কিত বলে বর্ণনা করেছেন।

কালিদাস আগত বসন্তঋতুর বর্ণনা করেছেন, এখানে তিনি ব্যক্ত করেছেন বসন্তশোভা যেন শৈশব আর যৌবনের মাঝামাঝি অবস্থায় আছে — এই ব্যঞ্জনাটি এখানে বড় সুন্দর রূপে ধরা দিয়েছে -

অগ্রে স্ত্রীনখপাটলং কুরবকং শ্যামং দ্বয়োভাগয়ো-
র্বালাশোকমুপোঢ়রাগসুভগং ভেদোন্মুখং তিষ্ঠতি।
ঈষদ্বদ্ধরজঃ কণাগ্রকপিশা চূতে নবা মঞ্জরী
মুগ্ধত্বস্য চ যৌবনস্য চ সখে মধ্যে মধুশ্রীঃ স্থিতা।। [৪০]

শ্রীনখের মতো পাটলরঙে দু-পাশে কালো কুরবক রয়েছে, তরুণ অশোক উপচে পড়া রক্তরঙে মনোরম হয়ে এই ফুটি ফুটি এমন ভাব নিয়ে আছে, সহকার তরুতে নবমঞ্জরী পরাগের ছোঁয়ায় শিষের দিকে কালো হলুদ রঙের ছোপ নিয়েছে। এই বসন্তের আসার প্রস্তুতির সৌন্দর্য যেন কবি কালিদাস সহৃদয় পাঠকের মনে এক রঙিন ছবির সঞ্চার করেছেন।

প্রাচীন ভারতে চিত্রাঙ্কণের যে প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ এখানে বিদুষকের সঙ্গে রাজার কথোপকথনে ধরা পড়েছে। বিদুষক রাজাকে বলছেন - আপনি নিদ্রা যান, ওই নিদ্রাই স্বপ্নে উর্বশীর সঙ্গে আপনার মিলন ঘটাবে অথবা সেই উর্বশীর প্রতিকৃতি এঁকে তার দিকে চেয়ে থাকো। এই প্রতিকৃতি অঙ্কণের ঘটনাটি থেকে এরূপ অনুমিত হয় যে, তৎকালীন যুগে নায়ক কর্তৃক নায়িকার প্রতিকৃতি অঙ্কনের খুবই প্রচলন ছিল।

বিদুষক ঃ স্বপ্নসমাগমকারিণীং নিদ্রাং সেবতাং ভবান্। অথ বা তত্রভবত্যা উর্বশ্যাঃ প্রতিকৃতিমালিখ্যাবলোকয়ংস্তিষ্ঠ। [৪১]

এর উত্তরে রাজা পুরূরবা বলেছেন - সেই সুমুখীকে চিত্রে সম্পূর্ণরূপে দেখার আগেই যে আমার দু-চোখ জলে ভরে যাবে।

হৃদয়মিষুভিঃ কামস্যান্তঃ সশল্যমিদং সদা
কথমুপলভে নিদ্রাং স্বপ্নে সমাগমকারিণীম্।
ন চ সুবদনামালেখ্যে'পি প্রিয়ামসমাপ্য তাং
মম নয়নয়োরুদ্বাষ্পত্বং সখে ন ভবিষ্যতি।।[৪২]

এখানে উর্বশীর প্রতি রাজা এতটাই প্রণয়াসক্ত যে নায়িকার প্রতি রাজার রতিভাবের সঞ্চারিত হওয়ার আলোচ্য প্রসঙ্গটি এসে পড়েছে, রসনিষ্পত্তিতে এই বিভাবটি সহায়ক হয়েছে।

কোথাও শৃঙ্গাররসের প্রসঙ্গটি কবি কালিদাস এত নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, সেখানে উর্বশী-পুরূরবার মিলনকে কবি তুলনা করেছেন তপ্ত লোহার পাতের সঙ্গেই তপ্ত লোহার পাতের সংযোজন ঘটে। উভয়ের প্রণয়কে এখানে একইরকম ভাবে ব্যক্ত করেছেন কবি।

পর্যৎসুকাং কথয়সি প্রিয়দর্শনাং তা-
মার্তং ন পশ্যসি পুরূরবসং তদর্থে।
সাধারণো'য়মুভয়োঃ প্রণয়ঃ স্মরস্য
তপ্তেন তপ্তময়সা ঘটনায় যোগ্যম্।।[৪৩]

তৃতীয় অঙ্কে, যেখানে রাজা পুরূরবা প্রেমানলে দগ্ধ হচ্ছেন, সেখানে উর্বশীর করস্পর্শে শীতল হওয়ার প্রসঙ্গটি কবি কালিদাস একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন যে, কুমুদ চন্দ্রাকিরণেই উচ্ছ্বসিত হয়, সূর্যাকিরণে নয় —

অঙ্গমনঙ্গক্লিষ্টং সুখয়েদন্যা ন মে করস্পর্শাৎ।
নোচ্ছ্বসিতি তপনকিরণৈশ্চন্দ্রস্যৈবাংশুভিঃ কুমুদম্।।[৪৪]

এখানেও শৃঙ্গার রসের উদ্বোধন ঘটেছে। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের সঙ্গে মিলনে উৎসুক। এই ঔৎসুক্যহেতু এখানে রতিভাবের উদয় হয়েছে।

সুন্দরী উর্বশীর দেহসুষমা একাধিকবার কবি ব্যক্ত করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীর বিচ্ছেদে বিলাপকারী রাজার মুখে কালিদাস আরও একবার উর্বশীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন এইভাবে —

অপি বনান্তরমল্পকুচান্তরা শ্রয়তি পর্বত পর্বসু সন্নতা।
ইদননঙ্গপরিগ্রহমঙ্গনা পৃথুনিতম্ব নিতম্ববতী তব।।[৪৫]

সুরসুন্দরী জঘনভরালসা পীনোত্তুঙ্গঘনস্তনী
স্থিরযৌবনা তনুশরীরা হংসগতিঃ।
গগনোজ্জ্বলকাননে মৃগলোচনা ভ্রমন্তি
দৃষ্টা ত্বয়া তদ্বিরহসমুদ্রান্তরাদুত্তারয় মাম্।।[৪৬]

নায়িকা উর্বশীর প্রশস্ত স্থূল নিতম্ব, পীনোন্নত স্তনযুগল, ক্ষীণ দেহ, হরিণের মতো নয়ন, দেহের সন্ধিগুলি সুডৌল - এমন দেহকান্তিযুক্ত নায়িকার প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন কবি কালিদাস। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলায় অনুরূপ চিত্র এবং ভাস্কর্য দেখা যায়, বিশেষতঃ অজন্তা গুহাচিত্রের মধ্যে কালিদাসের বর্ণিত নায়িকার সদৃশ চিত্রাকৃতি মেলে।

রক্তকদম্বতরুর পুষ্পচয়ন করে উর্বশী কেশগুচ্ছের অলংকার করেছিল, এই কাব্যিক সুষমা প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে বহুবার চিত্রিত হয়েছে, কবি কালিদাস দৃশ্যকাব্যের চতুর্থ অঙ্কে সেই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন —

রক্তকদম্বঃ সো'য়ং প্রিয়য়া ঘর্মান্তশংসি যস্যৈকম্।
কুসুমমসমগ্রকেসরবিষমমপি কৃতং শিখাভরণম্।।[৪৭]

পঞ্চম অঙ্কে পুরূরবা ও উর্বশীর পুনর্মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে কবি কালিদাস বাৎসল্য চিত্র প্রদর্শন করেছেন। সাহিত্যে দশম রসরূপে বাৎসল্য রসকে ধরা হয়। এই রসের স্থায়িভাব হল বাৎসল্য। মূলতঃ বিক্রমোর্বশীয় নাটকের অঙ্গীরস হল শৃঙ্গার। সহকার রস রূপে কখনও ভয়ানক রস, কখনও বা করুণ রসের সঞ্চার ঘটেছে। কবি কালিদাস সুনিপুণভাবে প্রতিটি রসের সূক্ষ্ম প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এই দৃশ্যকাব্যে।

।।অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।।

কালিদাসস্য সর্বস্যমভিজ্ঞানশকুন্তলম্।[৪৮] এই প্রচলিত উক্তিই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এই নাটকটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রমাণ করে। *কাব্যেষু নাটকং রম্যং নাটকেষু শকুন্তলা*[৪৯] — এই উক্তি থেকে অনুধাবন করা যায় নাটকটির জনপ্রিয়তার কথা। *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যে কবি কালিদাসের অমর সৃষ্টি। পাশ্চাত্য জার্মান পণ্ডিত গ্যয়্টে এই নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন —

"Willst du die Blüte des frühen die Früchte des Spa`tern Jahres,
Willst du, was reizt und entzückt, willst du was sa`ttig and nahrt
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem, Namen begriefen,
Nenn'ich, Sakontala, Dich, und so ist alles gesagt,"[৫০]

অর্থাৎ প্রভাতের ফুল আর বর্ষশেষের ফল যদি কেউ একত্রে দেখতে চান, যা মুগ্ধ করে, যা প্রসন্ন করে, যা তুষ্টি এবং পুষ্টি আনে তা যদি একত্রে পেতে চান, একটা নামে যদি স্বর্গ আর মর্ত্যকে মেশাতে জান তাহলে, শকুন্তলা, আমি তোমারই নাম করছি, আর তা হলেই সব কথা বলা হয়ে যায়।

গ্যয়্টে কৃত এই শকুন্তলা প্রশস্তির পাশাপাশি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — 'শকুন্তলার মতো এমন প্রশান্ত গম্ভীর, এমন সংযত সম্পূর্ণ নাটক শেক্স্পিয়রের নাট্যাবলীর মধ্যে একখানিও নাই।'[৫১]

শকুন্তলা কাহিনীর উৎস মহাভারতের আদিপর্ব। সপ্তম অঙ্ক বিশিষ্ট এই নাটকের

নায়ক রাজা দুষ্যন্ত মৃগয়ায় বেরিয়ে পথ ভুলে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে এসে একাকিনী শকুন্তলার সান্নিধ্য পেলেন। গন্ধর্বমতে তিনি শকুন্তলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের সন্তান রাজসিংহাসনের অধিকারী হবে এই শর্তে শকুন্তলা বিবাহে সম্মতি দিলেন। দুর্বাসার শাপে দুষ্যন্ত স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে নিজপত্নী শকুন্তলাকে স্মরণ করতে ব্যর্থ হন। লোকনিন্দার ভয়ে তাকে অস্বীকার করেন, প্রত্যাখান করেন। অভিশাপ অনুযায়ী অভিজ্ঞান দর্শনে স্মৃতি ফিরে আসে ও পুত্রসহ শকুন্তলার সঙ্গে পুনরায় রাজার মিলন ঘটে। শাপের নৈতিকতা সমগ্র নাটকটিকে এক বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত করেছে।

এই দৃশ্যকাব্য রচনা করার সময় কবি কালিদাসের কবিসত্তা শিল্পীসত্তায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কালিদাস যে নিখুঁতভাবে দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু তুলে ধরেছেন, তা একজন সার্থক চিত্রশিল্পীর ক্ষেত্রেই সম্ভব। সমগ্র নাটক জুড়ে এমন বহু ছবি আমরা পাই, যা কবির লেখনীতে দৃশ্যপটে পরিণত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কেই দেখি - দুষ্যন্ত চলেছেন রথে, মৃগকে অনুসরণ করে। কবির বর্ণনায় ধাবমান মৃগটিকে আমরা যেন চোখের সামনে দেখছি। তার ভয়, তার পিছু ফিরে তাকানো, তার শূন্যে লাফিয়ে চলা - সব যেন প্রত্যক্ষ। রাশ ছেড়ে রথের গতি বাড়িয়ে দেওয়ার পর ছুটন্ত ঘোড়ার দৃষ্টি আশ্চর্য সজীব; বিস্তারিত দেহ, নিশ্চল চামর, উত্তোলিত কর্ণ, উৎক্ষিপ্ত ধূলি; আর সেই সঙ্গে রথের গতির আশ্চর্য বর্ণনা : দ্রুতগতিতে যে দৃষ্টিবিভ্রম তার কী নিখুঁত ছবি। ছবির পর ছবি - কবি কালিদাস যেন ‘ছবি লেখেন’।

গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ
পশ্চার্দ্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্দ্ধাবলীঢৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ৎসা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্ বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রয়াতি।।[৫২]

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলঙ্ঘনীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ।।[৫৩]

হরিণকে অনুসরণরত ধনুকধারী দুষ্যন্তকে সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো বোধ হচ্ছে। এই ছবিও কালিদাসের কলমে চিত্রিত হয়েছে —

কৃষ্ণসারে দদচ্চক্ষুস্তয়ি চাধিজ্যকার্মুকে।
মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্।।[৫৪]

তপোবনের ছবিও ধরা দিচ্ছে - রাজা সারথিকে বললেন এ যে তপোবনের প্রান্তভূমি কেউ না বলে দিলেও বোঝা যায়। সারথি বললেন কি করে বুঝলেন? রাজা বললেন - কেন, দেখছ না? ঐ যে গাছতলায় নীবার ধান, ও তো শুকপাখির মুখ থেকে খসে পড়া, ঐ যে চক্‌চকে পাথরগুলো, ইঙ্গুদী ফল ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তেই ওগুলো এমন হয়েছে। ঐ যে হরিণগুলো শব্দ শুনেও পালাচ্ছে না, দাঁড়িয়ে আছে, ওরা ঐভাবেই অভ্যস্ত। জলাশয়ের পথ বলে দিচ্ছে বল্কল থেকে ঝড়ে পড়া জলের রেখা।

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কলশিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।।[৫৫]

কী অপূর্ব ছবি। জলসেচনে ক্লান্ত শকুন্তলাই হোন আর মেদচ্ছেদকৃশোদর-বপু দুষ্যন্তই হোন - সব যেন নিখুঁত শিল্পীর আঁকা ছবি। হরিণেরা খুর ভাঙ্‌ছে। যজ্ঞবেদীর আঙিনায় আঁচড় কেটে সে উঠছে, পিছন দিকটা ঐ উঁচু হয়ে উঠলো তারপর দেহটা বিস্তারিত হল। বনদেবীরা হাত বাড়িয়ে শকুন্তলার জন্য দিচ্ছেন পরিচ্ছদ, অলংকার প্রসাধনী। তাকিয়ে দেখার মতো সে ছবি।

কবি কালিদাস যেখানে পূর্ণযৌবনা শকুন্তলার দেহসৌন্দর্য বর্ণনা করছেন, শকুন্তলার অধর নতুন পাতার মত রক্তাভ, দুই বাহু যেন কোমল শাখা, সারা দেহে যেন ফুলের মতো লোভনীয় যৌবন ছড়িয়ে আছে। নারীদেহ এখানে ফুলের উপমার ধরা দিয়েছে। নারীদেহের চিত্র অঙ্কনে তাই কবি কালিদাস প্রকৃতির আশ্রয় নিলেন।

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্।।[৫৬]

সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরূপ শিল্পকলা গুপ্তযুগে সৃষ্টি হয়েছিল। শকুন্তলার বর্ণনা কবি যেভাবে দিয়েছেন, সেভাবেই অজন্তার চিত্রকলায় শিল্পী চিত্রসৃষ্টি করেছেন। শিল্পকলা যে সাহিত্যনির্ভর তা অজন্তা সূত্র ধরে বলা চলে। অজন্তার নারীচরিত্রের অধর কিসলয়রাগে রঞ্জিত, বাহুদ্বয় কোমলশাখার ন্যায়; শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে বাহুদ্বয় হবে করিশুণ্ডবৎ ইত্যাদি।

কবি শকুন্তলার দেহলাবণ্য বর্ণনা করে বলেছেন - মানব শরীরে এ অপূর্ব রূপ কি করে সম্ভব হলো, এরূপতো কেবল স্বর্গেই সম্ভব। তাই রাজা দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলার রূপের প্রসংশা করছেন, তখন শকুন্তলা লজ্জায় মাথা নীচু করে থেকেছেন।

মানুষীষু কথং বা স্যাদস্য রূপস্য সম্ভবঃ।
ন প্রভা-তরলং জ্যোতি রুদেতি বসুধাতলাৎ।।[৫৭]

শকুন্তলার হরিণের মতো চোখ, রাজা যখন হরিণের চক্ষু দর্শন করছেন তখন তাঁর শকুন্তলার চোখের অনুরূপ বলে ভ্রম হচ্ছে, তাই রাজার মনে হয়েছে হরিণগুলি যেন শকুন্তলার সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে সরলতায় ভরা মধুর দৃষ্টি শিখে নিয়েছে।

ন নময়িতুমধিজ্যমস্মি শক্তো
ধনুরিদমাহিত-সায়কং মৃগেষু।
সহবসতিমুপেত্য যৈঃ প্রিয়ায়াঃ
কৃত ইব মুগ্ধবিলোকিতোপদেশঃ।।[৫৮]

এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষয়টিকে বর্ণনা করেছেন কবি। হরিণের চক্ষুর দ্বারা শকুন্তলার চক্ষুকে বর্ণনা করেছেন কবি। অর্থাৎ এখানে প্রতীয়মান অর্থ হল — উভয়ের সরলতায় ভরা মধুর দৃষ্টি।

শকুন্তলাকে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা আগে চিত্রে অঙ্কন করে তারপরে যেন তাতে প্রাণদান করেছেন। অথবা সমস্ত রূপ একত্র করে মনে মনেই তাকে সৃষ্টি করেছেন। কবি কালিদাস শকুন্তলার দেহলাবণ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একথা বলেছেন।

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।
স্ত্রীরত্নসৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।। [৫৯]

এই দৃশ্যকাব্যের ৫ম অঙ্কে শকুন্তলা যখন রাজসভায় দাঁড়িয়ে দুষ্যন্তের প্রতি ক্রোধান্বিত হচ্ছেন, তখন তাঁর দৈহিক বর্ণনা তুলে ধরেছেন কালিদাস —

মষ্যেব বিস্মরণদারুণচিত্তবৃত্তৌ
বৃত্তং রহঃ প্রণয়প্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা
ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য।। [৬০]

এখানে ভয়ানক রসের সঞ্চার হয়েছে। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ভয়ানক রস সম্বন্ধে বলেছেন - ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয়।

অথঃ ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ। [৬১]

বিকৃত রব, সংগ্রাম প্রভৃতির জন্য ভয়ানক রসের সঞ্চরণ হয়।

বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনসংগ্রামারণ্যশূণ্যগৃহগমনাৎ।
গুরুনৃপয়োরপরাধাৎ কৃতকশ্চ ভয়ানকো জ্ঞেয়ঃ।।[৬২]

পবিত্র, শুদ্ধ শকুন্তলাকে ফুলের সঙ্গে কবি তুলনা করলেন, যার আঘ্রাণ কেউ গ্রহণ করেনি, কেউ তাকে স্পর্শ করেনি। শকুন্তলা যেন নব পল্লব, যাকে কেউ নখ দিয়ে ছিন্ন করেনি। এমন মধু যে কেউ তার আস্বাদ গ্রহণ করেনি।

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।।[৬৩]

এইভাবে কবি কালিদাস শকুন্তলার দেহসৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে নানান উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। চিত্রে ষড়ঙ্গের ‘সাদৃশ্য’ এখানে বর্ণিত হয়েছে, নবপল্লব সদৃশ শকুন্তলার বর্ণনা করেছেন কবি।

এই নাটকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিদুষককে ঘিরে আছে হাস্যরস। রাজা ও বিদুষকের কথোপকথনে হাস্যরসের প্রয়োগ করেছেন কালিদাস।

যথা কস্যাপি পিণ্ডখর্জূরৈঃ উদ্বেজিতস্য তিন্তিল্যাম্ অভিলাষো ভবেৎ, তথা স্ত্রীরত্নপরি-ভোগিণো ভবতঃ ইয়মভ্যর্থনা।[৬৪]

হাস্যরসের লক্ষণ প্রসঙ্গে নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে — *অথ হাস্যো নাম হাসস্থায়িভাবাত্মকঃ।*[৬৫]

বিপরীতালঙ্কারৈর্বিকৃতাচারাভিধানবেষৈশ্চ।
বিকৃতৈরঙ্গবিকারৈর্হসতীতি রসঃস্মৃতো হাস্য।।
বিকৃতাকারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈর্বিকৃতবেষৈশ্চ।
হাসয়তি জনং যস্মাৎ তস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ।।[৬৬]

পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার অর্ন্তর্ধানস্থলে অদ্ভুত রসের উপস্থাপন ঘটিয়েছেন কবি কালিদাস। তারই একটি কথোপকথন তুলে ধরা হল —

(নেপথ্যে) আশ্চর্যমাশ্চর্যম্!

রাজা (কর্ণংদত্ত্বা) : কিং নু খলু স্যাৎ।

(প্রবিশ্য)

পুরোধাঃ (সবিস্ময়ম্) : দেব, অদ্ ভুতং খলু সংবৃত্তম্।

রাজা : কিমিব।

পুরোধাঃ : দেব, পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু -
সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা
বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা।

রাজা : কিঞ্চ।

পুরোধাঃ : স্ত্রীসংস্থানঞ্চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্
উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম।।
(সর্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি) [৬৭]

আচার্য ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে অদ্ভুত রস প্রসঙ্গে বলেছেন যে —

অথাদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ দিব্যদর্শনেপ্সিত-মনোরথাবাপ্ত্যুত্তমভবনদেবকুলাভিমনসভাবিমানমায়েন্দ্রজালসাধনাদিভির্বিভা-বৈরুৎপদ্যতে তস্য নয়নবিস্তারানিমি-ষপ্রেক্ষণরোমাঞ্চাশ্রুস্বেদহর্ষসাধুবাদপ্রদান-প্রবন্ধহাহাকারকরবাহুবদনচেলাঙ্গুলি-ভ্রমণাদিভি - রণুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্য। ব্যভিচারিভাবাশ্চস্যা অশ্রুস্তম্ভস্বেদগদগদরোমাঞ্চাবেগ-সম্ভ্রমজড়তাপ্রলয়াদয়ঃ। [৬৮]

সপ্তম অঙ্কে সর্বদমনের বাল্যক্রীড়ার স্থলে বাৎসল্য রসের সঞ্চার ঘটেছে।

প্রথমা : *অবিনীত! কিং নঃ অপত্য-নির্বিশেষাণি সত্ত্বানি বিপ্রকরোষি। হন্ত, বর্ধতে তে সংরম্ভঃ। স্থানে খলু ঋষিজনেন সর্বদমন ইতি কৃতনামধেয়োऽসি।*

রাজা : *কিং নু খলু বালেऽস্মিন্ ঔরস ইব পুত্রে স্নিহ্যতি মে মনঃ। (বিচিন্ত্য) নুনমননত্যতা মাং বৎসলয়তি।*

দ্বিতীয়া : *এষা খলু কেসরিণী ত্বাং লঙ্ঘয়িষ্যতি যদ্যস্যাঃ পুত্রকং ন মোক্ষ্যসি।*

বালঃ : *(সস্মিতম্) অম্মহে, বলীয়ঃ খলু ভীতোऽস্মি। (ইত্যধরং দর্শয়তি)* [৬৯]

সন্তানবৎ স্নেহ-তাড়না ইত্যাদি নিয়েই বাৎসল্য রস। এর স্থায়িভাব হল বৎসলতা।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রধানতঃ আদি বা শৃঙ্গাররসাশ্রিত। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে ঋষিকুমারদ্বয় কর্তৃক গুণগানে বীররসের অবতারণা হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে সন্ধ্যা বর্ণনায় ভয়ানক রস। চতুর্থাঙ্কে করুণ; ষষ্ঠাঙ্কে মাধব্যের প্রতি মাতলির অত্যাচারে বীভৎস ও দুষ্যন্তে উক্তিতে রৌদ্ররস; অবশেষে সপ্তমাঙ্কে দুষ্যন্তের অপরাজিতাবলয় স্পর্শে তাপসীদ্বয়ের কথায় অদ্ভুত রস প্রকটিত হয়েছে।

মূলতঃ *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* নাটকে সমগ্র ষষ্ঠ অঙ্ক জুড়ে রয়েছে রাজা দুষ্যন্তের চিত্রাঙ্কনের কথা। রাজা দুষ্যন্ত যখন শকুন্তলাকে অকারণ ত্যাগ করে বিরহকাতর, তখন তিনি শকুন্তলার প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছিলেন। এই ছবি খুবই সাদৃশ্যাত্মক বা রিয়ালিস্টিক হয়েছিল, যা রাজা দুষ্যন্তের সখা বিদূষকের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। ঐ চিত্রের প্রশংসা করে বিদূষক বলেছেন — 'ছবিতে আঁকা উঁচু নীচু জায়গায় আমার চোখ যেন স্থির থাকছে না।' এই দৃশ্যে সানুমতীও বলেছেন — 'ছবিতে অঙ্গের বিন্যাস এত সুন্দর হয়েছে যে মনে হচ্ছে মনের ভাব যেন ব্যক্ত হয়েছে।' অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে শকুন্তলার চিত্রাঙ্কন দৃশ্যটি কালিদাস এইরূপে ব্যক্ত করেছেন —

রাজা	*ঃ*	*অকারণপরিত্যাগানুশয়তপ্তহৃদয়স্তাবদনুকম্প্যতাময়ং জনঃ পুনর্দর্শনেন। (প্রবিশ্যাপটীক্ষেপেণ চিত্রফলকহস্তা)*
চতুরিকা	*ঃ*	*(চিত্রফলকং দর্শয়তি) ইয়ং চিত্রগতা ভট্টিনী।*
বিদূষকঃ	*ঃ*	*সাধু বয়স্য, মধুরাবস্থানদর্শনীয়ঃ ভাবানুপ্রবেশঃ। স্খলতি ইব মে দৃষ্টিঃ নিম্নোন্নতপ্রদেশেষু।*
সানুমতী	*ঃ*	*অহো, এষা রাজর্ষেঃ নিপুণতা! জানে সখী অগ্রতঃ মে বর্ততে ইতি।* [৭০]

এই দৃশ্যে সানুমতীও রাজার প্রশংসা করে বলেছেন — আহা, মহারাজের আঁকায় কি দক্ষতা! মনে হচ্ছে আমার সখী (শকুন্তলা) যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে।

শকুন্তলার চিত্র কিরূপ ছিল সেই প্রসঙ্গে রাজা নিজেই বলেছেন —

যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্। [৭১]

অর্থাৎ রাজা দুষ্যন্ত বলেছেন — 'ছবিতে যা যা একেবারে নিঁখুত হয়নি মনে হচ্ছে, সেগুলোকে একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছি। তবুও (মোটামুটিভাবে) রেখার মাধ্যমে তার লাবণ্য কিছুটা তুলে ধরতে পেরেছি।'

অভিজ্ঞান-শকুন্তলের ৬ষ্ঠ অঙ্কে চিত্রদর্শন প্রসঙ্গে বিদূষকের দৃষ্টিতে চিত্রফলকে তিনজন নারীর ছবি দেখে, রাজার প্রতি তাঁর কৌতুহলী প্রশ্ন — 'ছবিতে তিনজন রমণীকে দেখতে পাচ্ছি, সকলেই দেখতে সুন্দর, এদের মধ্যে কোন্ জন শকুন্তলা? আবারও তিনি নিজেই বলেছেন — 'মাথায় খোপা খুলে যাওয়ায় যার চুলের প্রান্ত থেকে ফুল খসে পড়েছে, মুখে যার ঘাম লেগে রয়েছে, হাত দুখানা যার শিথিল হয়ে

আছে, জল-সেচন করায় দেখতে স্নিগ্ধ এবং নতুন পাতা বেরিয়েছে এমন আমগাছের পাশে কিছুটা পরিশ্রান্তের মতো যাকে আঁকা হয়েছে — সেই হচ্ছে শকুন্তলা। আর অন্য দুজন তার সখী।

বিদূষকঃ	ঃ	*ভোঃ, ইদানীং তিস্রঃ তত্রভবত্যঃ দৃশ্যন্তে। সর্বাঃ চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা?*
সানুমতী	ঃ	*অনভিজ্ঞঃ খলু ঈদৃশস্য রূপস্য মোহদৃষ্টিঃ অয়ং জনঃ।*
রাজা	ঃ	*ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?*
বিদূষকঃ	ঃ	*তর্কয়ামি যা এষা শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেনোদ্‌ভিন্ন-স্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতঃ অপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাম্‌ অবসেকস্নিগ্ধ-তরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎপরিশ্রান্তা ইব আলিখিতা সা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যৌ ইতি।*
রাজা	ঃ	*নিপুণো ভবান্‌। অস্ত্যত্র মে ভাবচিহ্নম্‌।* *স্বিন্নাঙ্গুলিবিনিবেশো রেখাপ্রান্তেষু দৃশ্যতে মলিনঃ।* *অশ্রু চ কপোলপতিতং দৃশ্যমিদং বর্তিকোচ্ছ্বাসাৎ।।* *চতুরিকে, অর্ধলিখিতমেতদ্বিনোদস্থানম্‌। গচ্ছ, বর্তিকাং তাবদানয়।* [৭২]

রাজা দুষ্যন্ত যে জলরঙে ছবি আঁকছিলেন তার ছাপ স্পষ্ট। কারণ শকুন্তলা বিরহকাতর রাজার চোখের জলের ফোঁটা ছবিতে আঁকা শকুন্তলার গালে পড়েছে এবং ছবির প্রথম দেওয়া রঙ্‌ সেখান থেকে ফুটে বেরিয়ে তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে। এমনকি, ছবির ধারের রেখাগুলি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে আমার ঘর্মাক্ত আঙ্গুল থেকে কালো ছোপ পড়েছে। সুতরাং চিত্তবিনোদনের একমাত্র আশ্রয় এই ছবিটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য রাজা উদ্যোগী হলেন।

রাজা দুষ্যন্ত স্বীকার করছেন যখন শকুন্তলা তাঁর কাছে নিজেই উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁকে অবজ্ঞা করে এখন ছবিতে আঁকা সমাদর করছেন।

সাক্ষাৎ প্রিয়ামুপগতামপহায় পূর্বং
চিত্রার্পিতামহমিমাং বহু মন্যমানঃ।
স্রোতোবহাং পথি নিকামজলামতীত্য
জাতঃ সখে ! প্রণয়বান্ মৃগতৃষ্ণিকায়াম্।।[৭৩]

যে চিত্রফলকে রাজা সখী সহ শকুন্তলার ছবি অঙ্কন করেছেন, সেখানে আরও কিছু দৃশ্য সংযোজন করতে চান। শকুন্তলার সাথে রাজার যেখানে প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেই স্থানের দৃশ্য রাজা অঙ্কন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছেন — 'পাড়ে হংসমিথুন বসে আছে এমন মালিনী নদী আঁকতে হবে; সেই নদীর দুই পাড়ে হরিণেরা বসে আছে এমন হিমালয়ের পবিত্র ছোট ছোট (প্রত্যন্ত) পর্বত আঁকতে হবে। তাছাড়া ডালে পরিধেয় বল্কল ঝুলছে এমন গাছের তলায় একটি কৃষ্ণসার হরিণের শিঙে নিজের বাম চোখ ঘষছে, এমন এক হরিণীও আমি আঁকতে চাই।

কার্যা সৈকতলীনহংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী
পাদাস্তামভিতো নিষন্নহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ।
শাখালম্বিতবল্কলস্য চ তরোর্নির্মাতুমিচ্ছাম্যধঃ
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কন্ডূয়মানাং মৃগীম্।।[৭৪]

এই নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্কে রাজা দুষ্যন্ত যখন ছবি আঁকছেন, তখন তাঁর পূর্বের সুখস্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে তাই তিনি মালিনী নদীর বর্ণনা টেনে এনেছেন, কখনও বা হরিণদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেদ - পূর্বস্মৃতির ছবি দুষ্যন্ত আঁকতে ইচ্ছুক হয়েছেন। এখানে কবি কালিদাস রাজা দুষ্যন্তের বিরহদশার মধ্যে প্রেমের দীপ্তি উদ্ভাসিত করেছেন। তাই দীর্ঘ বিরহদশার পরে ছবি আঁকছেন দুষ্যন্ত।

কাব্যে দেখা যায় যে, ধীরোদাত্ত নায়কেরা শিল্পকলায় পারদর্শী যেমন দুষ্যন্তের চিত্রকলা বিদ্যায় পারদর্শিতা। *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* নাটকে বিশাল অংশ জুড়ে শুধুই বিরহ। এই বিরহদশায় সাধারণতঃ নায়কদের দেখা যায় নৃত্য-গীত-বাদ্য-চিত্র এর মধ্যে নিজেকে আত্মস্থ করতে। তাই এই দৃশ্যকাব্যেও কবি কালিদাস তাঁর নায়ক দুষ্যন্তকে চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত রেখেছেন। দীর্ঘ বিরহদশায় দুষ্যন্ত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে নিজেকে রসিত বা জারিত করে নিচ্ছেন। বিরহদশাজনিত এখানে করুণ রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

কবি কালিদাস করুণ রসের প্রতিচ্ছবি বিরহিনী শকুন্তলার করুণ মূর্তিটির অপরূপ বর্ণনা করেছেন —

বসনে পরিধূসরে বসানা
নিয়মাক্ষামমুখী ধৃতৈকবেনিঃ।
অতিনিষ্করুণস্য শুদ্ধশীলা
মম দীর্ঘং বিরহব্রতং বিভর্ত্তি।। [৭৫]

শকুন্তলার অঙ্গে ধূসর বসন, বিরদব্রত পালনের ফলে শীর্ণ তাঁর মুখ, কেশপাশ শুধু একটি বেণীতে বদ্ধ, দেখলেই উপলব্ধি হয় শুদ্ধস্বভাবা পতিব্রতা এই নারী দীর্ঘদিন বিরহব্রত পালন করছেন নিষ্ঠাভাবে। কবি কালিদাস করুণ রসের প্রতিকৃতিরূপে শকুন্তলাকে বর্ণনা করেছেন।

কবি কালিদাস এখানে দুষ্যন্তের মাধ্যমে শকুন্তলাকে ভূষণে সজ্জিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই তিনি রাজার মাধ্যমে শকুন্তলার প্রিয় ভূষণ আঁকতে ইচ্ছা করেন —

কৃতং ন কর্ণা-র্পিত-বন্ধনং সখে,
শিরীষমাগণ্ড-বিলম্বি-কেশরম্।
ন বা শরচ্চন্দ্র-মরীচি-কোমলং
মৃণাল-সূত্রং রচিতং স্তনান্তরে।। [৭৬]

অর্থাৎ, রাজার হঠাৎই মনে পড়েছে শকুন্তলার কর্ণভূষণ অঙ্কণ করা হয়নি। বোঁটার দিকটা শকুন্তলার কানে পরানো আছে আর কেশরগুলি গাল পর্যন্ত ঝুলে আছে, এমন এক শিরীষ ফুল আঁকা হয়নি। তাছাড়া শরতের চাঁদের কিরণের মতো শুভ্র এবং মৃদু মৃণালের হারও প্রিয়ার স্তনদ্বয়ের মধ্যে আঁকা হয়নি।

যদিও কালিদাস খুব সূক্ষ্মভাবেই ভাবের মধ্য দিয়ে শকুন্তলাকে অঙ্কন করেছেন, নানান ভূষণে সজ্জিত করেছেন সুনিপুণভাবেই। কর্ণের ভূষণ শিরীষফুলের কেশরগুচ্ছ - এমন একটি চিত্র অজন্তাগুহার দেওয়াল চিত্রে আমরা পাই।

ছবিতে শকুন্তলা লালপদ্মের পাপড়ির মতো আঙ্গুলে মুখ ঢেকে যেন খুব চকিতভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। কারণ, ফুলের মধু চুরি করে বেড়ানো ভ্রমর শকুন্তলার মুখের দিকে ছুটে আসছে।

ভোঃ, কিংনু তত্রভবতী রক্তকুবলয়পল্লবশোভিনা অগ্রহস্তেন মুখম্ অপবার্য চকিতচকিতা ইব স্থিতা। আঃ, এষ দাস্যাঃ পুত্রঃ কুসুমরসপাটচ্চরঃ তত্রভবত্যাঃ বদনম্ অভিলঙ্ঘতি মধুকরঃ। [৭৭]

এখানে কালিদাস শকুন্তলার হস্তদ্বয়কে ‘লালপদ্মের মতো আঙ্গুল’ বলে বর্ণনা করেছেন, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে এবং ভাস্কর্যে বহু রয়েছে। চিত্রকলার ষড়ঙ্গসূত্রের ‘সাদৃশ্য’ অনুযায়ী এখানে আঙ্গুলকে লালপদ্মের সঙ্গে তুলনা করলেন কবি কালিদাস।

এমনকী, রাজা দুষ্যন্ত চিত্রফলকে অঙ্কিত শকুন্তলার দিকে ধাবমান ভ্রমরকে নিষেধ করেছেন এইভাবে — ‘ওহে ভ্রমর, অন্য কারুর স্পর্শে ম্লান হয়নি এমন ছোট চারাগাছের নতুন পল্লবের মত লোভনীয় প্রিয়ার এই রক্তিম অধর, যা আমি মিলনোৎসবের সময়ও সদয়ভাবে ধীরে ধীরে পান করেছি, তা যদি তুমি স্পর্শ কর, তবে তোমায় আমি কমলিনীর অভ্যন্তরে বন্দী করে রাখব।’

অক্লিষ্টবালতরুণপল্লবলোভনীয়ং
পীতং ময়া সদয়মেব রতোৎসবেষু।
বিম্বাধরং স্পৃশসি চেদ্ ভ্রমর প্রিয়ায়া
ত্বাং কারয়ামি কমলোদরবন্ধনস্থম্।। [৭৮]

চিত্রফলকে অঙ্কিত শকুন্তলাকে যেন রাজা দুষ্যন্ত চাক্ষুস প্রত্যক্ষ করছেন, কারণ তিনি বিস্মৃত হয়েছেন যে, এটা ছবি। অর্থাৎ কালিদাস তৎকালীন সমাজে চিত্রফলকে বা চিত্রপটের গুরুত্ব যে কতখানি তা বোঝাতে চেয়েছেন।

দর্শনসুখমনুভবতঃ সাক্ষাদিব তন্ময়েন হৃদয়েন।
স্মৃতিকারিণা ত্বয়া মে পুনরুপি চিত্রীকৃতা কান্তা।। [৭৯]

শকুন্তলা বিরহে রাজার চোখ বাস্পাচ্ছন্ন, তাই ছবিতেও শকুন্তলাকে দেখতে পাচ্ছেন না, তাই রাজার আক্ষেপ - চোখে জল এসে ছবিতে আঁকা শকুন্তলাকেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, এমনকী রাতে ঘুম আসে না, যাতে স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হবেন।

প্রজাগরাৎ খিলীভূতস্তস্যাঃ স্বপ্নে সমাগমঃ।
বাষ্পস্তু ন দদাত্যেনাং দ্রষ্টুং চিত্রগতামপি।। [৮০]

অভিজ্ঞান-শকুন্তল দৃশ্যকাব্যের বেশীরভাগ অংশ জুড়েই আছে, চিত্রপটে রাজা দুষ্যন্তের শকুন্তলার চিত্রপটের কাহিনী। প্রাচীন ভারতে রাজপরিবারে চিত্রঙ্কনের প্রচলন ছিল। তা এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নাটকে নায়ক দুষ্যন্তের চোখে শুধু নারীদেহের ছবিই ধরা পড়ে না, বিপুলা এ পৃথিবীর বিচিত্র ছবিও তাঁর চোখ এড়ায় না। কালিদাস সকলের চোখ দিয়ে এইভাবেই দেখেছেন মানুষ আর প্রকৃতিকে আর ছবির পর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। এই নাটকের বিশেষত্ব এই যে, এখানে প্রতিটি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথোপোকথন পর্যন্ত যেন তুলি দিয়ে আঁকা যায়।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কালিদাসের প্রতিভা সম্বন্ধে বলেছেন - 'কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিতা মায়ারাজ্য - রূপযৌবনসমাছন্ন এবং রমণীয়।' [৮১]

কালিদাসের তিনটি নাটকেই রস, রীতি, ধ্বনি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন — 'কালিদাস একজন সুনিপুণ চিত্রকর। রঙ ফলাইতে অদ্বিতীয়। শেড দিবার ক্ষমতাও খুব আছে। সকলের অপেক্ষা তাঁহার বাহাদুরি সাজানোতে আর বাছিয়া লওয়াতে।... তিনি চিত্রকরের চক্ষে জগৎ দেখিতেন ও কবির কলমে লিখিতেন।' [৮২]

কালিদাসের কাব্যের প্রধান গৌরব ব্যঞ্জনা। তিনি কখনও বাহুল্য প্রকাশ করেননি। যেটুকু বোঝানো দরকার, যে ভাবটুকু প্রকাশ করতে হবে, তা তিনি সামান্য দু-একটি কথায় ধ্বনির (suggestion) মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। বাচ্যার্থের মধ্যেই তাই ব্যঞ্জনার্থ প্রকাশিত হয়েছে আবার পরিমিতিবোধও ব্যক্ত হয়েছে।

'নবসরুচিরা' কবি কালিদাসের কাব্যের বাণী, কালিদাসের রচনায় তা প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেয়। শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ - যে কোন রসই তাঁর প্রতিভায় পরিপাক হয়ে বাগদেবীর অনর্ঘ নৈবেদ্যে পরিণত হয়েছে।

উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে কালিদাস এক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। নবরস নির্মাণের মতোই কালিদাসের ভাষা ও শব্দের প্রয়োগ যথার্থ। এজন্য কালিদাস সম্বন্ধে প্রচলিত উক্তি —

উপমা কালিদাসস্য নোত্কৃষ্টেতি মতং মম।
অর্থান্তরস্য বিন্যাসে কালিদাসো বিশিষ্যতে।। [৮৩]

মূলতঃ সাহিত্যের রস, রীতি, ধ্বনি এমনভাবে ব্যক্ত হয়েছে, তা যেন

শিল্পকলাতেই সম্ভব। কবি কালিদাস এখানে দৃশ্যকাব্যত্রয়ীর রস, রীতি, ধ্বনিকে শিল্পকলায় পর্যবসিত করেছেন। সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে গুপ্তযুগীয় শিল্পীগণ তাদের শিল্পসৃষ্টি করেছিলেন, এই তিন দৃশ্যকাব্যে তার দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* ২০০৯, পৃ. ১৪৭।

২। *কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্* । *অভিজ্ঞানশকুন্তলম্.* (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ১৯৯৯, পৃ. ৫০।

৩। *তদেব,* পৃ. ৪২।

৪। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ১.২.১৪।

৫। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ১.২.১১।

৬। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্.* (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ১৯৯৯, পৃ. ৪২।

৭। *তদেব,* পৃ. ৫০।

৮। *তদেব,* পৃ. ৮১।

৯। *তদেব,* পৃ. ৪০।

১০। নাটকের ভরতবাক্যে — *সংপৎস্যতে ন খলু গোপ্তাতি নাগ্নিমিত্রে - রাজা অগ্নিমিত্রের প্রশংসা, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের (১৮৪-১৪৯ খ্রি. পূ.) পুত্র এই অগ্নিমিত্র, যিনি শুঙ্গবংশীয় নৃপতি।* ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, ২০০৯, পৃ. ১৫৫।

১১। S. P. Pandit - 'the drama was probably written, while the story of Agnimitra's conquest was yet fresh in men's mind and not invented with the hazy mist of legendary obscurity.

১২। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার,* ১৯৮১ গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.), *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* প্রথম অঙ্ক, পৃ. ২৬০।

১৩। *তদেব,* পৃ. ২৬২।

১৪। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.২।

১৫। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.৩।

১৬। *নাট্যশাস্ত্র,* ২১.৩০।

১৭। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.৬।

১৮। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.৮।

১৯। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.১০।

২০। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ২.১৩।

২১। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.১।

২২। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬২-৬৩।

২৩। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.৪।

২৪। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.৫।

২৫। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.৭-৮।

২৬। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.১১।

২৭। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.১২।

২৮। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.১৭।

২৯। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ।*

৩০। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* চতুর্থ অঙ্ক।

৩১। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৪.৯।

৩২। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৪.১৩।

৩৩। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৪.১৫।

৩৪। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৫.৯।

৩৫। *ঋগ্বেদ,* ১০.৯৫।

৩৬। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩.৩৫.৫-৭।

৩৭। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ১.৫।

৩৮। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ১.৬।

৩৯। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ১.৪।

৪০। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ২.৭।

৪১। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, প্রথম অঙ্ক। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার, ১৯৮২ গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.), পৃ. ২০২।

৪২। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ২.১০।

৪৩। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ২.১৬।

৪৪। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ৩.১৬।

৪৫। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ৪.২৬।

৪৬। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ৪.২৭।

৪৭। *বিক্রমোর্বশীয়ম্*, ৪.৩০।

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০।

৪৯। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*. (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ১৯৯৯, পৃ. ৫০।

৫০। *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.), (খণ্ড - ২), পৃ. ৫৫।

৫১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *প্রাচীন সাহিত্য*, ১৪২২, পৃ. ৫১।

৫২। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.৭।

৫৩। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.৮।

৫৪। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.৬।

৫৫। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.১৪।

৫৬। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.১৯।

৫৭। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ১.২৩।

৫৮। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ২.৩।

৫৯। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ২.৯।

৬০। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৫.২৩।

৬১। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৬৯।

৬২। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৬৯।

৬৩। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ২.১০।

৬৪। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, দ্বিতীয় অঙ্ক।

৬৫। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৪৯।

৬৬। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৫০।

৬৭। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, পঞ্চম অঙ্ক।

৬৮। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৭৫।

৬৯। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, সপ্তম অঙ্ক।

৭০। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ষষ্ঠ অঙ্ক।

৭১। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.১৪।

৭২। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.১৫।

৭৩। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.১৬।

৭৪। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.১৭।

৭৫। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৭.২১।

৭৬। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.১৮।

৭৭। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ষষ্ঠ অঙ্ক।

৭৮। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.২০।

৭৯। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.২১।

৮০। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্*, ৬.২২।

৮১। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালিদাসের চিত্রাঙ্কণী প্রতিভা* (প্রবন্ধ), পৃ. ১২২।

৮২। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, *কালিদাস ও শেক্সপীয়র*, পৃ. ২৪০।

৮৩। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্.* (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ১৯৯৯, পৃ. ৪৬।

(খ) নাট্যকার ভবভূতি

সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকার হিসেবে ভবভূতি এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। দৃশকাব্যের জগতে তিনি কালিদাসের সমকক্ষ নাট্যকার বলে সুপরিচিত। অধিকাংশ সংস্কৃত কবিরাই নিজেদের ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে মৌন হলেও ভবভূতি তাঁর নাটকে নিজের বংশপরিচয় উদ্ধৃত করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন, দাক্ষিণাত্যের এর পরম নিষ্ঠাবান সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জন্ম। পূর্বপুরুষেরা ছিলেন তৈত্তিরীয় শাখী, কাশ্যপগোত্রীয় আর 'উদুম্বর' এই বংশ নামে পরিচিত। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ আর মাতার নাম জাতুকর্ণী।

অস্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র ব্রাহ্মণঃ কেচিত্তৈত্তিরীয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ কাশ্যপঃ পঞ্চাগ্নয়া সোমপীথিনো ধৃতব্রতা উদুম্বরনামানো ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। [১]

তে শ্রোত্রিয়াস্তত্ত্ববিনিশ্চয়ায় ভূরিশ্রুতং শাশ্বতমাদ্রিয়ন্তে।
ইষ্টায় পূর্তায় চ কর্মণে'র্থান্‌দারানপত্যায় তপোর্থমায়ুঃ।। [২]

তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তেনীলকণ্ঠস্য পুত্রঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদবাক্যপ্রমাণজ্ঞো ভবভূতির্নাম কবির্নিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু বর্তমানঃ স্বকৃতিমেবংগুণভূয়সীমস্মাকং হস্তে সমর্পিতবান্। যত্র খল্বিয়ং বাচোযুক্তিঃ। [৩]

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম তু কোহপি সমানধর্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধিবিপুলা চ পৃথ্বী।। [৪]

নাট্যসাহিত্যে ভবভূতির গৌরবোজ্জ্বল অবদান তাঁর নাটকত্রয়ীর জন্য। আনুমানিক খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীতে কবি ভবভূতির নামাঙ্কিত *মালতীমাধব*, *মহাবীরচরিত* ও *উত্তররামচরিত* এই তিনটি নাটক পাওয়া যায়। এদের মধ্যে *উত্তররামচরিত* দৃশ্যকাব্যটি বিশেষ জনপ্রিয় ও উল্লেখযোগ্য।

কবি ভবভূতির দৃশ্যকাব্যের রীতি ঃ

কবি ভবভূতি গৌড়ীরীতির কবি। তাঁর নাটকত্রয়ীতে গৌড়ীরীতির প্রাধান্য দেখা যায়। উল্লেখ্য, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কবিসমাজে ভাষার প্রয়োগে ভিন্ন রুচি দেখতে পাওয়া যায়। আর ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিকৃতিতেও ভিন্ন ভিন্ন শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সে শৈলী বা রীতি গড়ে ওঠে তদানীন্তন পাঠক ও দর্শক সমাজের রুচি অনুযায়ী। ভবভূতির কাব্যশৈলী এটাই প্রমাণ করে যে, সে যুগের কাব্য বা নাট্যকৃতি ততটা সাধারণের জন্যে নয়, সেগুলি একান্তই বিদগ্ধ গোষ্ঠীর বিনোদনের জন্য।

গৌড়ীরীতি লক্ষণ প্রসঙ্গে রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামন বলেছেন — *ওজঃ কান্তিমতী গৌড়ীয়া*।[৫] অর্থাৎ, ওজঃ ও কান্তিগুণে ভূষিত রীতিকে রীতিবিশেষজ্ঞরা গৌড়ী রীতি বলে থাকেন।

সমস্তাত্যুদ্ভটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়ামিতি গায়ন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ।।[৬]

কবি ভবভূতির দৃশ্যকাব্য *মালতীমাধব* প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। প্রকরণের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই দৃশ্যকাব্যের রচনারীতি ওজোদৃপ্ত ভাষায় গ্রন্থিত যা দৃশ্যকাব্যের পরিপন্থী। এই দৃশ্যকাব্যের সংলাপের ভাষা দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদযুক্ত তাই প্রকরণের গতি শিথিল হয়ে পড়েছে বারংবার। সখীদের বিশ্রম্ভালাপে, নায়ক-নায়িকার প্রেমবিন্যাসের বর্ণনাতেও দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ খুবই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। তাই রূপকের ভাষা কাঠিন্যের দিকে দৃষ্টি না রাখার ফলে, ওজঃগুণের প্রাধান্য হেতু এখানে, গৌড়ীরীতির সমাবেশ ঘটেছে।

ভবভূতির অপর দৃশ্যকাব্য *মহাবীরচরিত*-এর রচনারীতি অতিমাত্রায় অলংকৃত। গদ্যে এবং পদ্যে দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার দৃশকাব্যটিকে গুরুগম্ভীর করে তুলেছে। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন - নাটকীয় ভাষণ হবে সুখকর এবং সহজবোধ্য। কিন্তু সেই তুলনায় মহাবীরচরিত কঠিন। এই কাঠিন্যের আরও একটি কারণ — সমাসবহুল ওজঃগুণ যা গদ্যকাব্যের প্রাণ স্বরূপ, সেই ওজঃগুণই *মহাবীরচরিত*-এ বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে।

আচার্য বামন গৌড়ীরীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে *মহাবীরচরিত*-এর নিম্নোক্ত শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন —

দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-
ষ্টকারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
দ্রাক্পর্যস্তকপালসম্পুটমিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর-
ভ্রামত্পিণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।। [৭]

ভবভূতির অন্যতম দৃশ্যকাব্য *উত্তররামচরিত* নাটক ভবভূতির পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি - *উত্তররে রামচরিতে ভবভূতিবিশেষ্যতে*।[৮] ভবভূতি গৌড়ীয় রীতির পক্ষপাতী, তাই ওজোগুণযুক্ত সমাস-প্রিয়তা তাঁর রচনার একটি বৈশিষ্ট্য।

কবি ভবভূতির ভাষার ওপর এমনই দখল ছিল যে, তিনি প্রয়োজনে অনেকক্ষেত্রে সমাস বা শব্দের আড়ম্বর ত্যাগও করেছিলেন। ভবভূতি গৌড়ীরীতির পক্ষপাতী হলেও তাঁর শিল্পীসত্তাই তাঁকে এই পথে পরিচাহিত করেছে। ভবভূতির প্রকৃতি বর্ণনায় উঠে এসেছে প্রকৃতির গম্ভীর ও মহিমায় রূপ।

ভবভূতির উদ্ভাবিত কাহিনী মৌলিক। এখনে নাট্যরসের বিকাশ ও নাটকের এক সার্থক পরিণতি দেখা যায়। সমগ্র নাটকের মধ্যে শৈল্পিক বিকাশ সুসংযোজিত। নাটকের কাহিনী বিন্যাস, উদ্ভাবনী শক্তি, ঘটনার সংঘাতে মুখ্য চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্ব এবং সব মিলিয়ে উচ্চাঙ্গের নাট্য রচনা করেছেন তিনি।

ভবভূতির রচনারীতি সম্বন্ধে সমালোচকদের মন্তব্য 'কালিদাস ও অনান্যরা কবি ভবভূতি মহাকবি'।

কবয়ঃ কালিদাসদ্যা ভবভূতির্মহাকবিঃ।[৯]

ভবভূতির রচনারীতি সরল নয়, কখনও কখনও অতিজটিল, দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ কখনও বা দুর্বোধ্য, সম্ভবতঃ তিনি স্বেচ্ছায় নাট্যরীতির মধ্যে মহাকাব্যিক শৈলীর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

ভবভূতেঃ শিখরিণী নিরর্গলতরঙ্গিণী।
রুচিরা ঘনসন্দর্ভে যা ময়ূরীব নৃত্যতি।।[১০]

।। মালতীমাধবম্ ।।

সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্র অনুসারে *মালতীমাধব* একটি দশাঙ্ক প্রকরণ অর্থাৎ সামাজিক রূপক। এম. আর. কালের মতে *মালতীমাধব* ভবভূতির প্রথম রচনা।[১১] এটি শৃঙ্গাররস প্রধান দৃশকাব্য। *মালতীমাধব*-এ মূলগল্প একটি প্রেমোপাখ্যান। এই প্রকরণের নায়ক মাধব ধীরপ্রশান্ত লক্ষণযুক্ত, অমাত্যপুত্র এবং নায়িকা মালতী উচ্চবংশ সম্ভূত।

মালতীমাধবের কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপটি হল — উজ্জয়িনীর মন্ত্রিকন্যা মালতীর সঙ্গে রাজ্যান্তর থেকে আগত তরুণ শিক্ষার্থী মন্ত্রিপুত্র মাধবের প্রণয় আলোচ্য প্রকরণের বিষয়বস্তু। মালতীর পিতা নিজের মনোমত পাত্রের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক। বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে মাধবের বন্ধু মকরন্দ এবং তার পিতৃপরিচিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুনী কামন্দকীর কার্যকুশলতায় প্রেমের মিলনান্ত পরিণতি ঘটে। মূল কাহিনীর সাথে মালতীর প্রণয়প্রার্থী নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সঙ্গে মকরন্দ নামক জনৈক তরুণের প্রণয়কাহিনীও যুক্ত। মালতীমাধবের কাহিনী ভবভূতির স্বকল্পিত এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

এই প্রকরণে চিত্রপট অঙ্কণের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে। নায়িকা মালতীকে তাঁর প্রেমিক মাধবের ছবি আঁকতে দেখা গেছে। মাধবকে দেখার পর মালতী ব্যথা ভোলার জন্য দয়িতের ছবি এঁকেছে, চিত্রপটটি দাসী লবঙ্গিকাকে দিয়ে সে আবার মন্দারিকার কাছে সেটি গচ্ছিত রাখে। মন্দারিকা যখন অনুপস্থিত তখন কলহংস ছবিটি পেয়ে তার প্রভু মাধবের কাছে এনে হাজির করে। তখন মকরন্দ মাধবকে পরামর্শ দেয় ঐ পটে মালতীর একটি ছবি আঁকতে। মাধব শুধু ছবিই আঁকলো না, নীচে একটি শ্লোকও লিখে দিল। মন্দারিকা কলহংসের খোঁজে এসে ছবিটি পেয়ে

গেল এবং সেটি নিয়ে মালতীর কাছে ফিলে এল। এইভাবে নায়ক-নায়িকার মধ্যে প্রেমের বন্ধন আরও দৃঢ় হয়েছে চিত্রপট অঙ্কণের মাধ্যমে।

প্রকরণের প্রধান রস শৃঙ্গার হলেও কাপালিকের অস্বাভাবিক চরিত্র, নরবলির প্রথা, শ্মশানের দৃশ্য - এগুলি রৌদ্র ও বীভৎস রসের উৎপত্তি হয়েছে। তাই এই প্রকরণের প্রধান বা অঙ্গী রস শৃঙ্গার এবং অঙ্গ রস বীভৎস, ভয়ানক ও অদ্ভুতের সংমিশ্রনে প্রধান রস পর্যাপ্তভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। Macdonell *মালতীমাধব* প্রকরণের সঙ্গে Shakespeare-কৃত Romeo and Juliet নাটকে অঙ্কিত আবেগমধুর প্রণয়ের তুলনা করেছেন।[১২]

রচনা রীতির দিক থেকে মালতীমাধব নিখুঁত ও আর্কষণীয়। *মালতীমাধব* প্রকরণে ভবভূতি যে রসবৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, সেখানে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য মূল কাহিনীর মধ্য দিয়ে একটি উপকাহিনীতে সঞ্চারিত হয়েছে। এই আখ্যানের বিরাট পটভূমি, ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য, রসের বিস্তার — সবই একই সাথে নাটকে উপস্থিত।

এই প্রকরণে কবি একাধিক রসের পরিবেশন করেছেন নিপুণ হাতে। যদিও মূল কাহিনী এবং আনুষঙ্গিক কাহিনীতে শৃঙ্গার রসই প্রধান। বীভৎসরস ও ভয়ানক রস শৃঙ্গার রসের বিরোধী হলেও কবি পাশাপাশি তাদের পরিবেশনে সফল হয়েছেন।

যেমন — কুসুমাকর উদ্যানে এসে কামন্দকী মদনব্যথাহত মাধবের দুর্গতির বর্ণনা করছেন; লবঙ্গিকাও মনোরম ভঙ্গীতে কামন্দকীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করল মাধবের প্রতি মালতীর অনুরাগের বিষাদময় ক্লেশকর প্রতিক্রিয়া। এখানে, আড়ালে বসে মাধব সব শুনছেন এবং উপভোগ করছেন; মালতীর মনেও অস্বস্তি - কি করবেন মাধবের জন্য? ঠিক এই অবস্থায় সুখস্বপ্ন ভেঙে দিয়ে নেপথ্যে দুষ্ট বাঘের নিষ্ঠুর খেলার বর্ণনার ছলে ভবভূতি ভয়ানক রসের অবতারণা করেছেন। এইভাবে রস থেকে রসান্তরে বয়ে চলেছে ঘটনাপ্রবাহ।

চিত্রপটে নায়ক-নায়িকা চিত্রাঙ্কণের দৃশ্যটি ভবভূতি তুলে ধরেছেন — বাড়ীর চিলেকোঠায় উঁচু জানালায় বসেছিলেন মালতী, কাছের রাজপথে বারবার যাওয়া-আসা করছিলেন মাধব, মালতী তাকে দেখে, নবীনরূপে আর্বিভূত মদনকে দেখে রতি যেমন উৎকণ্ঠিত হয়েছিল তেমনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন, অবসাদগ্রস্ত অঙ্গে তিনি বেদনা অনুভব করছেন। এর মধ্য দিয়ে রতি ভাব ও শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটেছে।

ভূয়োভূয়ঃ সবিধনগরীরথ্যয়া পর্যটন্তং
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবনবলভীতুঙ্গবাতায়নস্থা।
সাক্ষাৎকামং নবমিব রতির্মালতী মাধবং য-
দৃগাঢ়োৎকণ্ঠা লুলিতুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি।। [১৩]

মাধবকে দেখতে পেয়ে, মদনবেদনায় ব্যথিত মালতীর নয়নের প্রীতিকর তাঁর নিজের প্রতিকৃতিটা (চিত্রফলক) দেখাতে চাইছেন।

মালতীমাধব দৃশ্যকাব্যের প্রথম অঙ্কে নায়ক নায়িকা পরস্পরের ছবি আঁকছেন। প্রথমে মালতী তার মনের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য প্রতিকৃতি অঙ্কন করছেন।

অবলোকিতা ঃ বাঢ়ম্। তত স্তয়োদ্‌বেগবিনোদনং মাধবপ্রতিচ্ছন্নকম-তিলিখিতং লবঙ্গিকয়া মন্দারিকাহস্তে'দ্য নিক্ষিপ্তং তাবৎ। [১৪]

তৎকালীন জনসমাজে চিত্রফলকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল তার পরিচয় এই নাটকে পাই। সেইসঙ্গে নারীরাও চৌষট্টি কলায় পারদর্শিতা লাভ করতেন। বাৎসায়নের কামসূত্রে উল্লিখিত চৌষট্টিকলার মধ্যে আলেখ্য (চিত্রাঙ্কন) একটি কলা বিশেষ।

ততঃ প্রবিশতি গৃহীতচিত্রফলকোপকরণঃ কলহংসঃ। [১৫]

নাটকে দেখি মাধবকে মালতীর অঙ্কিত প্রতিকৃতি দেখাতে চাইছেন কলহংস।

কলহংস ঃ *কথং মকরন্দসহচর ইদমেব বালোদ্যানমলংকরোতি মাধবঃ। তদ্দর্শয়ামি মদনবেদনাখিদ্যমানমালতীলোচনসুখা-বহমাত্মনো'স্য প্রতিচ্ছন্দকম্।*[১৬]

উপস্থিত মকরন্দ জানতে চাইলো কে এই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন? উত্তরে কলহংস জানালো মদনবেদনায় ব্যথিত মালতী সেই প্রতিকৃতি অঙ্কন করেছেন।

কলহংস ঃ *(চিত্রং দর্শয়তি) এতচ্চ।*

মকরন্দ ঃ *কলহংসক, কেনেদং মাধ্যবস্য রূপমভিলিখিতম্।*

কলহংস ঃ *যেনৈবাস্য হৃদয়মপহৃতম্।*

মকরন্দ ঃ *অপি নাম মালত্যা।*

কলহংস ঃ *অথ কিম্।*

মকরন্দ ঃ *যা কৌমুদী নয়নয়োর্ভবতঃ সুজন্মা*
তস্যা ভবানপি মনোরথবন্ধমন্ধুঃ।
তৎসঙ্গমং প্রতি সখে ন হি সংশয়োহস্তি
যস্মিন্ বিধিশ্চ মদনশ্চ কৃতাভিযোগঃ।।[১৭]
দ্রষ্টব্যরূপা চ ভবতো বিকারহেতুস্তদত্রৈবালিখ্যতাম্।

এদিকে নায়ক মাধবও কামপীড়িত হয়ে মালতীর ছবি আঁকতে ইচ্ছুক হলেন। চিত্রফলক অঙ্কন করার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম তুলির ব্যবহার করছেন মাধব। তিনি মালতীর ছবি আঁকছেন, উত্তেজনায় তাঁর হাত ঘর্মাক্ত হচ্ছে, আঙ্গুলগুলি চঞ্চল হয়ে উঠেছে মালতীর চিন্তায় —

মন্দারিকা ঃ কলহংসক, উপনয় চিত্রফলকম্।

কলহংস ঃ গৃহানেদম্।

মন্দারিকা ঃ কেন কিং নিমিত্তং বা'ত্র মালত্যভিলিখিতা।

কলহংস ঃ য এব যন্নিনিমিত্তং মালত্যাঃ। [১৮]

এই চিত্রাঙ্কনের ঘটনাটি ভবভূতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর নাটকে।

কবি ভবভূতির বহু শ্লোকেই তৎকালীন সমাজের চিত্র-ভাস্কর্য রচনার প্রসঙ্গ ধরা পড়েছে। মালতীর প্রেমে মুগ্ধ মাধবের চিত্তে আনন্দের উচ্ছ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ নিম্নোক্ত শ্লোকটি —

লীনেব প্রতিবিম্বিতেব লিখিতেবোৎকীর্ণরূপেব চ
প্রত্যুপ্তেব চ বজ্রলেপপটিতোবান্তনিখাতেব চ।
সা নশ্চেতসি কীলিতেব বিশিখৈশ্চতোভুবঃ পঞ্চভি-
শ্চিন্তাসন্ততিতন্তুজাল নিবিড়স্যূতেব লগ্না প্রিয়া।। [১৯]

অর্থাৎ, আমার চিত্তে সেই প্রিয়া যেন বিলীন হয়ে আছেন, যেন প্রতিবিম্বিত হয়ে আছেন, যেন আঁকা হয়ে আছেন, সেখানে যেন তাঁর মুর্তি খোদাই করা হয়েছে। যেন তাঁকে পুঁতে দেওয়া হয়েছে, যেন বজ্রলেপ দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে, অথবা মনের ভিতর খুঁড়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেন মদনের পাঁচটি বাণ দিয়ে এঁটে দেওয়া হয়েছে, যেন চিন্তাধারার তন্তুজাল দিয়ে নিবিড়ভাবে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে - এমনিভাবে তিনি লেগে আছেন আমার মনে।

এখানে যেন চিত্রফলকে অঙ্কিত ভাস্কর্যে খোদাই করা এবং বজ্রলেপ দিয়ে এর ব্যবহারের দ্বারা ভিত্তিচিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়।[২০]

ভবভূতির *মালতীমাধব*-এ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে —

সন্তাপসন্ততিমহাব্যসনায় তস্যা-
মাসক্তমেতদনপেক্ষিতহেতু চেতঃ।
পয়ঃ শুভং চ বিদধাত্যশুভং চ জন্তোঃ
সর্বঙ্কষা ভগবতী ভবিতব্যতৈব।। [২১]

শ্লোকে বলা হয়েছে - চুম্বকশলাকা যেমন লৌহধাতুকে আকর্ষণ করে, তেমনি মাধবের অন্তকরণকে সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট করছেন মালতী।

এখানে চুম্বকশলাকা আর লৌহধাতুর ব্যঞ্জনার দ্বারা মালতী-মাধবের প্রেমাসক্তির কথা বলা হল। এখানে সরাসরি না বলে অর্থাৎ বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ বেশী প্রকট। তাই এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হয়েছে।

ব্যঞ্জনার আরও একটি দৃষ্টান্ত হল আলোচ্য শ্লোকটি —

ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কো'পি হেতু-
র্ন খলু বহিরুপাধীন্ প্রীতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে।
বিকসতি হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডরীকং
দ্রবতি চ হিমরশ্মাবুদ্গতে চন্দ্রকান্তঃ।। [২২]

অর্থাৎ, সূর্যোদয়ে পদ্মফুল ফুটে ওঠে আর শীতলকিরণ চাঁদ উঠলে চন্দ্রকান্তমনি থেকে জল ঝরতে থাকে। এর দ্বারা ব্যাঙ্গার্থ হয়েছে যে, প্রীতি কখনও বহিরঙ্গ নিমিত্তকে আশ্রয় করে না। কবি তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন আলোচ্য প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে। এখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকট, তাই এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হয়েছে। এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষয়টির উপস্থাপন চিত্তাকর্ষক হয়েছে।

কবি ভবভূতি শৃঙ্গার রসের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন, মাধবের মুখ দিয়ে বলা শ্লোকটিতে —

কলি থেকে ফুটে ওঠা কুন্দফুলের উন্মুক্ত অভ্যন্তর থেকে ঝরে পড়া পুষ্পরসের গন্ধ তুমি বহন করে আনছো, হে পবন! ইষৎ চঞ্চলনয়না অবনতাঙ্গী সেই কন্যাকে আলিঙ্গন করে আমারা প্রতিটি অঙ্গ স্পর্শ করো।

উন্মীলন্মুকুলকরালকুন্দকোশ-
প্রচ্যোতদ্ঘনমকরন্দগন্ধবন্ধো।
তামীষৎপ্রচলবিলোচনাং নতাঙ্গী-
মালিঙ্গন্ পবন মম স্পৃশাঙ্গমঙ্গম্।।[২৩]

কোথাও বা কবি মালতীর বর্ণনা করেছেন - ম্লান নবমল্লিকাকুসুমের মতো সুকুমার তুমি যাঁর জন্য বৃন্তচ্যুত অশোকপল্লবের মতো শুকিয়ে যাচ্ছো, তাকেও তো ভগবান মন্মথ জানিয়েছেন সন্তাপ কি দুঃসহ।

যস্য কারণাত্ত্বমুৎখণ্ডিতবন্ধনং কঙ্কেল্লিপল্লবমিব হৃদয়ং ধারয়ন্তী ক্লাম্যন্নবমালিকাকুসুমনিঃসহা কুসুমায়ুধেন পরিহীয়সে, সো'পি জ্ঞাপিতোভগবতা মন্মথেন সন্তাপস্য দুঃসহত্বম্।[২৪]

এখানে শৃঙ্গাররসের উদ্ভব হলেও, অনুরাগের কারণে নায়িকার এরূপ দশা।

এরূপ অবস্থায় নায়ক মাধবের বর্ণনা কবি ভবভূতি নিম্নোক্ত শ্লোকের মাধ্যমে করেছেন —

তত উদয়গিরেরিবৈক এষ স্ফুরিতগুণদ্যুতিসুন্দরঃ কলাবান্।
ইহ জগতি মহোৎসবস্য হেতুর্নয়নবতামুদিয়ায় বালচন্দ্রঃ।।[২৫]

অর্থাৎ, উদয়গিরি থেকে যেমন প্রকাশিত সৌন্দর্যে ও দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল,

কলাবিশিষ্ট, জগতে চক্ষুষ্মান সকলের পরম আনন্দের হেতু, নবীন চন্দ্র উদিত হয়, তেমনি তাঁর (মাধব) থেকে প্রকাশিত গুণরাজি দ্যুতিতে সুন্দর, নান কলার পারদর্শী এ জগতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মহা আনন্দের কারণ চাঁদের মতো এক অদ্বিতীয় বালক আর্বিভুত হল।

নানা গুণের সমাবেশ দেখা যায় নায়কের মধ্যে। তিনি নান কলাবিদ্যায় পারদর্শী, নবীন চন্দ্রের মতো তাঁর দীপ্তি।

কবি ভবভূতির কাব্যে শৃঙ্গার এই অঙ্গীরসের উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস রসের সমাবেশ ঘটেছে এই দৃশ্যকাব্যে - অত্যাচারী বাঘের বর্ণনার মাধ্যমে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এই রস - বাঘের পথটা কি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, মুণ্ডহীন শবদেহগুলো উল্টে লুটাচ্ছে, এখনও অল্প অল্প নড়ছে, নাড়িভুঁড়ি গুলো ছিঁড়ে উল্টে-পাল্টে ছড়িয়ে আছে, রক্তে মিশে গোড়ালি পরিমাণ পাঁক জমে উঠেছে।

সংসক্তত্রুটিতবিবর্তিতান্ত্রজাল
ব্যাকীর্ণস্ফুরদপবৃত্তরুণ্ডখণ্ডঃ।
কীকালব্যতিকরগুল্ফদঘ্নপঙ্কঃ
প্রাচণ্ড্যং বহতি নখায়ুধস্য মার্গঃ।।[২৬]

এখানে বীভৎস রসের দৃশ্যই ধরা পড়েছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বীভৎস রসের লক্ষণ হলো —

অনভিমতদর্শনেন চ রসগন্ধাস্পর্শশব্দয়োষৈশ্চ।
উদ্বেজনৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি।।[২৭]

এই বীভৎস রসের স্থায়িভাব হল জুগুপ্সা। অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দকোষ এবং বহুপ্রকার উদ্বেগ দ্বারা বীভৎসরসের উদ্ভব হয়। এখানে তাই হয়েছে।

বীভৎসরসের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো —

উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূৎসেধভূয়াংসি মাংসা-
ন্যংসস্ফিক্পৃষ্ঠপীঠাদ্যবয়বসুলভান্যুগ্রপূতীনি জগ্ধ্বা।
আত্তস্নায়ান্ত্রনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করঙ্কা-
দঙ্কস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি।।[২৮]

শ্মশানের দৃশ্য বর্ণনাতে কবি ভবভূতি পারদর্শী। এখানে বীভৎস দৃশ্য নায়ক মাধবের মুখ দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। শেয়ালেরা মৃতদেহ থেকে মাংস ভক্ষণ করছে তারই একটি বীভৎস রসের উপস্থাপন ঘটেছে এখানে।

কোথাও বা পিশাচদের বীভৎস নৃত্যদৃশ্য তুলে ধরেছেন কবি। তার শবদেহের নাড়ী দিয়ে মঙ্গলসূত্র রচনা করেছে, রমণীদের রক্তপদ্মের মতো হাতগুলি কানের দুল করে পড়েছে। হৃৎপিণ্ডের পুণ্ডরিক মালা ধারণ করেছে, রক্তের কুঙ্কুমে সেজে মাথার খুলি থেকে অস্থিমজ্জার সুরা পান করছে।

আন্ত্রৈঃ কল্পিতমঙ্গলপ্রতিসরাঃ স্ত্রীহস্তরক্তোৎপল-
ব্যক্তোত্তংসভৃতঃ পিনহ্য সহসা হৃৎপুণ্ডরীকস্রজঃ।
এতাঃ শোণিতপঙ্ককুঙ্কুমজুষঃ সম্ভূয় কান্তৈঃ পিব-
ন্ত্যস্থিস্নেহসুরাং কপালচষকৈঃ প্রীতাঃ পিশাচাঙ্গনাঃ।।[২৯]

শৃঙ্গার রসের আরেকটি দৃষ্টান্ত হল - মাধব মালতীর দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন গ্রীষ্মকালীন পদ্মের সঙ্গে —

আমূলকন্টকিতকোমলবাহুনাল-
মার্দ্রাঙ্গুলীদলমনঙ্গনিদাঘতপ্তঃ।
অস্যাঃ করেণ করমাকলয়ামি কান্ত-
মারক্তপঙ্কজমিব দ্বিরদঃ সরস্যাঃ।।[৩০]

গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত হাতি যেমন তাঁর শুঁড় দিয়ে সরোবর থেকে তুলে আনে জলে ভেজা, আঙুলের মতো পাপড়িতে শোভিত, মূল থেকে কাঁটায় পূর্ণ হলেও কোমল বাহুর মতো দীর্ঘ নাল সমেত মনোহর ঈষৎ লাল পদ্মটিকে, তেমনি অনঙ্গতাপে তপ্ত আমি আমার হাতটি ধরবো, যে হাতে আঙ্গুলগুলি ঘর্মাক্ত, হাতটি মূলদেশ থেকে রোমাঞ্চিত, কোমল ও পদ্মনালের মতো দীর্ঘ।

এখানে খুব সুন্দর উপমার দ্বারা মালতীর দৈহিক বর্ণনা করলেন কবি।

মালতীমাধব দৃশ্যকাব্যে রস এবং ধ্বনির প্রসঙ্গটি ভবভূতি খুব চারুতার সঙ্গে সংযোজন করেছেন। শৃঙ্গার রস অঙ্গীরস হওয়া সত্ত্বেও ভয়ানক এবং বীভৎস রস এখানে পারদর্শীতার সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই দৃশ্যকাব্যের কোনো কোনো স্থানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রতীয়মান অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশ ঘটেছে। ফলে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গটি এসে পড়েছে।

মালতীমাধব দৃশ্যকাব্যটি রস, রীতি, ধ্বনি - এই অলঙ্কারশাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলির দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করেছে।

।। মহাবীরচরিত ।।

ভবভূতির সপ্তাঙ্ক নাটক *মহাবীরচরিত* একটি বীররসপ্রধান দৃশ্যকাব্য। মহাবীরচরিত দৃশ্যকাব্যের সংক্ষিপ্ত কাহিনী —

রাবণ কর্তৃক সীতাকে বিবাহের সঙ্কল্প এবং সেই উদ্দেশ্যে দূতপ্রেরণ, রামের দ্বারা তাড়কার অপমান, রামকে হত্যার জন্য শূর্পনখা ও মন্ত্রী মাল্যবানের পরামর্শ এবং উভয়ের প্ররোচনায় পরশুরামের মিথিলায়ের উপস্থিতি ও রামকে অপমান। রাম ও পরশুরাম পরস্পরের অবমাননা ও আক্রোশ, মন্থরার ছদ্মবেশে শূর্পনখার মিথিলার আগমন ও কৈকেয়ীর নামে রামকে জাল চিঠি প্রদান; সেই পত্রে দশরথের নিকট কৈকেয়ী কর্তৃক দুটি প্রার্থনা পূরণের অনুরোধ; রামের বনবাস সঙ্কল্প, অরণ্যচারী রামের ক্রিয়াকলাপ; রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, রাম কর্তৃক বালীবধ ও সুগ্রীবের বন্ধুত্বলাভ, রাবণমন্ত্রী মাল্যবানের আশাভঙ্গ, সীতার কাছে কামাতুর রাবণের প্রণয়াভিক্ষা, রাম-রাবণের যুদ্ধ, রাবণের পরাজয় ও বিজয়ী রামসেনাদের উল্লাস; অবশেষে সীতাসহ রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও রাজ্যভার গ্রহণ।

ভবভূতি যে শৈলী অনুসরণ করেছেন, প্রথিতযশা নাট্যকারদের রচনায় তা সুলভ, তবে ভাষার আড়ম্বর, শিল্পিত মণ্ডনকলা এবং সার্বিক বৈচিত্র্যে তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পী। এই নাটকে নায়ক মহাবীর রাম। রামের বাল্যজীবন, শৈশব থেকে অভিষেক পর্যন্ত - এই নাটকের বিষয়বস্তু। ভবভূতি যখন মূল মহাকাব্যটি পড়েছিলেন, তখন যে বীররসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন।[৩১] সেই রামকথাকে নাট্যরূপ দেওয়ার সময় সেই অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়। রামচন্দ্রের ক্রিয়াকলাপে বীররসের প্রাধান্য দেখা যায়। রাম ও বালীর

সংগ্রামের মধ্যে, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র জনক ও দশরথের সংলাপের মধ্যে বীররসের প্রভাব অনুভব করা যায়। বীররসের প্রয়োজনীয় অঙ্গ অদ্ভুতরস। জৃম্ভক অস্ত্রের বর্ণনায় ও রাম-রাবণের যুদ্ধের বর্ণনায় অদ্ভুতরসের উপলব্ধি ঘটে। বহু ঘটনা যেমন - রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ, অহল্যার পুনরুত্থান, হাজার হাজার রাক্ষসবধ, বানের দ্বারা সাতটি তালগাছ, পাহাড় ও ভূমিভেদ করা, পম্পার তীরে পা দিয়ে হাড়ের বিরাট স্তূপে আঘাত এইসব ঘটনায় বীররসের সঙ্গে অদ্ভুতরসের মিশ্রণ। রৌদ্ররস বীররসের অঙ্গ, দৃষ্টান্তস্বরূপ পরশুরামের বক্তব্য, বিশেষতঃ শতানন্দের উক্তি তারই প্রমাণ।[৩২] তাড়কা ও কবন্ধের বর্ণনায় বীভৎসরসের আভাস মেলে। শৃঙ্গার এবং বিরহের সঙ্গে যুক্ত করুণ রসও আছে। বিভিন্ন রস ও রসাভাস বীররসের সহায়ক হয়েছে। মূলতঃ এই নাটকে সাহিত্য পরম্পরায় শৃঙ্গার রসের প্রথাসিদ্ধ একক প্রাধান্য অস্বীকার করে বীররসকে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য।

বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে লেখা *মহাবীরচরিত* দৃশ্যকাব্যের নায়ক 'মহাবীর' মহানায়ক রাম। রামের প্রতি ভবভূতির গভীর শ্রদ্ধা ও বাল্মীকির কাব্যের অসাধারণ প্রভাব তাঁকে এই নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।[৩৩]

ভবভূতি যে শৈলী অনুসরণ করেছেন, প্রথিতযশা নাট্যকারদের রচনায় তা সুলভ। তবে ভাষার আড়ম্বর, শিল্পিত মন্ডনকলা এবং সার্বিক বৈচিত্রে তিনি অনন্যসাধারণ শিল্পী। ভবভূতির মহাবীরচরিত ধ্রুপদী নাট্যরীতির সার্থক সৃষ্টি।

মহাবীরচরিতের প্রধান রস বীররস, তা এই দৃশ্যকাব্যের প্রথমেই সূত্রধর নিজমুখে স্বীকার করেছেন —

মহাপুরুষসংরম্ভো যত্র গম্ভীরভীষণঃ।
প্রসন্নকর্কশা যত্র বিপুলার্থা চ ভারতী।।[৩৪]

অপ্রাকৃতেষু পাত্রেষু যত্র বীরঃ স্থিতো রসঃ।
ভেদৈঃ সূক্ষ্মৈরভিব্যক্তৈঃ প্রত্যাধারং বিভজ্যতে।।[৩৫]

নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে - অসাধারণ চরিত্রগুলিতে বর্ণনীয়রূপে থাকবে বীররস। সেই বীররস সূক্ষ্মভেদে অভিব্যক্ত হয়ে প্রতি চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হবে।

বীররসের লক্ষণ প্রসঙ্গে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে — বীররস হল উত্তমপ্রকৃতির

অথ বীরো নাম উত্তমপ্রকৃতিরুৎসাহাত্মকঃ।[৩৬]

এই বীররস উৎসাহাদি ভাব থেকে উদ্ভুত হয়।

উৎসাহধ্যবসায়াদবিষাদিত্বাদবিস্ময়ামোহাৎ।
বিবিধাদর্থবিশেষাদ্বীররসো নাম সম্ভবতি।।[৩৭]

কবি ভবভূতির প্রিয়রস হল বীর এবং অদ্ভুত। সেজন্য তিনি ধর্মদ্বেষী রাবণের নিহন্তা রঘুনন্দনের এই চরিত রচনা করেছেন। যে চরিত ধ্বংস করেছে ত্রিলোকের শোকের কারণ রাক্ষসকুলকে, আর যা প্রচুর বীররসের পক্ষে মহান বিক্রমে পূর্ণ, ফলে লোকে আশ্চর্যজনকও বটে।[৩৮]

মহাবীরচরিত-এ রাম ও লক্ষ্মণের যে বর্ণনা ভবভূতি দিয়েছেন, সেই বর্ণনা থেকে ছবির মতো দৃশ্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে — সুন্দর শরীর বিশিষ্ট দুই বালক, এরা পিঠের দু-পাশে ধারণ করেছে দুটি তূণ, তা থেকে বাণগুলো বেরিয়ে স্পর্শ করেছে মস্তকের শিরা। ভস্মরাশিই এদের বক্ষস্থলের পবিত্র চিহ্ন। রুরুমৃর্গের চর্মধারণ করেছে তারা। মঞ্জিষ্ঠালতার রসে রঞ্জিত পরিধেয় বসনটিকে মূর্বালতার মেখলা দিয়ে বেঁধেছে। হাতে ধনু ও অক্ষসূত্রের বলয়, তারা উৎকৃষ্ট পিপ্পলবৃক্ষের দণ্ডধারণ করেছে।

চূড়াচুম্বিতকঙ্কপত্রমভিতস্তূণীদ্বয়ং পৃষ্ঠতো
ভস্মস্তোমপবিত্রলাঞ্ছনমুরো ধত্তে ত্বচং রৌরবীম্।
মৌর্বী মেখলয়া নিয়ন্ত্রিতমধোবাসশ্চ মাঞ্জিষ্ঠকং
পাণৌ কার্মুকমক্ষসূত্রবলয়ং দণ্ডো'পরং পৈপ্পলম্।।[৩৯]

এরূপ বর্ণনাযুক্ত ঋষিবালকদের সদৃশ ভাস্কর্য প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় দেখা যায়। ভবভূতির বর্ণনা শিল্পীর দৃশ্যবর্ণনার মতোই মনোহর।

মহাবীরচরিতে বীভৎস রসযুক্ত তাড়কা রাক্ষসীর যে বর্ণনা ভবভূতি দিয়েছেন - তা একমাত্র ভবভূতির পক্ষেই সম্ভব। নাড়ীর তন্ত্রীতে গাঁথা মাথার খুলি এবং হাড়, ঝনঝন শব্দে ঝুলছে অজস্র অলংকার। ভয়ঙ্কর লম্বা স্তনদ্বয়ের ভারে ভীমদর্শনা রাক্ষসী ছুটে চলেছে।

অন্ত্রপ্রোতবৃহৎকপালনলকক্রূরক্বণৎকঙ্কণ-
প্রায়প্রেঙ্খিতভূরিভূষণরবৈরাঘোষয়ন্ত্যম্বরম্।
পীতোচ্ছর্দিতরক্তকর্দমঘনপ্রাগ্‌ভারঘোরোল্লল-
দ্ব্যালোলস্তনভারভৈরববপুর্দর্পোদ্ধতং ধাবতি।। [৪০]

এখানে বীভৎস রসের প্রয়োগ করেছেন ভবভূতি। ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বীভৎসরসের বিবরণ দিয়েছেন -

অনভিমতদর্শনেন চ রসগন্ধস্পর্শশব্দদোষৈশ্চ।
উদ্বেজনৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি।। [৪১]

মহাবীরচরিত-এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাম কর্তৃক হরধনুভঙ্গ। কবি ভবভূতি সেটি নিখুঁত বর্ণনার দ্বারা ব্যক্ত করেছেন — সেই ধনু যেন অজস্র বজ্রে বিনির্মিত।

স্ফূর্জদ্বজ্রসহস্রনির্মিতমিব প্রাদুর্ভবত্যগ্রতো
রামস্য ত্রিপুরান্তকৃদ্দিবিষদাং তেজোভিরিদ্ধং ধনুঃ।। [৪২]

এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে। ধ্বনিকারের এটি একটি দৃষ্টান্ত। ধ্বনির আরেকটি দৃষ্টান্ত হল - রাম আপন বাহু দণ্ড দুটি যখন ধনুর ওপর রাখলো,

তখন সেই দৃশ্যটিকে তুলনা করা হচ্ছে - করিশাবক যেমন তার ক্ষুদ্র শুঁড়টি পর্বতে রাখে - তার সঙ্গে। এখানে রৌদ্ররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

শুণ্ডারঃ কলভেন যদ্বদচলে বৎসেন দোর্দণ্ডকস্তস্মিন্নাহিত এব[৪৩]

এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা হস্তিশাবকের দ্বারা রামচন্দ্রকে এবং পর্বতের দ্বারা ধনুকে ব্যক্ত করে ধ্বনিকাব্যের দৃষ্টান্ত পরিস্ফুট হল। হরধনুভঙ্গের দৃশ্যটি ভবভূতি চমৎকারভাবে অঙ্কন করেছেন —

দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-
ষ্টকারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
দ্রাক্পর্যস্তকপালসম্পুটমিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর-
ভ্রাম্যৎপিণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।[৪৪]

এখানে বীররসের উদ্ভব ঘটেছে। হরধনুভঙ্গ রামচন্দ্রের বীরত্বকে সূচিত করেছে।

রামচন্দ্র ভীতা সীতার বর্ণনা করেছেন —

আতঙ্কশ্রমসাধ্বসব্যতিকরোৎকম্পঃ কথং সহ্যতা-
মঙ্গৈর্মুগ্ধমধূকপুষ্পরুচিভিলাবণ্যসারৈরয়ম্।
উন্নদ্ধস্তনযুগ্রকুড্‌মলগুরুশ্‌্যসাবভুগ্নস্য তে
মধ্যস্য ত্রিবলীতরঙ্গকজুষো ভঙ্গঃ প্রিয়ে মা চ ভূৎ।।[৪৫]

সীতার দেহের এই যে ভীতা ভাব, তা করুণ সৃষ্টি করেছে। ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-এ করুণ রসের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন —

সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।
অভিনয়েঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।[৪৬]

কবি ভবভূতি জটায়ুর বর্ণনার মাধ্যমে রাবণের সীতা হরণের দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন - চিত্রমৃগ রামকে আর্কষণ করে বহু দূরে নিয়ে এসেছে, লক্ষ্মণও সেই দিকেই চলেছে, তারপর দশানন রাবণ এক সন্ন্যাসীর রূপধারণ করে সীতার পর্ণকুটিরে প্রবেশ করলো এবং সীতাকে হরণ করে সীতাকে চাপিয়ে গমণ করলো।

দুরং হৃতশ্চিত্রমৃগেণ রামস্তয়া দিশা গচ্ছতি লক্ষ্মণো'পি।
ততঃ পরিব্রাজুটজং প্রবিষ্টো ধিগ্ব্যক্তরূপো দশকন্ধরো'য়ম্।।[৪৭]

পরঃসহস্রৈরাযুক্তং পিশাচবদনৈঃ খরৈঃ।
রথং বধূটীমারোপ্য পাপঃ ক্বাপ্যেষ গচ্ছতি।।[৪৮]

এই শ্লোকের মধ্যে চিত্রের প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়েছে। রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে, রথ ছুটে চলেছে - এই দৃশ্য ভারতীয় শিল্পকলা এই কাহিনীকে উপজীব্য করে নির্মিত হয়েছে। কবি ভবভূতি বীররসপ্রধান দৃশকাব্যে কোথাও বা শৃঙ্গাররসের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। রাবণ সীতার কথা চিন্তা করে বলছেন - সীতার আনন চন্দ্রতুল, নীলকমল নয়নতুল্য, ভ্রু-যুগল কামদেবের ধনুর তুল্য, কুন্তলদাম মেঘমালাতুল্য, লক্ষ্মীতুল্য সীতার দেহের এরূপ বর্ণনার মধ্য দিয়ে রতিভাবের প্রকাশ ঘটেছে। এইভাবে সীতার অপরূপ রূপ কবি রাবণের মুখে তুলে ধরেছেন।

মুখং যদি কিমিন্দুনা যদি চলাঞ্চলে লোচনে
কিমুৎপলকদম্বকৈর্যদি তরঙ্গভঙ্গী ভ্রুবৌ।।
কিমাত্মভবধন্বনা যদি সুসংযতাঃ কুন্তলাঃ
কিমম্বুবহডম্বরৈর্যদি তনূরিয়ং কিং শ্রিয়া।।[৪৯]

এখানে সীতার প্রতি রাবণের অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। রতিভাবে উদয় হওয়ার শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

রাম-রাবণের যুদ্ধের যে চিত্র নাট্যকার তুলে ধরেছেন তা অপূর্ব। শব্দের শরজালে কবি যুদ্ধের ঝংকার তুলেছেন। যুদ্ধের ভয়াল এবং ভীষণ রূপ বর্ণনায় কবি সিদ্ধহস্ত। এখানে বীররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

প্রাসপ্রোতপ্রবীরোল্বণরুধিরপরামৃষ্টবুক্কাজিঘৎসা-
ধাবদ্‌গৃধ্রাধিরাজাপ্রতিমতনুরুহচ্ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
বিশ্রাম্যন্তি ক্ষণার্ধং প্রধনপরিসরেষ্বেব মুক্তাভিযোগা
বীরাঃ শস্ত্রপ্রহারব্রণভররুধিরোদ্‌গারদিগ্ধাখিলাঙ্গাঃ।।[৫০]

প্রতীক্ষন্তে বীরাঃ প্রতিমুখমুরোভিঃ সরভসং
বিপক্ষাণাং হেতোঃ প্রতিনিয়তধৈর্যানুভবতঃ।
বিদীর্ণত্বগ্‌ভরা দলিতপিশিতাশ্ছিন্নধমনি-
প্রকাণ্ডাস্থিস্নায়ুস্ফুটতরবিলক্ষ্যান্ত্রনিবহাঃ।।[৫১]

রক্ষোনাথো রঘূণাং ত্বরিতমধিভুবা রাবণির্লক্ষ্মণেন
দ্বন্দ্বীভূয় প্রহৃষ্যদ্‌ভুজবলমহিমাবিষ্কৃতেষ্বাসশিক্ষৌ।
দিব্যাস্ত্রাণাং প্রয়োগপ্রতিকৃতিমুচিতাং চাপবানৌ মিথোহমূ
মূর্চ্ছৎকল্পাবসানজ্বলনপরিভবং সৈন্যয়োঃ পর্যদাতাম্‌।।[৫২]

অর্থাৎ, রামের সঙ্গে রাবণ এবং লক্ষ্মণের সঙ্গে মেঘনাদের যুদ্ধ চলছে। পরস্পরের যুদ্ধে ঝলসে উঠছে বাহুবল। বাহুবলের মহিমা তাদের ধনুর্বিদ্যার পরাকাষ্ঠা প্রকট করে তুলছে। প্রলয়কালে প্রবল বহ্নির মতো তারা পরস্পরের সৈন্য ধ্বংস করছে। ৬ষ্ঠ অঙ্ক জুড়ে বীররসের বর্ণনায় মুখর করেছেন কবি ভবভূতি।

২য় অঙ্কে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রামের মুখে পরশুরামের এক অনুপম বর্ণনা দেখা যায় —

কল্পাপায়প্রণয়ি দধতঃ কালরুদ্রানলত্বং
সংরব্ধস্য ত্রিপুরজয়িনো দেবদেবস্য তিগ্মঃ
ব্রহ্মচ্ছদ্মা নিখিলভুবনস্তোমনির্মাথযোগ্যো
রাশিভূতঃ পৃথগিব সমুত্থায় সামর্থ্যসারঃ।।[৫৩]

জ্যোতির্জ্বালাপ্রচয়জটিলো ভাতি কণ্ঠে কুঠার-
স্তূণীরো'সে বপুষি চ জটাচাপচীরাজিনানি।
পাণৌ বাণঃ স্ফুরতি বলয়ীভূতলোলাক্ষসূত্রে
বেষঃ শোভাং ব্যতিকরবতীমুগ্রশান্তস্তনোতি।।[৫৪]

পরশুরামের বেশভূষায় একইসঙ্গে উগ্র ও সৌম্যরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল - রামকে হত্যা করতে হবে - এই চিন্তায় বজ্রকঠিন পরশুরামের চোখেও জল। দেহাবয়বে দৃশ্যটি এইরূপ - স্বয়ং মহাদেব যেন রুদ্র দেহ ত্যাগ করে ব্রাহ্মণদেহ ধারণ করেছেন, কণ্ঠ জ্যোতিবলয়ের ন্যায় কুঠারে শোভিত, স্কন্ধে তূণ, শরীরে জটা, ধনু, বল্কল এবং মৃগচর্ম। হাতে বলয়াকারে জড়িয়ে আছে জপমালা, বিরাজ করছে বাণ।

এখানে ব্যঞ্জনাটি সুস্পষ্ট, মহাবীরচরিতে পরশুরাম চরিত্রটি কবি ভবভূতি নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যক্ত করেছেন।

৫ম অঙ্কে ভবভূতির ক্রোধান্বিত রামের বর্ণনা মুগ্ধ করে। রাম এখানে মূর্তিমান ক্রোধ, ভ্রুকুটির কুটিল রেখায় সূচিত তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধানল। সমুদ্রের মধ্যে জ্বলন্ত বাড়বানলের মতো, মেঘের গর্তে লুকিয়ে থাকা বিদ্যুতের সেই ক্রোধ। এখানে রৌদ্ররসের উপস্থাপন ঘটেছে। নায়কের মধ্যে যখন বীরত্বের উদ্ভব হয় তখন রৌদ্ররস উপস্থাপিত হয়। এখানেও তাই হয়েছে —

আভুগ্নভ্রুকুটীবিটঙ্কঘটনাসংসূচিতান্তঃস্ফুর-
দ্ধৈর্যস্তম্ভিতদুর্ব্যবস্থবিততপ্রোচ্চণ্ডকোপানলঃ।
উদ্ধূমাবলিরম্ভসামিব নিধির্মধ্যজ্বলদ্বাড়বো।
বিদ্যুদ্ব্যঞ্জিতবজ্রগর্ভজলদচ্ছায়াং সমালম্বতে।।[৫৫]

প্রচণ্ডপরিপিণ্ডিতঃ স্তিমিতবৃত্তিরন্তর্মুখঃ
পিবন্নিব মহুর্মুহুর্ঝটিত মন্যুরুচ্চৈর্জ্বলন্।
শিখাভিরিব নিশ্চরন্ননুপলভ্য দাহ্যান্তরং
পয়োধিমিব বাড়বো দহতি মামতস্ত্রায়তাম্।। [৫৬]

সমগ্র *মহাবীরচরিত* দৃশ্যকাব্য জুড়ে কবি ভবভূতি বীর রসাত্মক কাহিনী সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। মাঝে মাঝে তিনি শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র রসকে সহযোগী রস রূপে উপস্থাপন করেছেন কিন্তু সমগ্র নাটক জুড়ে বীর এবং ভয়ানক রসের সংযোজন বেশী। তাই *মহাবীরচরিত* দৃশ্যকাব্যটি বীররসাত্মক। এই নাটকে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনারও প্রকাশ ঘটেছে। রস, রীতি, ধ্বনিগত দিক থেকে বিচার করলে এই দৃশ্যকাব্যটি সার্থকরূপে কাব্যিক উৎকর্ষ লাভ করেছে।

।। উত্তররামচরিত ।।

উত্তররামচরিত দৃশ্যকাব্যটি ভবভূতির নাট্যপ্রতিভার অনন্য অবদান। গুণাগুণ বিচারে *উত্তররামচরিত* ভবভূতির শ্রেষ্ঠ রচনা। *উত্তরে রামচরিতে ভবভূতি বিশিষ্যতে*[৫৭] নাট্যসমালোচকদের এই বক্তব্য যথাযথ। এই সপ্তাঙ্ক নাটকটি রামায়ণের উত্তরার্ধ অবলম্বনে রচিত। এই নাটকে কবির মানসিক উৎকর্ষ, নাট্যকুশলতা, মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতা ও জীবনের মূল্যবোধগুলি ফুটে উঠেছে। শুধুমাত্র বিষয়বস্তুতেই নয়, নাট্যরীতি ও শিল্পমূল্যের দিক থেকেও এর অবদান রয়েছে। রামের রাজ্যলাভ থেকে পরিত্যাগ ও অবশেষে রাম ও সীতা চিরস্থায়ী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন - এটিই নাটকটিই বিষয়বস্তু। *উত্তররামচরিত* নাটকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

প্রথম অঙ্কে দেখা যায়, পূণগর্ভা সীতার অবসর বিনোদনের জন্য চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রামের সঙ্গে চিত্রদর্শন করতে করতে সীতা নিদ্রিত হয়ে পড়েন, ইতিমধ্যে দূত দুর্মুখ এসে প্রজাদের মধ্যে সীতার চরিত্র সম্পর্কে কুৎসিত অপবাদের কথা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাতে বাধ্য হলেন। রাম সীতাকে বিসর্জনের সিদ্ধান্ত নিলেন। ২য় অঙ্কে - সীতার নির্বাসনের পর বার বছর কেটে গেছে। তাপসী আত্রেয়ী ও বনদেবী বাসন্তীর কথোপকথনে জানা গেল রামচন্দ্র যজ্ঞ শুরু করেছেন, অন্যদিকে সীতার দুই পুত্র বাল্মীকির আশ্রমে পালিত হচ্ছেন। তারপর সশস্ত্র রাম শম্বুককে বধ করে অগস্ত্যের আশ্রমে এলেন। ৩য় অঙ্কে - তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের কথোপকথনে স্বামী পরিত্যক্তা সীতার আত্মহত্যার সংকল্প এবং গঙ্গা কর্তৃক সীতাকে রক্ষা ও তাঁর পুত্রদের বাল্মীকি আশ্রমে প্রতিপালনের কথা জানা গেন। আশ্রমে ছায়া সীতা ও

রামের সাক্ষাৎ হল। সীতার দুঃখে রামের মনোবিকার ঘটেছে; অদৃশ্য সীতার স্পর্শে তিনি স্বাভাবিক চেতনা ফিরে পেলে। ৪র্থ অঙ্কে - জনক, কৌশল্যা প্রভৃতি বাল্মীকির আশ্রমে এসেছেন, সকলেই অসহায়া সীতার কথা আলোচনা করেছেন। এদিকে লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু রামের অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে আসছেন শুনে সীতার পুত্র লব তাকে বাধাদানের জন্য প্রস্তুত হলেন। ৫ম অঙ্কে - দুই বীর লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ চলতে লাগল, হঠাৎ রামের আর্বিভাবে উভয়ে ক্ষান্ত হলেন। রাম লবের শৌর্যবীর্যের প্রশংসা করলেন। এই সময়ে কুশ এলেন, তার হাতে বাল্মীকি রচিত কাব্য। সেই কাব্যের নাট্যরূপ প্রদানের পরিকল্পনা চলছে। ৬ষ্ঠ-৭ম অঙ্কে ভরতের পরিকল্পনা মত অপ্সরাগণ নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু হল স্বামী পরিত্যক্তা সীতার দুঃখ দুর্দশা; অভাগিনী সীতা আত্মহত্যার সংকল্প করে ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিলেন। তারপর পৃথিবী ও গঙ্গা সীতাকে নিয়ে তার দুই শিশু সন্তানকে কোলে করে আর্বিভুত হলেন। পৃথিবী রামের কঠোরতার নিন্দা করলেন। কিন্তু ভাগীরথী রামকে সমর্থন করলেন। এই নাটক দেখতে দেখতে বিস্ময় রাম কখনও অভিনয়ে বাধা দেন, কখনও সংজ্ঞা হারান। অবশেষে অরূন্ধতীর সঙ্গে সীতা মোহগ্রস্ত রমের সকাশে উপস্থিত হডে শুশ্রষা করে তাঁকে প্রকৃতস্থ করেন। প্রজারা সানন্দে সীতাকে বরণ করলেন। বাল্মীকি লব ও কুশকে পিতামাতার হাতে অর্পণ করলেন।

নাটকের প্রথম অঙ্কে পূর্ণগর্ভা সীতার অবসর বিনোদনের জন্য চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সীতাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য লক্ষ্মণ বিশেষভাবে তৈরী একটি চিত্রপটের ব্যবস্থা করেছেন, এতে রামের বাল্যজীবনের কাহিনী আঁকা ছিল। মনে হয় ভবভূতি এইভাবে রামের পূর্বকথা মনে করিয়ে দিয়ে এমন এক পটভূমি সৃষ্টি করলেন, যা নাটকটিতে সম্পূর্ণতা দান করল। এই চিত্রদর্শনের মাধ্যমে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, যাতে রামের অসাধারণ গুণাবলী এবং রাম-সীতা পরস্পরের গভীর অনুরাগের কথা জানা গেল। ছবিগুলি দেখতে দেখতে সীতা ভাগীরথীর সেই উপকূল আবার দেখার জন্য অদম্য আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উত্তররামচরিতের এই চিত্রদর্শন

বা আলেখ্যদর্শন কাহিনীটি প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্প প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়। ভবভূতির সমাজে চিত্রাঙ্কন প্রথা প্রচলিত প্রথা বিশেষ।

প্রথম অঙ্কে এই চিত্রদর্শন দৃশ্যটির মাধ্যমে ভবভূতি রামের পূর্ব জীবনের সঙ্গে পরবর্তী জীবনের যোগসূত্র স্থাপন করার জন্যই রচনা করেছেন। এই চিত্রদর্শন দৃশ্যে একাধারে বিয়োগান্তক পরিণতিজনিত বিষাদ ও অপরিমেয় ভালোবাসা মিশ্রিত হয়েছে। ভবভূতির *উত্তররামচরিত* দৃশ্যকাব্যের প্রথম অঙ্কের নাম 'চিত্রদর্শন'। চিত্রদর্শন বা আলেখ্যদর্শন প্রসঙ্গটি ভবভূতির নিজস্ব মৌলিক কল্পনা, যার মধ্য দিয়ে ঘটনার বিস্তৃতি ঘটেছে। ভারতীয় শিল্পকলার একটি প্রধান এঙ্গ হল 'চিত্রকলা'। শিল্পীরা ছবি আঁকার বিষয়গুলি নির্বাচন করছেন *রামায়ণ*-এর কাহিনী নিয়ে এ তারই দৃষ্টান্ত। চিত্রকলা যে তৎকালীন সমাজে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল এ তারই প্রমাণ। সমাজে যে চিত্রকর নামক বিশেষ শ্রেণীর অবস্থান ছিল তারও প্রমাণ এই দৃশ্যকাব্য। আনন্দবিধানের জন্যই এ চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা। উত্তররামচরিতের প্রথম অঙ্কে দেখি লক্ষ্মণ, সীতার আনন্দ বর্ধন করার জন্যই এই চিত্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং চিত্রের বিষয় অগ্নিপরীক্ষায় সীতার বিশুদ্ধি পর্যন্ত। এই অতীত অরণ্যবাসের চিত্র এতটাই আকর্ষনীয় যে, তা দেখতে দেখতে সীতার মনে জাগল বনভূমিদর্শনের ইচ্ছা।

লক্ষ্মণঃ	ঃ	*জয়তি জয়ত্যার্যঃ। আর্য! তেন চিত্রকারেণাস্মদুপদিষ্টমার্যস্য চরিতমস্যাং বীথিকায়ামভিলিখিতম্ তৎপশ্যত্বার্যঃ।*
রামঃ	ঃ	*জানামি বৎস দুর্মনায়মানাং দেবীং বিনোদয়িতুম্। তৎ কিদন্তমবধিং যাবৎ।*
লক্ষ্মণঃ	ঃ	*যাবদার্যায়া হুতাশনে বিশুদ্ধিঃ।*[৫৮]

চিত্রের বিষয়গুলি হল তাড়কা বধে প্রসন্ন বিশ্বামিত্রের রামচন্দ্রকে জৃম্ভকাস্ত্র প্রদান দৃশ্য, রামচন্দ্র কর্তৃক হরধনুভঙ্গের দৃশ্য রামচন্দ্রসহ অনান্য ভ্রাতাদের বিবাহদৃশ্য,

ভাগীরথী নদী, বটবৃক্ষ বর্ণনা, গোদাবরী নদী, পঞ্চবটী অরণ্য, মাল্যদান পর্বত প্রভৃতির চিত্রবর্ণনা করেছেন কবি ভবভূতি।

রামচন্দ্রের হরধনুভঙ্গ দৃশ্যটি ভবভূতি সীতার মাধ্যমে বর্ণনা দিয়েছেন —

সীতা ঃ অহো দলন্নবনীলোৎপলশ্যামলস্নিগ্ধমসৃণ শোভ-মানমাংসলেন দেহসৌভাগ্যেন বিস্ময়স্তিমিততাতদৃশ্য-মানসৌমসুন্দরশ্রীর-নাদরখণ্ডিতশঙ্করশরাসনঃ শিখণ্ড-মুগ্ধমুখমণ্ডল আর্যপুত্র আলিখিতঃ।[৫৯]

অর্থাৎ, রামচন্দ্রের শক্তিমান পরিপুষ্টবদন, প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মতো কোমলোজ্জ্বল, বালোচিত কেশগুচ্ছের শোভায় সুন্দর মুখমণ্ডল - অবলীলায় হরধনু ভঙ্গ করছেন - বিস্ময়স্তিমিত নয়নে পিতা সেই সুন্দর শোভা দেখছেন। এই বর্ণনা যে একটি চিত্রের সূচনা করছে। ভবভূতি চিত্রশিল্পীর রেখার দ্বারা বর্ণনারূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সাহিত্যের মাধ্যমে। গৌড়ীরীতির কবি ভবভূতির এখানে ব্যঞ্জনার দ্বারা রামচন্দ্রের দেহরূপের বর্ণনা করলেন, যে সেইরূপ বিস্ময়ান্বিত হয়ে প্রত্যক্ষ করছেন স্বয়ং জনক।

কখনও কবি ভবভূতি রামচন্দ্রের মুখে সীতার বর্ণনা দিয়েছেন —

পতনবিরলৈঃ প্রান্তোন্মীলন্মনোহরকুন্তলৈ
দর্শনমুকুলৈর্মুগ্ধালোকং শিশুর্দধতী মুখম্।
ললিত ললিতর্জোৎস্নাপ্রায়ৈরকৃত্রিমবিভ্রমৈ
রকৃতমধুরৈরম্বানাং মে কুতূহলমঙ্গকৈঃ।।[৬০]

অর্থাৎ, জানকী সীতার মুখের সৌন্দর্যে, ফুলের কলির মতো দাঁতের শোভায় মাতৃগণ মুগ্ধ ছিলেন - সেই দাঁতও মাঝে মাঝে নেই; সুন্দর কেশগুচ্ছ কুখের দুই পাশে এসে পড়েছে। তার কোমল অঙ্গের স্বাভাবিক লাবণ্য তাঁদের কাছে ছিল চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও মধুর।

এখানে সীতার দৈহিক বর্ণনা যেন চিত্রকরের তুলির রেখায় কবি ভবভূতির বর্ণনা করেছেন। কাব্যে নায়িকার যে রূপবর্ণনা তা ভবভূতির বর্ণনায় চিত্রকরের দ্বারা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। চাঁদের আলোর মতো স্নিগ্ধ ও মধুর - এর ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা সীতার সৌন্দর্য বিধান করেছেন ভবভূতি।

অশ্বমেধ যুদ্ধের সময় রামচন্দ্র সীতার স্বর্ণময়ী প্রতিকৃতি স্থাপন করেছিলেন।[৬১] সোনার প্রতিমা নির্মাণ যা তংকালীন ভাস্কর্য শিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে।

কবি ভবভূতি শোকার্ত সীতার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে - সীতার মুখ সুন্দর কিন্তু গন্ডস্থল বিবর্ণ ও শীর্ণ, দুইপাশে কেশপাশ ইতস্ততঃ আন্দোলিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে তিনি যেন শোকের প্রতীক অথবা বিচ্ছেদ-দুঃখের মূর্তি।

তদিয়ং গোদাবরীহ্রদান্নিষ্ক্রম্য
পরিপাণ্ডুদুর্বলকপোলসুন্দরং
দধতী বিলোলকবরীকমাননম্।
করুণস্য মূর্তিরথবা শরীরিণী
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকী।।[৬২]

এখানে করুণ রসের উপস্থাপন ঘটেছে। নাট্যশাস্ত্রে করুণরস সম্বন্ধে ভরতমুনি বলেছেন —

সস্বনরুদিতৈর্মোহাগমৈশ্চ পরিদেবিতৈর্বিলোপিতৈশ্চ।
অভিনয়েঃ করুণরসো দেহায়াসাভিঘাতৈশ্চ।।[৬৩]

'শোক' এই ভাব থেকে করুণরসের উদ্রেক হয়। এই শ্লোকটিতে সীতার শোক ও দুঃখ ব্যঞ্জিত হয়েছে।

আবার, সীতার শোককে সৌন্দর্যে পরিণত করেছেন কবি ভবভূতি - সীতা

যেন গ্রন্থিবন্ধন থেকে ছিন্ন সন্দর এক কিশলয়, সুদীর্ঘ বেং তীব্র দুঃখ তাঁর হৃদয় কুসুমকে শীর্ণ ও দেহকে শোষণ করছে, ঠিক যেমন শরতের উত্তার কেতকীফুলের কোমল পত্রটিকে শোষণ করে।

কিসলয়মিব মুগ্ধং বন্ধনাদ্বিপ্রলূনং
হৃদয়কুসুমশোষী দারুণো দীর্ঘশোকঃ।
গ্লপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরং
শরজিদ ইব ধর্মঃ কেতকী গর্ভপত্রম্।।[৬৪]

এই শ্লোকটিতে করুণ রসের উপস্থাপন ঘটেছে।এখানে যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটির উদ্ভব ঘটেছে তা হল সীতাকে কেতকীফুলের কোমলপত্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সীতার কোমলতা এখানে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। সীতা ছিন্ন কিশলয়ের তুল্য।

উত্তররামচরিতের 'কুমারবিক্রম' নামক ষষ্ঠ অঙ্কে ভবভূতি লব ও চন্দ্রকেতুর যে বর্ণনা তুলে দেন তা বীররসাত্মক।

চূড়ামণ্ডলবন্ধনং তরলয়ত্যাকূতজো বেপথুঃ
কিঞ্চিৎ কোকনদচ্ছদস্য সদৃশে নেত্রে স্বয়ং রজ্যতঃ।
ধত্তে কান্তিমকাণ্ডতাণ্ডতাণ্ডবিতয়োর্ভঙ্গেন বক্রং ভ্রুবো-
শ্চন্দ্রস্যোৎকটলাঞ্ছনস্য কমলস্যোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গস্য চ।।[৬৫]

লব ও চন্দ্রকেতু উভয়বালকের মস্তকের কেশগ্রন্থিবন্ধন অত্যধিক ভাবাবেগের কারণে কম্পিত, তাদের রক্তপদ্মের পাতার মতো চক্ষু স্বভাবতই রক্তিম তা যেন অগ্নির ন্যায় দীপ্তি ধারণ করেছে, যেন তাদের মুখ কলঙ্কচিহ্নযুক্ত চন্দ্রের মতো ভ্রমরলাঞ্ছিত পদ্মের শোভাধারণ করেছে।

এই শ্লোকে বীররসের উপস্থাপন ঘটেছে। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে বীররসের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে - উৎসাহ নামক ভাবের উদ্দীপ্তময় বীররসের উদ্ভব হয়।

উৎসাহো নামো উত্তমপ্রকৃতিঃ। স চাবিষাদশক্তিধৈর্য-শৌর্যাদিভিবিভা-বৈরুৎপদ্যতে। তস্য স্থৈর্যত্যাগারম্ভবৈশারদ্যাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। [৬৬]

উৎসাহাধ্যবসায়াদবিষাদিত্বাদবিস্ময়ামোহাৎ।
ববিধাদর্থবিশেষাদ্বীররসো নাম সম্ভবতি।। [৬৭]

এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - লব ও চন্দ্রকেতু উভয়ে যে যুদ্ধের জন্য রোমাঞ্চিত তা তাদের কম্পিত মস্তক, রক্তপদ্মের মতো চক্ষু, কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রের ন্যায় চক্ষু ও ভ্রমরলাঞ্ছিত পদ্মের শোভাযুক্ত দৈহিক বর্ণনার দ্বারা প্রকাশিত।

এখানে ব্যঞ্জনাটি হল উভয়ে যুদ্ধের জন্য উৎসাহী। উভয়েই বীর, বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ, তারুণ্যের উৎসাহ।

উত্তররামচরিত দৃশ্যকাব্য জুড়ে করুণ রসের আধিক্য দেখা যায়। তাই এই রস নাটকের অঙ্গরস এবং সহকারী রসরূপে বীররস, শান্তরস, শৃঙ্গাররসের প্রসঙ্গ এসেছে। করুণ রসের রূপায়ণে ভবভূতি বিশেষ নৈপুণ্যের অধিকারী ছিলেন। প্রচলিত উক্তি — *কারুণ্যং ভবভূতির তণুতে।* [৬৮] কবি ভবভূতির মতে করুণরসই হল একমাত্র রস — অন্য রসগুলি করুণরসেরই ডাল-পালা।

একো রসঃ করুণ এব নিমিত্ত ভেদাদ্
ভিন্নঃ পৃথক্ পৃথাগিরাশ্রয়তে বিবর্তান্।
আবর্ত-দুদ্‌বুদ -তরঙ্গ -ময়ান্-বিকারান্
অম্ভো যথা সলিলমেব তু তৎ সমগ্রম্।। [৬৯]

উত্তররামচরিত প্রথম তিন অঙ্কে ভবভূতি এঁকেছেন রামচন্দ্রের রামচন্দ্রের বীরত্বগর্ব। বীরপুত্র লবের শৌর্যচিত্র এবং অরণ্য-পর্বত-নদীর মহিমাময় বর্ণনা সহ সীতার ম্লানমূর্তি - যা করুণ ও বীররসের এক আশ্চর্য মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। এদিক থেকে *উত্তররামচরিত* নাটক কবি ভবভূতির পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি - *উত্তরে রামচরিতে*

ভবভূতিবিশিষ্যতে।[৭০] ভবভূতির অনুধাবন ও কল্পনাশক্তি কোনো অংশে কালিদাসের থেকে কম ছিল না। শব্দ দিয়ে আঁকা ছবিগুলি এতই বাস্তব যেন সেগুলি কোনো চিত্রকরের তুলিতে আঁকা।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১৯৮৪ (খণ্ড - ১৭), পৃ. ৩৫৪।

২। *মালতীমাধবম্*, ১.৫।

৩। *তত্রৈব* ।

৪। *মালতীমাধবম্*, ১.৬।

৫। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*, ১.২.১২।

৬। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ*, ১.২.১২. বৃত্তি।

৭। মহাবীরচরিতম্, ১.৫৪।

৮। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১৯৭৯ (খণ্ড - ৭), পৃ. ৭।

৯। *তদেব*, পৃ. ৩।

১০। *সবৃত্ততিলক*, ৩.৩৩।

১১। N. R. Kale (Ed.) : Uttararāmacaritam, Introduction Chap. PP. 11 - 18.

১২। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, ২০০৯, পৃ. ৩২৬।

১৩। *মহাবীরচরিতম্*, ১.১৫।

১৪। *মহাবীরচরিতম্*, প্রথম অঙ্ক।

১৫। তত্রৈব।

১৬। তত্রৈব।

১৭। *মালতীমাধবম্,* ১.৩৪।

১৮। *মালতীমাধবম্,* প্রথম অঙ্ক।

১৯। *মালতীমাধবম্,* ৫.১০।

২০। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩য় খণ্ড।

২১। *মালতীমাধবম্,* ১.২৩।

২২। *মালতীমাধবম্,* ১.২৪।

২৩। *মালতীমাধবম্,* ১.৩৮।

২৪। *মালতীমাধবম্,* দ্বিতীয় অঙ্ক।

২৫। *মালতীমাধবম্,* ২.১০।

২৬। *মালতীমাধবম্,* ৩.১৭।

২৭। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৭৩।

২৮। *মালতীমাধবম্,* ৫.১৬।

২৯। *মালতীমাধবম্,* ৫.১৮।

৩০। *মালতীমাধবম্,* ৬.২০।

৩১। তু. *মহাবীরচরিত* প্রস্তাবনা ১.২, ৩, ৬।

৩২। *মহাবীরচরিত,* ৩.২০-২১।

৩৩। তু. *মহাবীরচরিত* প্রস্তাবনা ১.৭।

৩৪। *মহাবীরচরিত* প্রস্তাবনা ১.২।

৩৫। *মহাবীরচরিত* প্রস্তাবনা ১.৩।

৩৬। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৭।।

৩৭। তত্রৈব।

৩৮। *মহাবীরচরিতম্,* ১.৬।

৩৯। *মহাবীরচরিতম্,* ১.১৮।

৪০। *মহাবীরচরিতম্,* ১.৩৫।

৪১। *নাট্যশাস্ত্র*, ৭.৭৩।

৪২। *মহাবীরচরিতম্*, ১.৫৩।

৪৩। *মহাবীরচরিতম্*, প্রথম অঙ্ক।

৪৪। *মহাবীরচরিতম্*, ১.৫৪।

৪৫। *মহাবীরচরিতম্*, ২.২১।

৪৬। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৬৩।

৪৭। *মহাবীরচরিতম্*, ৫.১৬।

৪৮। *মহাবীরচরিতম্*, ৫.১৭।

৪৯। *মহাবীরচরিতম্*, ৬.৯।

৫০। *মহাবীরচরিতম্*, ৬.৩৩।

৫১। *মহাবীরচরিতম্*, ৬.৩৪।

৫২। *মহাবীরচরিতম্*, ৬.৫৬।

৫৩। *মহাবীরচরিতম্*, ২.২৫।

৫৪। *মহাবীরচরিতম্*, ২.২৬।

৫৫। *মহাবীরচরিতম্*, ৫.২১।

৫৬। *মহাবীরচরিতম্*, ৫.২৬।

৫৭। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১৯৭৯ (খণ্ড - ৬), পৃ. ৭।

৫৮। *উত্তররামচরিতম্*, প্রথম অঙ্ক।

৫৯। *উত্তররামচরিতম্*, প্রথম অঙ্ক।

৬০। *উত্তররামচরিতম্*, ১.২০।

৬১। *উত্তররামচরিতম্*, তৃতীয় অঙ্ক।

৬২। *উত্তররামচরিতম্*, ৩.৪।

৬৩। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৬৩।

৬৪। *উত্তররামচরিতম্*, ৩.৫।

৬৫। *উত্তররামচরিতম্*, ৫.৩৫।

৬৬। *নাট্যশাস্ত্র*, ৭.২১।

৬৭। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৬৭।

৬৮। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*, ১৯৭৯ (খণ্ড - ৬), পৃ. ৭।

৬৯। *উত্তররামচরিতম্*, ৩.৪৭।

৭০। তদৈব।

(গ) নাট্যকার শূদ্রক

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অন্যতম নাট্যকার শূদ্রক কালিদাস পরবর্তী যুগের কবি। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্যকাব্য *মৃচ্ছকটিক* মূলতঃ গুপ্ত-গুপ্তোত্তর যুগের রচনা। আনুমানিক খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এই প্রকরণটি রচিত হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মতানুযায়ী শূদ্রক এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর রচনাকালের ব্যাপ্তি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত।[১]

কবি শূদ্রকের দৃশ্যকাব্যের 'রীতি'

মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্যের রচয়িতা শূদ্রক বৈদর্ভী রীতির কবি। মৃচ্ছকটিক প্রকরণটি বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। বৈদর্ভী রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামন বলেছেন - বৈদর্ভী রীতি হল সেই রীতি যা সমস্তগুণের সমাবেশে গড়ে ওঠে।

'সমস্তগুণোপেতা বৈদর্ভী'। [২]

অর্থাৎ, ওজঃ, প্রসাদ, শ্লেষ, সমতা, সমাধি, মাধুর্য, সৌকুমার্য, উদারতা, অর্থব্যক্তি ও কান্তি - এই দশটি গুণের সমাবেশ ঘটে বৈদর্ভী রীতিতে।

ওজঃ প্রসাদশ্লেষসমতাসমাধিমাধুর্যসৌকু
মার্যোদারতা'র্থব্যক্তিকান্তয়ো বন্ধগুণাঃ।। [৩]

ওজঃ, প্রসাদ প্রভৃতি দশটি গুণের মিশ্রণে যে রীতি গড়ে ওঠে তাই বৈদর্ভী। বর্ণনীয় রসের চমৎকারিতা ও সমগ্র সৌন্দর্যশালিতার জন্য বৈদর্ভী রীতিকে আচার্য

বামন শ্রেষ্ঠ রীতি বলে গণ্য করে থাকেন। গৌড়ী, পাঞ্চালী ও বৈদর্ভী - এই তিনটি রীতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রীতি হল বৈর্দভী।

সা ত্রিধা বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালী চেতি।[৪]

তাসাং পূর্বাগ্রাহ্যা, গুণসাকল্যাৎ।[৫]

সমাসবদ্ধপদবিহীন বৈদর্ভী কাব্যে ব্যবহৃত হলে, তাকে শুদ্ধ বৈদর্ভী বলা হয়। কবি শূদ্রক এই শ্রেষ্ঠ রীতি-বৈদর্ভীকে অবলম্বন করে তাঁর দৃশ্যকাব্য রচনা করেছেন।

মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্য যেহেতু 'প্রকরণ' জাতীয় দৃশ্যকাব্য, তাই প্রকরণের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্টগুলি থাকে, তাও এই দৃশ্যকাব্যের রীতিকে প্রভাবিত করে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে এক বিশেষ রূপভেদ হল প্রকরণ। প্রকরণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মৃচ্ছকটিকের কাহিনী লৌকিক এবং তা সম্পূর্ণ কবির স্বকপোলকল্পিত। প্রধান রস হল শৃঙ্গার, নায়ক, ধীর প্রশান্ত, বিপ্র এবং বণিক, নায়িকা গণিকা ও কুলস্ত্রী। এই দৃশ্যকাব্যের মধ্যে বীট, চেট, ধূর্ত, জুয়াড়ী প্রভৃতি চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্যে প্রকরণের লক্ষণগুলি বর্তমান।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মৃচ্ছকটিকের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলেছেন — *বাহুল্যেন বৈদর্ভীরীতিঃ। অল্পবৃত্তিরবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে।*'[৬] শূদ্রকের দৃশ্যকাব্যের ভাষা পড়লে বোঝা যায়, দৃশ্যকাব্যের ভাষা সম্পর্কে 'নাট্যশাস্ত্রে' ভরতের নির্দেশ তিনি অমান্য করেননি —

মৃদুললিতপদার্থং গূঢ়শব্দার্থহীনং
জনপদসুখভোগ্যং বুদ্ধিমন্নৃত্তযোজ্যম্।
বহুরসকৃতমার্গং সন্ধিসন্ধানযুক্তং
ভবতি জগতি যোগ্যং নাটকপ্রেক্ষকাণাম্।।[৭]

অর্থাৎ, যে নাটকে পদ ও অর্থ মৃদু এবং সুললিত, যাতে গুঢ় বা দুর্বোধ্য শব্দ ও অর্থ নেই, গ্রামবাসীর পক্ষে যা সহজবোধ্য, বুদ্ধিদীপ্ত, নৃত্যের উপযোগী যাতে অনেক রসের অবতারণা করা হয়েছে এবং সন্ধি প্রায়োগযুক্ত তা জগতে দর্শকদের যোগ্য।

শূদ্রকের কাব্যশৈলী সরল ও স্বাভাবিক। কালিদাসের মতো স্নিগ্ধ পদলালিত্য কাব্যাত্মক সৌষ্ঠব শূদ্রকের রচনায় সুলভ নয়। শূদ্রকের শব্দাবলী বহুবিচিত্র, শূদ্রকের দৃশ্যকাব্যে বেশীরভাগ চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেছে এবং তিনি অপ্রচলিত প্রাকৃতশব্দও ব্যবহার করেছেন। এই প্রাকৃতভাষার ব্যবহার জানিয়ে দেয় - *মৃচ্ছকটিক* লোকজীবনের অত্যন্ত কাছাকাছি ছিল।

শূদ্রক খুব বেশী দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগ করেননি। শূদ্রকের রচিত বাক্য সাধারণতঃ সরল এবং স্পষ্ট, তবে তা কখনও শক্তিহীন নয়, লক্ষ্য সাধনে ব্যর্থ নয়। বসন্তসেনার প্রাসাদ বর্ণনায় ‘ওজঃ’ রীতির প্রকাশ দেখা যায়। *ওজশ্চিত্তস্য বিস্তাররূপং দীপ্তত্বমুচ্যতে।*[৮] প্রকরণের অন্য অংশে বৈদর্ভী রীতির প্রকাশ দেখা যায়, যে রীতিতে কালিদাসের কৃতিত্ব ছিল। বৈদর্ভী রীতি সম্পর্কে কাব্যাদর্শে বলা হয়েছে — *শ্লেষঃ প্রসাদঃ সমতা মাধুর্য্যং সুকুমারতা। অর্থব্যক্তিরুদারত্বমোজঃ কান্তি সমাধয়ঃ।। ইতিবৈদর্ভমার্গস্য প্রাণা দশগুণাঃ স্মৃতা।*[৯]

শূদ্রকের রচনায় সবগুণের বিদ্যমানতা প্রবল না হলেও, তাদের উপস্থিতি অস্বীকার করা যায় না।

মৃচ্ছকটিকম্ঃ

মৃচ্ছকটিক-এ প্রাচীন উজ্জয়িনীর সমাজচিত্র ধরা পড়েছে। চির-উৎসবের নগরী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এবং গণিকাকন্যা বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনী এই দশাঙ্ক প্রকরণের বিষয়বস্তু। চতুর্থ অঙ্কে বসন্তসেনা ও মদনিকার মুখে যে চিত্রাকৃতি ও চিত্রফলকের বর্ণনা পাই, তা থেকে বোঝা যায় সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য ও অভিনয় চর্চার পাশাপাশি চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার প্রচলনও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ছিল এবং অবশ্যই তা সমৃদ্ধ ও বিত্তবানদের মধ্যে। নায়িকা বসন্তসেনা নায়ক চারুদত্তের প্রতিকৃতি অঙ্কণ করেছেন এবং সেই প্রসঙ্গে দাসী মদনিকাকে জিজ্ঞাসা করেছেন — *অপি সুসদৃশীয়ং চিত্রাকৃতিরার্য চারুদত্তস্য* [১০] অর্থাৎ 'এ ছবি চারুদত্তের অনুরূপ হয়েছে তো?' এবং সেই ছবি তাঁর শয়নকক্ষে স্থাপন করার কথা বলেছেন। *চেটি, ইমং তাবচ্চিত্রফলকং মম শয়নীয়ে স্থাপয়িত্বা তালবৃন্তা গৃহীত্বা লব্ধাগচ্ছ।* [১১]

চিত্র যে তৎকালীন সমাজে গৃহে স্থাপিত হত এ তারই ইঙ্গিত। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরে চিত্র রাখা হত মঙ্গলকামনায় এবং সেটি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই চতুবর্গ ফলপ্রদায়ক।

কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।
মঙ্গল্যং প্রথমং বৈ তদ্ গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।। [১২]

নাট্যকার শূদ্রক এই প্রকরণের চতুর্থ অঙ্কে প্রকাণ্ড আটমহল অট্টালিকার বর্ণনা করেছেন। গণিকালয়ের সিংহদ্বার থেকে শুরু করে হাতির দাঁতের তোরণ, হীরে

বসানো সোনার কপাট, স্ফটিক কলস যা উজ্জয়িনীর নগরীর সমৃদ্ধির চিত্রকেই তুলে ধরে। গণিকালয়ের তৃতীয় মহলটি ভদ্রজনের বসবার ঘর। এখানে রয়েছে মণিময় পাশার ছক, অর্ধপঠিত পুস্তক এবং চিত্রফলক। এই চিত্রফলক থেকেই তৎকালীন সমাজে চিত্র দ্বারা গৃহসজ্জিত করার প্রথা মনে করিয়ে দেয়। এই প্রকরণের চতুর্থ অঙ্কে বর্ণিত বিদুষকের থেকে আমরা জানতে পারি যে বসন্তসেনার অট্টালিকার তৃতীয় প্রকোষ্ঠে রতিশাস্ত্রে বিজ্ঞ গণিকা ও বৃদ্ধ রসজ্ঞেরা বিবিধবর্ণ বিলিপ্ত চিত্রফলক হস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করছেন —

বিদুষকঃ (প্রবিশ্য, দৃষ্ট্বা চ) আশ্চর্য ভোঃ। ইহাপি তৃতীয়ে প্রকোষ্ঠে ইমানি তাবৎ কুলপুত্রজনোপবেশন নিমিত্তং বিরচিতন্যাসনানি। অর্ধবাচিতং পাশকপীঠে তিষ্ঠতি পুস্তকম্। এতচ্চ স্বাধীনমণিময় সারিকাসহিতং পাশকপীঠম্ ইমো চাপরে মদনসন্ধিবিগ্রহচতুরা বিবিধকার্ণিকাবিলিপ্ত চিত্রফলকা গ্রহস্তা ইতস্ততঃ পরিভ্রমন্তি গণিকা বৃদ্ধবিটাশ্চ। আদিশতু ভবত। [১৩]

বিদুষক তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করে এতটাই বিস্মিত হয়েছেন, চমৎকৃত হয়েছেন রসজ্ঞ নানা রঙের চিত্রফলক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখে, তাই তার মুখ নিয়ে '*বাঃ*' এই প্রসংশাসূচক উক্তি দেখা গেছে। তাই এখানে নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী বিস্ময়ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। আচার্য ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বিস্ময়ভাব সম্বন্ধে বলেছেন যে —

বিস্ময়ো নাম মায়েন্দ্রজালমানুষকর্মাতিশয়বিদ্যাচিত্রপুস্তচ্ছিল্পাতিশয়াদ্যৈর্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। [১৪]

অর্থাৎ, মায়া, ইন্দ্রজাল, লোকের অসাধারণ কাজ, অসাধারণ বিদ্যা, চিত্রকর্ম, পুস্ত ও শিল্পচাতুর্য প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা বিস্ময় উৎপন্ন হয়। এই বিস্ময় স্থায়ী ভাবের দ্বরা নিষ্পন্ন রস হল - অদ্ভুত রস।

অথাদ্ভুতো নাম বিস্ময়স্থায়িভাবাত্মকঃ।[১৫]

এই অদ্ভুত রস উৎপন্ন হয় উত্তমগৃহে গমণ, উত্তম বস্তুর দর্শনজনিত বিভাবের দ্বারা।[১৬] মৃচ্ছকটিক প্রকরণে বিদুষক প্রশংসা এই অনুভাবের দ্বারা অদ্ভুতরসের সূচনা করেছেন।

চিত্রকলার পাশাপাশি ভাস্কর্যের প্রচলন ছিল মৃচ্ছকটিকের সমাজে। পাথর কেটে ভাস্কর্য নির্মাণের প্রসঙ্গ এসেছ প্রথম অঙ্কে বর্ণিত ধাবমান বসন্তসেনার বর্ণনাদৃশ্য থেকে। রক্তবসন পরিহিত, দ্রুত ধাবমান বসন্তসেনা যেন রক্তবস্ত্রপরিহিতা বালকদলীর মতো রেশমী আঁচল বাতাসে আন্দোলিত করে অস্ত্রাঘাতে বিদীর্যমান মনঃশিলা গুহার মতো কমল-মুকুল বিকিরণ করতে করতে ছুটে পালাচ্ছে।

কিংযাসি বালকদলীব বিকম্পমানা রক্তাংশুকং পবনলোলদশং বহন্তী।
রক্তোৎপল প্রকরকুড্‌মলমুৎসৃজন্তি টঙ্কৈর্মনঃ শিলাস্তরে বিদার্যমানা।।[১৭]

এখানে লাল শাড়ি ও রক্তপদ্মের সঙ্গে মনঃশিলাচূর্ণের উপমা - যা পাথর কেটে ভাস্কর্য নির্মাণকেই নির্দেশ করছে। মৃচ্ছকটিক প্রকরণে ভাস্কর্য নির্মাণের কোনও প্রসঙ্গ পাওয়া না গেলেও এই দৃশ্যকাব্যের নানান ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে মূর্তিশিল্পের প্রসঙ্গটি এসেই যায়। যেমন তৎকালীন সমাজে মাতৃদেবতার পূজার প্রচলন ছিল, তার উল্লেখ পাই এই দৃশ্যকাব্যের প্রথম অঙ্কে, যেখানে চারুদত্ত বিদুষককে বলছেন - 'তুমি যাও মাতৃদেবতার পূজার উপচার নিয়ে এসো।'

তদগচ্ছ। মাতৃভ্যো বলিমুপহর।'[১৮]

অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে মাতৃমূর্তি নির্মাণের প্রসঙ্গটিও চলে আসে। শিল্পীরা মাতৃকামুর্তি নির্মাণ করতেন এ তারই ইঙ্গিত।

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর সময় থেকেই অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মাতৃকামূর্তি পূজার প্রচলন ছিল, বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা তৎকালীন ভাস্কর্যশিল্পের দলিল।

মৃচ্ছকটিকের সমাজজীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন ছিল। তাই মনে করা যেতে পারে ঐ সময় বৌদ্ধমূর্তিশিল্পও সমাজে প্রচলিত ছিল। মৃচ্ছকটিকের সময়কাল অনুযায়ী গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচুর বৌদ্ধস্তূপ, বিহার নির্মাণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়, তাই স্বাভাবিক কারণে ভগবান বুদ্ধের মূর্তিনির্মাণের প্রসঙ্গটি নিছক অলৌকিক নয়।

এই দৃশ্যকাব্যের দশম অঙ্কে সংবাহক চরিত্রটির বৌদ্ধভিক্ষুতে রূপান্তরের ঘটনা পাই, সেখানে জুয়াখেলায় আসক্ত হয়ে সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছে ও ভিক্ষুরূপে পরিচিত হয়েছে।

তেন চ দ্যুতনির্বেদেন শাক্যশ্রমণকঃ সংবৃত্তো'স্মি। [১৯]

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের প্রধান বা অঙ্গীরস হল শৃঙ্গার। এই দৃশ্যকাব্যে নায়ক চারুদত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনার প্রণয়কাহিনীর মধ্যে শৃঙ্গাররস প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আচার্য ভরতমুনি কথিত অষ্টরসের মধ্যে অন্যতম হল শৃঙ্গার।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। [২০]

শৃঙ্গার রস শৃঙ্গার রতি নামক স্থায়িভাব থেকে উদ্ভুত ও উজ্জ্বল বেষাত্মক। পৃথিবীতে যা কিছু শুভ পবিত্র, সুদর্শন - তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয়।

তত্র শৃঙ্গারো নাম রতস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ যথা যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয় বা তচ্ছৃঙ্গারেণো -পমীয়তে।[২১]

নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে —

সুখপ্রায়েষ্টসম্পন্ন ঋতুমাল্যাদিসেবকঃ।
পুরুষপ্রমাদযুক্তঃ শৃঙ্গার'তি সংজ্ঞিত।।[২২]

ঋতুমাল্যালঙ্কারৈঃ প্রিয়জনগান্ধর্বকাব্যসেবাভিঃ।
উপবনগমনবিহারৈঃ শৃঙ্গাররসঃ সমুদ্ভবতি।।[২৩]

সুখবহুল, প্রিয়বস্তুযুক্ত, ঋতু, মালা প্রভৃতির সেবক ও পুরুষ-নারীর প্রেমের সঙ্গে যুক্ত রস শৃঙ্গার নামে অভিহিত হয়। ঋতু, মালা, অলংকার, প্রিয়জনের সঙ্গ, সঙ্গীত ও কাব্যের উপভোগ, প্রমোদোদ্যানে গমন ও বিহারের দ্বারা শৃঙ্গার উদ্ভুত হয়।

দশরূপকে বলা হয়েছে - *রম্যদেশকলাকালবেষভোগাদিসেবনৈঃ। প্রমোদাত্মা রতিঃ সৈব যূনোরন্যোন্যরক্তয়োঃ। প্রহৃষ্যমাণা শৃঙ্গারোমধুরাঙ্গ-বিচেষ্টিতঃ।*[২৪]

'মৃচ্ছকটিকম্' প্রকরণে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রগাঢ় প্রেম চিত্রিত হয়েছে। এখানে নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা, সামান্যা নায়িকা।

বীরকলাপ্রগণ্ডীস্যাদ্বেশী সামান্যা নায়িকা।[২৫]

সাধারণতঃ, সামান্যা নায়িকাতে রসাভাবের সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু এখানে বসন্তসেনাকে কুলবধূরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা গেছে এবং প্রকরণের সমাপ্তিতে তাই ঘটেছে, তাই এখানে শৃঙ্গার রস অঙ্গী রস।

প্রকরণ শ্রেণীর দৃশকাব্য মৃচ্ছকটিকেও একটি প্রধান রস ও তার সঙ্গীরস

হিসেবে অনেকগুলি অপ্রধান রসের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এই প্রকরণের প্রধান রস শৃঙ্গারকে আলঙ্কারিকগণ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার ও সম্ভোগ শৃঙ্গার ভেদে বিভক্ত করেছেন। সম্ভোগ শৃঙ্গারের পরিপূষ্টির জন্যই বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসের উপস্থাপনা প্রয়োজনীয় বলে তাঁরা মনে করেন।

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে। [২৬]

সম্ভোগ শৃঙ্গারের তিনটিভাগের কথা নাট্যশাস্ত্রে পাওয়া যায় - অযোগ, বিপ্রয়োগ ও সম্ভোগ।

অযোগ বিপ্রযোগাশ্চ সম্ভোগশ্চেতি স ত্রিধা [২৭]

কামদেবতায়নের উদ্যানে রূপযৌবনসম্পন্ন চারুদত্তকে দেখার পর থেকেই বসন্তসেনার মধ্যে তাঁর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে। শকারের ভয়ে ভীতা হয়ে যখন বসন্তসেনা রাত্রির অন্ধকারে চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তাঁর দর্শন পেলেন সেই সময়ে বসন্তসেনার মধ্যে অনুরাগ আরো দৃঢ়তর হল। চারুদত্তও যে বসন্তসেনার প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন সেটা প্রথম অঙ্কের শেষদিক থেকেই বোঝা যায়। বসন্তসেনা সেখান থেকে চলে যাবার সময় অনুরাগপূর্ণ চাহনির দ্বারা প্রেমকে স্পষ্টীভূত করেছে।

যথারীতি সম্ভোগকে পরিপুষ্ট করার জন্য বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের উপস্থিতি নাটকে পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় অঙ্কে বসন্তসেনার মুগ্ধ ভাবের মধ্যে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের সুচনা পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ অঙ্কের বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও সম্ভোগের পুষ্টিসাধক হয়েছে। প্রিয়বিষয়ক রতি নায়িকাকে নায়কের দিকে অভিসারে নিয়ে যায়। পঞ্চমাঙ্কে বসন্তসেনার অভিসারের মধ্যে সেই ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে। বর্ষার ঘনঘটার মধ্যেই বসন্তসেনা বেরিয়েছেন অভিসারে। প্রবল বর্ষায় সিক্ত হয়ে তিনি চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করছেন এবং চারুদত্ত তাঁকে আলিঙ্গন করেছেন। নাটকের শেষে নায়ক-নায়িকার মিলনের মাধ্যমে শৃঙ্গার রস পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

সম্ভোগ শৃঙ্গার এই প্রকরণে কবির অভিপ্রেত হলেও বিপলম্ভ উপেক্ষিত হয়নি। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি চারুদত্তের চিন্তায় বসন্তসেনা এতটাই নিমগ্না যে মাতৃআদেশ পালন করে তিনি স্নান করতে চাননি। মদনিকা তাঁর আচরণের অসঙ্গতির মধ্যে সেই প্রেমের স্ফুরণটি অনুধাবন করতে পেরেছে। কর্ণপূরকের কথা শুনে প্রেমাস্পদ চারুদত্তকে দর্শনের জন্য যখন বসন্তসেনা প্রাসাদের ওপর আরোহন করছেন তখন বিপ্রলম্ভের উৎকণ্ঠা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়। কেবল নায়িকা বসন্তসেনার মধ্যেই বিপ্রলম্ভের উৎকণ্ঠা চিত্রিত হয়নি, নায়ক চারুদত্তের মধ্যেও সেই উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি। ষষ্ঠ ও সপ্তম অঙ্কে উভয়ের চরিত্রেই উৎকণ্ঠার ভাব বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের প্রকাশক।

মূল শৃঙ্গারের সঙ্গে প্রথমাঙ্কেই চারুদত্তের দরিদ্র অবস্থার বর্ণনায় বা দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহকের অবস্থা বর্ণনায় কিংবা অলঙ্কার চুরির ঘটনা শুনে চারুদত্তের পত্নী ধূতার মূর্চ্ছিতা হওয়ার করুণ রস উপস্থাপিত হয়েছে।

ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ করুণাখ্যো রসো ভবেৎ। [২৮]

চারুদত্তকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার পর ধূতার অগ্নিপ্রবেশের সময় বালক রোহসেনের মাতৃঅঞ্চল আর্কষণের ঘটনাতেও করুণ রসের প্রকাশ ঘটেছে।

বসন্তসেনাকে নির্মমভাবে হত্যার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কবি বীভৎস রসের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

জুগুপ্সাস্থায়িভাবস্তু বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ। [২৯]

নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ও দশরূপকের চতুর্থে বলা হয়েছে যে - অপ্রিয় বস্তু দর্শন, গন্ধ বা শব্দ দোষ, কিংবা বহুপ্রকার উদ্বেগের দ্বারা এই রস উদ্ভুত হয়। কালিদাসাদির নাটকে এই রসের প্রকাশ সেভাবে দেখা না গেলেও ভাস বা ভবভূতিতে এর প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

বিকৃতরূপ, কথাবার্তা, বেশ বা অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা হাস্যরস উপচিতি হয়। রাজার শ্যালক শকারের বিভিন্ন উক্তিতে এবং বিটের সঙ্গে তার কথোপকথনে হাস্য রসের উদ্বোধন হয়েছে। প্রথমাঙ্কে, অষ্টমাঙ্কে, তৃতীয়াঙ্কে, ষষ্ঠ অঙ্কে ও অন্যত্রও এই হাস্যরসের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। হাস্যরস এখানে বিভিন্ন অসঙ্গত পৌরাণিক উক্তিতে যেমন জমেছে তেমনি দ্বিতীয় অঙ্কে জুয়াখেলার দৃশ্যে বা ষষ্ঠ অঙ্কে বীরক ও চন্দনকের বিবাদের মধ্যেও জমেছে। নবম অঙ্কে আদালতের বিচারকদের সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ ও বিদূষকের সঙ্গে বিবাদে হাস্যরস পাওয়া যায়।

খুণ্ডমোটকের উপদ্রপের ঘটনায় ভয়ানক রস পরিলক্ষিত হয়, সংবাহকের ভিক্ষু প্রসঙ্গে পরিলক্ষিত হয় শান্তরস। কর্পূরকের দ্বারা বসন্তসেনার হাতির থেকে ভিক্ষুকে রক্ষার ঘটনায় অদ্ভুত রস পাওয়া যায়। আর্যকের প্রসঙ্গে দেখা যায় বীররস, রোহসেনের বাল্যাবস্থার বর্ণনায় বাৎসল্য রস লক্ষ্যনীয়। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে শূদ্রকের রচনায় সমস্ত রসেরই সমন্বয় ঘটেছে।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণের পত্রাবলী নান্দীতে[৩০] শিব-পার্বতীর বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে নীলকন্ঠের কৃষ্ণমেঘবর্ণ যে কণ্ঠে গৌরীর বাহুলতা বিদ্যুৎলেখার মতো শোভা পায়, সেই কণ্ঠ তোমাদের রক্ষা করুক।

পাতু বো নীলকন্ঠস্য কণ্ঠঃ শ্যামাম্বুদোপমঃ।
গৌরীভুজলতা যত্র বিদ্যুল্লেখের রাজতে।[৩১]

এখানে শিব-পার্বতীর বর্ণনায় শৃঙ্গাররস উপস্থাপিত হয়েছে। মৃচ্ছকটিক প্রকররের অঙ্গী বা প্রধান রস হল - শৃঙ্গার। আচার্য ভরতমুনি কথিত অষ্টরসের মধ্যে অন্যতম হল শৃঙ্গার।[৩২] এই শৃঙ্গার রস রতি নামক স্থায়িভাব থেকে উদ্ভুত।[৩৩] প্রকরণজাতীয় দৃশ্যকাব্য মৃচ্ছকটিককে নাটকের মতো রস আবশ্যিক[৩৪] এবং সাহিত্যদর্পণে বলা হয়েছে - প্রকরণের অঙ্গ রস হবে শৃঙ্গার।[৩৫]

সেইমতো আলোচ্য নান্দী শ্লোকে শিব-পার্বতীর মিলনদৃশ্যটিতে শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

নান্দী শ্লোকে উল্লিখিত শিবের কণ্ঠে গৌরীর ভূজলতা স্থাপন বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রেমোপাখ্যানে। নাটকের সমাপ্তিতে যে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলন ঘটবে, তা স্পষ্ট করেছে এই ব্যঞ্জনাটি। এখানে *শ্যামাম্বুদ* পদটিতে ব্যঞ্জনা বা ধ্বনির ইঙ্গিতবাহী, চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলন যে বর্ষার পটভূমিতে ঘটবে এটি তারই আভাস।

গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যে শ্লোকের অনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সেখানে শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তিতেও শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে সাহিত্যের রীতি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির নামান্তর। শিল্পকলার ক্ষেত্রেও শিব-পার্বতীর মূর্তির মধ্য দিয়ে মিলনাত্মক দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্যের দৃশ্য বর্ণনা ও শিল্পকলার বস্তুবর্ণনা একই। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দের মধ্য দিয়ে কবি বিষয়টির উপস্থাপন ঘটান তার শিল্পী সেই রূপকে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পকলার মধ্য দিয়ে বিমূর্ততার মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও শিল্পের রস, রীতি, ধ্বনি সাহিত্যের রস রীতি ধ্বনির মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণে যেখানে বসন্তসেনার প্রতি বিটের উক্তি — ভয় পেয়ে কেন তুমি তোমার দেহসুষমা হারিয়ে নৃত্যমৃদুল ছন্দিত চরণে ভয়চকিত কটাক্ষ হেনে ব্যাধতাড়িতা ভীতা হরিণীর মতো ছুটে যাচ্ছ।

কিং ত্বং ভয়েন পরিবর্তিতসৌকুমার্যা
নৃত্যপ্রয়োগবিশদৌ চরণৌক্ষিপন্তী।
উদ্বিগ্নচঞ্চলকটাক্ষবিসৃষ্টদৃষ্টি
র্ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর যাসি।।[৩৬]

এখানে ভয় নামক স্থায়িভাবের প্রকাশ ঘটেছে এবং ভয়ানক রসের উপস্থাপিত হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রে অষ্টরসের মধ্যে অন্যতম হলো ভয়ানক রস। এই ভয়ানক রস স্ত্রীলোকের চিত্তে ভৎর্সনা প্রভৃতি বিভাবের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং করকম্পিত চরণ, ধাবন প্রভৃতি অনুভাবের দ্বারা এই ভাবের অভিনয় ঘটে —

ভয়ং নাম স্ত্রীনীচপ্রকৃতিংগুরুরাজাপরাধশূণ্যগারাটবীপর্বতদর্শননির্ভৎস-নদুর্দিননিশান্ধকারোলূকনক্তঞ্চারারাব-শ্রবণাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য প্রবেপিত-করচরণহৃদয়কম্পনস্তম্ভমুখশোষণজিহ্বাপরিলেহনস্বেদবেপথুপরিত্রাণমন্বে-ষণধা-বনোৎক্রুষ্টাদিভিরনুভাবৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্য।[৩৭]

ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয়, আলোচ্য শ্লোকে নায়িকা বসন্তসেনার ভীতা হরিণীর মতো ছুটে পালানোর দৃশ্যটি ভয়ানয় রসের অভিব্যক্তি। ভয়ানক রস সম্বন্ধে ভরতমুনি বলেছেন —

অথঃ ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ। স চ বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনশিবোলুকত্রা-সোদ্বেগশূণ্যাগারাণ্যপ্রবেশস্মরণস্বজন-বধবন্ধদর্শনশ্রুতিকথাদিভির্বিভাবৈরুৎপদ্যতে। তস্য প্রবেপিতকরচরণনয়নচলনপুলকমুখবৈবর্ণ্যস্বরভেদাদিভিরনুভা-বৈরভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ। ব্যভিচারিভাবাশ্চাস্যস্তম্ভস্বেদগদ্গদরোমাঞ্চবেপথুস্বরভেদবৈবর্ণ-শঙ্কামোহদৈন্যাবেগচা-পলজড়তাত্রাসাপাস্মার মরণাদয়ঃ।[৩৮]

নায়িকা বসন্তসেনার ছুটে পালানোর দৃশ্যটি কবি নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্রিত করেছেন কবি শূদ্রক। নাট্যশাস্ত্রে নায়িকার লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

রূপগুণশীলযৌবনসুবর্ণমাল্যাভরণৈঃ সম্পন্না।
বিশদা স্নিগ্ধা মধুরা পেশলবচনশুভরক্তকণ্ঠী চ।।
যোগ্যায়ামক্ষুভিতা লয়তালভা রসৈশ্চ সম্পন্না।
সর্বাভরণসংযুক্তা গন্ধমাল্যোপশোভিতা।।
এবংবিধগুণৈর্যুক্তা কর্তব্যা নায়িকা তজজ্ঞৈঃ।[৩৯]

এখানে, নায়িকা বসন্তসেনা গণিকা হলেও নারীসুলভ আচরণে অভ্যস্ত, নৃত্যপটীয়সী, কোমলহৃদয়া নারী এবং ভয়ে আশঙ্কার অস্থিরচিত্তে ভীত হরিণীর মতো ছুটে চলেছেন। এই ভীতা হরিণীর মতো ছুটে পালানোর দৃশ্যটির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার একটি দৃষ্টান্তের সাদৃশ্য দেখা যায়।

আলোচ্য শ্লোকে ব্যাধতাড়িত ভীতা হরিণীর ছুটে পালানোর সঙ্গে বসন্তসেনার ভয় পেয়ে ছুটে পালানোর প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ভীতা বসন্তসেনার চিত্র বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট।

কবি শূদ্রক ছুটন্ত বসন্তসেনার বর্ণনা করেছেন বিটের মাধ্যমে —

কিং যাসি বালকদলীব বিকম্পমানা
রক্তাংশুকং পবনলোলদশং বহন্তী।
রক্তোৎপলপ্রকরকুড্‌মলমুৎসৃজন্তী
টঙ্কৈর্মণশিলগুহেব বিদার্যমাণা।।[৪০]

অর্থাৎ, রক্তবস্ত্রপরিহিতা তুমি (বসন্তসেনা) বালকদলীর মতো রেশমী আঁচল বাতাসে আন্দোলিত করে অস্ত্রাঘাতে বিদীর্যমান মনঃশিলা গুহার মতো কমল-মুকুল বিকিরণ করতে করতে কেন পালাচ্ছ।

এখানে নায়িকা বসন্তসেনা রক্তবস্ত্র অর্থাৎ লালরঙের বস্ত্র পরিহিতা; নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী 'লাল' বা রক্তিম বর্ণ রৌদ্র রসকে সূচিত করে।

শ্যামো ভবেত্তু শৃঙ্গারঃ সিত হাস্য প্রকীর্তিতঃ।
কপোতঃ করুণশ্চৈব রক্তো রৌদ্রঃ প্রকীর্তিতঃ।।[৪১]

আবার, এখানে ভয় স্থায়িভাব হওয়ায় ভয়ানক রসের উপস্থাপন ঘটেছে।[৪২]

এখানে, ভীত সন্ত্রস্ত নায়িকা বসন্তসেনার চিত্র তুলে ধরেছেন কবি। লাল রেশমী কাপড় পরিহিতা বসন্তসেনাকে যেন মনঃশিলাগুহার মতো মনে হচ্ছে। *টঙ্কৈর্মণঃশিলগুহেব বিদার্যমানা* - এর দ্বারা প্রাচীনকালে যে ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য মনঃশিলা পাথর খনন বা খোদাই করার রীতি প্রচলিত ছিল, তারই বর্ণনা। লাল রঙের এক বিশেষ ধরণের ধাতুকে বলে মনংশিলা। এখানে রক্তিম বা লাল বর্ণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। বসন্তসেনা লালবর্ণের বস্ত্র পরিহিতা, ছুটন্ত বসন্তসেনা যেমন লালমনঃশিলা গুহার মতো রক্তপদ্মের কুড়ি ছড়াতে ছড়াতে কচি কলাগাছের মতো কাঁপতে কাঁপতে চলেছেন - এর দ্বারা ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি পরিস্ফুট হয়েছে। রক্তবসন পরিহিতা বসন্তসেনা যেন ভাস্কর্যের মতো প্রতিভাত।

শিল্পকলার দৃষ্টান্তস্বরূপ ছুটন্ত, কম্পিত নারীর রূপ মূর্তি শিল্পে বা ভাস্কর্যে দেখা যায়।

নিম্নোক্ত শ্লোকে বীট বসন্তসেনার বর্ণনা করেছে —

কিং ত্বং কটীতটনিবেশিতমুদ্বহন্তী
তারাবিচিত্ররুচিরং রশনাকলাপম্।
বক্ত্রেণ নির্মথিতচূর্ণমনঃশিলেন
ত্রস্তাদ্ভুতং নগরদৈবতবৎপ্রয়াসি।।[৪৩]

অর্থাৎ, ওগো বসন্তসেনা, কটিতটে তারকার মতো উজ্জ্বল চন্দ্রহার, তোমার মুখদেশ মনঃশিলা - চুর্ণলেপনে শোভিত। এইভাবে ভীত হয়ে নগর-দেবীর মতো কোথায় চলেছ।

এখানে বসন্তসেনাকে নগর-দেবীর সঙ্গে তুলনা করা হল। মুখদেশ যেন মনংশিলা চূর্ণলেপনে শোভিত। যা মূর্তির সদৃশ্য। কটিদেশে চন্দ্রহার প্রাচীন ভারতীয় মূর্তিশিল্পকে মনে করায়।

বসন্তসেনা উজ্জ্বলবর্ণের সুন্দর মেখলা পরেছে। এই মেখলা পরা বসন্তসেনা রূপের সঙ্গে করি কালিদাসের মেখলা পরা বারবণিতার বর্ণনার সাদৃশ্য আছে - *পাদন্যাসেঃ ক্বণিতীশনাস্ত্রত্র লীলাবধূলতৈঃ।* [৪৪]

এখানে নায়িকা বসন্তসেনার কটিভূষণের যে বিবরণ কবি দিয়েছেন তা বিচিত্র বর্ণের মনোহর, মেখলা নামে বিশেষ এক ভূষণ। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে কটিভূষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে —

কাঞ্চী মৌক্তিকজালাঢ্যা তলকং মেখলং তথা
রশমা চ কলাপশ্চ ভবেচ্ছ্রুণীবিভূষণম্।। [৪৫]

নায়িকার বস্ত্র মুক্তোখচিত মেখলার কথা নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে, যা মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্যে নায়িকা বসন্তসেনা ধারণ করেছেন। নায়িকার মুখদেশ মনঃশিলা চূর্ণ অর্থাৎ রক্তিমবর্ণের দ্রব্যে শোভিত অর্থাৎ এখানে ভয়ে বসন্তসেনার মুখমণ্ডলে লাল আভার সৃষ্টি হয়েছে। এই বর্ণনার সাথে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে উক্ত ভয়ানক রসের সাদৃশ্য মেলে।[৪৬]

চারুদত্ত মেঘের বর্ণনা করেছেন —

মেঘো জলার্দ্রমহিষোদরভৃঙ্গনীলো বিদ্যুৎ প্রভারচিতপীতপটোওরীয়ঃ।
আভাতি সংহতবলাকগৃহীতশঙ্খঃ খং কেশবো'পর ইবাক্রমিত্তং প্রবৃত্তঃ।।[৪৭]

কেশবগাত্রশ্যামঃ কুটিলবলাকাবলীরচিতশঙ্খঃ।
বিদ্যুদ্‌গুণকৌশেয়শ্চক্রধর ইবোন্নতো মেঘঃ।। [৪৮]

অর্থাৎ, জলে ভেজা মহিষের উদরের মতো ভ্রমর-নীল মেঘ শোভা পাচ্ছে। বিদ্যুৎপ্রভায় তার হলুদরঙের রেশমী চাদর তৈরী হয়েচে। সংলগ্ন বলাকা - পংক্তিস্বরূপ শঙ্খ ধারণ করেছে সে, যেন দ্বিতীয় বিষ্ণুর মতো আকাশ আক্রমণ করতে চলেছে।

এবং চক্রধারী বিষ্ণুর মতো একখণ্ড মেঘ উঠে আসছে। বিষ্ণুদেহের মতো তা শ্যামবর্ণ, বক্রবলাকা পঙ্‌ক্তিতে তার শঙ্খ রচিত হয়েছে, বিদ্যুৎ-তন্তুই তার পীতবস্ত্র।

এখানে কৃষ্ণবর্ণ মেঘকে দ্বিতীয় বিষ্ণুর সঙ্গে তুলনা করা হল। শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণুকে পীতাম্বর বলা হয়। এখানে মেঘের সঙ্গে নারায়ণের সাদৃশ্য দেখানো হয়েছে।

বাতাসে বিছন্ন হয়ে যাওয়া মেঘ যেন ছবির মেলা। কখনও মনে হচ্ছে নিবিড়ভাবে চক্রবাকমিথুন। আবার কখনও মনে হচ্ছে উড়ন্ত হাঁসের দল, কোথাও বা মীনসকরের ঝাঁক, আবার কোথাও সুউচ্চ সৌধরাশি। এইভাবে মেঘ নানা আকৃতি গ্রহণ করেছে।

এখানে মেঘের আলেখ্য-এর বর্ণনা দিয়েছেন কবি। নানান আকৃতির মেঘ নিয়ে ছবি সৃষ্টি হয়েছে। এখানে চিত্রশিল্প বা আলেখ্যের প্রসঙ্গ এসেছে।

এখানে ভয়ানক রসের প্রকাশ ঘটেছে।[৪৯]

আলোচ্য শ্লোকে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর মেঘের মধ্য দিয়ে বিষ্ণুকে ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে প্রতীয়মান অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে।[৫০]

বিটের মেঘ বর্ণনায় —

বিদুদ্ভির্জ্বলতীব সংবিহসতীবোচ্চৈর্বলাকাশতৈ
র্মাহেন্দ্রেণ বিবল্গতীব ধনুষা ধারাশরোদ্‌গরিণা।
বিস্পষ্টাশনিনিস্বনেন রসতীবাঘূর্ণতীবানিলৈ
র্নীলৈঃ সান্দ্রমিবাহিভির্জলধরৈর্ঘূপায়তীবাম্বরম্।।[৫১]

আকাশটা যেন বিদ্যুতে বিদ্যুতে জ্বলছে। শত শত বলাকার দরুণ যেন হাসছে। ধারাশরবর্ষী ইন্দ্রধণু উদিত হওয়ায় যেন নাচছে। বজ্রেয়ে উচ্চ ধ্বনির দরুণ যেন

চিৎকার করছে। ঝড়ে যেন টলছে। ঘন কালো সাপের মতো মেঘগুলোর দরুণ যেন ধূম উদ্‌গিরণ করছে বলে মনে হচ্ছে।

এখানে ভয়ানক রসের সমাগম ঘটেছে যা যুদ্ধের বর্ণনার তুল্য।

ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে ভয়ানক রস সম্বন্ধে বলেছেন - ভয়ানক রসের স্থায়িভাব ভয়।

অথঃ ভয়ানকো নাম ভয়স্থায়িভাবাত্মকঃ[৫২]

বিকৃত রব, সংগ্রাম প্রভৃতির জন্য ভয়ানক রসের সঞ্চরণ হয়।

বিকৃতরবসত্ত্বদর্শনসংগ্রামারণ্যশূণ্যগৃহগমনাৎ।
গুরুনৃপয়োরপরাধাৎ কৃতকশ্চ ভয়ানকো জ্ঞেয়ঃ।।[৫৩]

এখানে বিটের মেঘ বর্ণনায় য়ে ভয়ানক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রসঙ্গ চলে এসেছে, যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার উদ্ভব হয়েছে, তার দ্বারা এই প্রকরণের বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্যাঙ্গার্থের মধ্য দিয়ে চারুদত্ত ও বসন্তসেনার জীবনেও বিপর্যয় নেমে আসবে - এ তারই সূচনা।

চারুদত্ত মেঘের বর্ণনা করছেন —

এতৈঃ পিষ্টতমালবর্ণকনিভৈরালিপ্তমাম্ভোধরৈঃ
সংসক্তৈরুপবীজিতং সরভিভিঃ শীতৈঃ প্রদোষানিলৈঃ।
এষাম্ভোদসমাগমপ্রণয়িণী স্বছন্দমভ্যাগতা
রক্তা কান্তমিবাম্বরং প্রিয়তমা বিদ্যুৎসমালিঙ্গতি।।[৫৪]

মেঘেদের বর্ণ পিষ্টতমালপাতার মতো, সুরভি ও শীতল সান্ধ্য বায়ুতে তারা বীজিত। এই মেঘে আছন্ন অম্বরকে মেঘ সমাগমে প্রণয়িণীর মতো বিদ্যুৎ ইচ্ছামতো আলিঙ্গন করছে, প্রিয়তমা কান্তকে যেমন আলিঙ্গন করে তেমনি।

এর পরে দৃশ্যকাব্যে দেখা যায় - নায়িকা বসন্তসেনা রতিভাবের অভিনয় করে নায়ক চারুদত্তকে আলিঙ্গন করছে।

এখানে শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গ এসেছে।এখানে বিদ্যুৎকে প্রেমিকা রূপে কল্পনা করা হয়েছে। নায়ক মেঘের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য স্বেচ্ছায় এসেছে সে। পিষ্ট তমাল পাতার সমান বর্ণ, সন্ধ্যার শীতল বাতাসে শান্ত দেহে প্রিয়তম আকাশকে আলিঙ্গন করছে। *নাট্যশাস্ত্র*-তে ভাবব্যঞ্জকের আলোচনায় রোমাঞ্চের কথা বলা হয়েছে। পরিপূর্ণ আনন্দে এই রোমাঞ্চ দেখা যায়। বসন্তসেনার সাথে মিলন সেই পূর্ণ আনন্দের সঞ্চার করেছে চারুদত্তের চিত্তে। মেঘের গর্জন, বিদ্যুৎচমক সব তুচ্ছ হয়ে গেছে প্রিয়ার আলিঙ্গনে। চারুদত্তের কাছে প্রিয়াস্পর্শসুখ ছাড়া আর কিছু নেই। এটিই আলোচ্য শ্লোকের ব্যঞ্জনা বা ধ্বনি।

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্যটি বহু ঘটনার সমাবেশ, বহু চরিত্রের উপস্থাপনায় বর্ণময়। এই দৃশ্যকাব্য একদিকে যেমন তৎকালীন যুগের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তেমনি রস, রীতি, ধ্বনি প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রীয় তত্ত্বগুলির উপস্থিতিতে সহৃদয় পাঠকের কাছে আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। মৃচ্ছকটিক প্রকরণের প্রধান রস যেহেতু শৃঙ্গার, নায়ক চারুদত্ত ও নায়িকা বসন্তসেনার মিলনে সেই শৃঙ্গার রস উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও সহকারী রস রূপে ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রসের উপস্থাপন ঘটেছে। মৃচ্ছকটিকের শকারের মধ্যে হাস্যরসের উদ্রেক ঘটেছে। তার কথার মধ্যে নানান অসঙ্গতি এই হাস্যরস সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। মৃচ্ছকটিকম্ প্রকরণের অষ্টম অঙ্ক জুড়ে শকারের কথার মধ্য দিয়ে হাস্যরসের সঞ্চার ঘটেছে। দশাঙ্ক এই প্রকরণে সংস্কৃত অনান্য নাটকের মতো গতানুগতিকতা নেই, তাই এই দৃশ্যকাব্যটিকে the most shakespearian of all Sanskrit Plays বলে থাকেন সংস্কৃত পণ্ডিতসমাজ।[৫৫] ভাষা ও সাহিত্য প্রেমিকদের কাছে মৃচ্ছকটিক এক রত্নখনি। এই দৃশ্যকাব্যের নায়িকা বারবণিতা বসন্তসেনা প্রকোষ্ঠের প্রাচীর চিত্রে সুশোভিত, এমনকি বসন্তসেনা স্বয়ং একজন চিত্রকর, তাকে চারুদত্তের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে দেখা গেছে। সমাজে উচ্চবিত্তের মানুষের পাশাপাশি গণিকারা নানান কলায় পারদর্শী

ছিলেন। এই প্রকরণে একাধিকবার চারুকলার প্রসঙ্গ এসেছে। পাশাপাশি রস, রীতি, ধ্বনি - মৃচ্ছকটিক প্রকরণকে নাটকীয় উৎকর্ষতা বিধানে সহায়তা করেছে। এই তত্ত্বগুলির উপস্থিতি এই দৃশকাব্যকে কাব্যিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস,* ২০০৯, পৃ. ৩১৯।

২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ১.২.১১।

৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ৩.১.৪।

৪। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ২.২.৯।

৫। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ১.২.১৯।

৬। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, পৃ. ৫২।

৭। *নাট্যশাস্ত্র,* ১৭.১২১।

৮। *সাহিত্যদর্পণ,* ৮.৪।

৯। *কাব্যাদর্শ,* ১.৪১-৪২।

১০। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার,* ১৯৭৯, খণ্ড - ৭, পৃ. - ৪০০।

১১। *তদেব,* পৃ. ৪০১।

১২। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩য় খণ্ড, ৪৫.৩৮।

১৩। তত্রৈব, পৃ. ৪০৯।

১৪। সুরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (সম্পা.) : *নাট্যশাস্ত্র,* ১৯৯৭, পৃ. ১৬২।

১৫। *তদেব,* পৃ. ১৫১।

১৬। তত্রৈব।

১৭। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.২০।

১৮। *মৃচ্ছকটিকম্*, প্রথম অঙ্ক।

১৯। *মৃচ্ছকটিকম্*, দ্বিতীয় অঙ্ক।

২০। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.১৫।

২১। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৪৫।

২২। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৪৬।

২৩। *নাট্যশাস্ত্র*, ৬.৪৭।

২৪। *দশরূপক*, ৪.৪৮।

২৫। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.৬৭।

২৬। *নাট্যশাস্ত্র*, ৪.৪৫।

২৭। *নাট্যশাস্ত্র*, ৪.৫০।

২৮। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.২২২।

২৯। *সাহিত্যদর্পণ*, ৩.২৩৯।

৩০। *তু. যস্যাং বীজস্য বিন্যাসোঽভিধেয়স্য বস্তুনঃ।*
শ্লেষেন বা সমাসোক্ত্যা নান্দী পত্রাবলী তথা।।

— নাট্যদর্পণ, ১.২।

৩১। *মৃচ্ছকটিকম্*, ১.২।

৩২। *তু. শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীর ভয়ানকাঃ।*
বীভত্সাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতা।।

— নাট্যশাস্ত্র, ৬.১৫।

৩৩। *তু. তত্র শৃঙ্গারো নাম রতস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ যথাযত্কিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যং দর্শনীয় বা তচ্ছৃঙ্গারেণোপমীয়তে।*

— নাট্যশাস্ত্র, ৬.৪৫।

৩৪। *যন্নাটকে ময়োক্তং বস্তুশীররং রসাশ্রয়োপেতম্। তৎ প্রকরণেঽপি যোজং কেবলং মুৎপাদ্যবস্তু স্যাৎ।*

— নাট্যশাস্ত্র, ১৯.২১।

৩৫। *সাহিত্যদর্পণ,* ৩.৩২।

৩৬। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.১৭।

৩৭। *নাট্যশাস্ত্র,* ৭.২২।

৩৮। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৯।

৩৯। *নাট্যশাস্ত্র,* ৩৫.৮৪-৮৬।

৪০। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.২০।

৪১। *নাট্যশাস্ত্র,,* ৬.৪২।

৪২। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৯।

৪৩। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.২৭।

৪৪। *মেঘদূত,* পূর্বমেঘ - ৩৮।

৪৫। *নাট্যশাস্ত্র,* ২৩.৩৫।

৪৬। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৮।

৪৭। *মৃচ্ছকটিকম্,* ৫.২।

৪৮। *মৃচ্ছকটিকম্,* ৫.৩।

৪৯। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৮।

৫০। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কালীপদ ভট্টাচার্য (সম্পা.), *ধ্বন্যালোক ও লোচন,* ১৯৮৬, পৃ. ৩৪।

৫১। *মৃচ্ছকটিকম্,* ৫.২৭।

৫২। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৯।

৫৩। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৬৯।

৫৪। *নাট্যশাস্ত্র,* ৫.৪৬।

৫৫। গৌরীনাথ শাস্ত্রী (সম্পা.) : *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার,* ১৯৭৯, খণ্ড - ৭, পৃ. - ২৩৩।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারত-শিল্পের ইতিহাস

প্রাচীন ভারত শিল্পের ইতিহাস মূলতঃ প্রাচীন ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষেরই প্রতিরূপ। বিচিত্রদেশ ভারতের শিল্পকলাও বৈচিত্রময়। বৈচিত্রের মধ্যেও যেটি দৃষ্টি আর্কষণ করে - শিল্পকলার বিস্তৃতক্ষেত্র-স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও নানান কারুশিল্প বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হলেও একটি চিরন্তনী ভারতীয় রূপ কিন্তু অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের মতোই প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে। আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-শক-হুন-পাঠান-মোগল-এর এক দেহে বিলীন হওয়ার মতোই শিল্পক্ষেত্রে আসিরীয়-পারসিক-গ্রীক-রোমক শিল্প ভারতে প্রবেশ করেও স্বকীয় রূপবর্জন করে ভারতশিল্পের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। ভারত-ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই প্রত্নিদর্শনের মধ্যে নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীনতম ভারতীয় শিল্পনির্দশন বলতে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংকেতিক ও বিমূর্ত গুহাচিত্রগুলিকেই বুঝি। গুহাগাত্রে অঙ্কিত আদিম মানুষদের পশুশিকারের চিত্রগুলি[১] ভারতের মধ্যপ্রদেশের ভীমভেট্‌কা, বিন্ধ্যপর্বতমালা, মধ্যপ্রদেশের রায়গড়, উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর, উড়িষ্যার সুন্দরগড়,

চিত্রসংখ্যা : ১

রাজস্থানের জয়পুর, আরাবল্লী পাহাড়ের গুহাগুলিতে আবিষ্কৃত হয়েছে। বৈদিকযুগের পূর্বেও ভারতে যে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার প্রমাণ হরপ্পা ও

চিত্রসংখ্যা : ২

মহেঞ্জোদারো। ভারতীয় সভ্যতার পাশাপাশি তার শিল্পের ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছর ব্যাপী বিস্তৃত। সিন্ধুসভ্যতার প্রত্ননিদর্শনগুলি ভারতীয় শিল্পের প্রাচীনতম আকর। এই সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে প্রাপ্ত পোড়ামাটির নগ্ন মাতৃকামুর্তি, চুনাপাথর নির্মিত যোগীপুরুষের মূর্তি, ব্রোঞ্জ নির্মিত নৃত্যরতা নারীমূর্তি

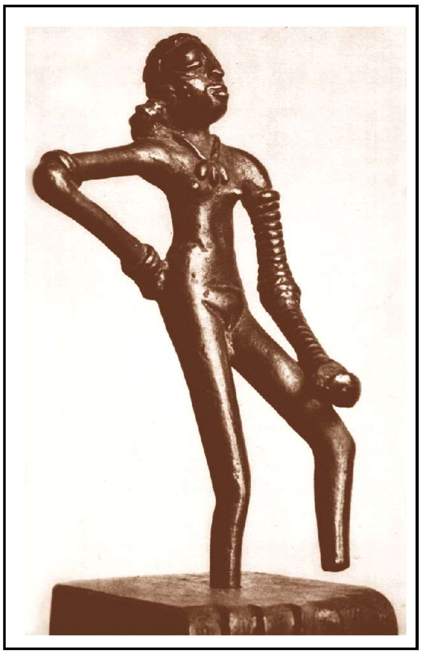

চিত্রসংখ্যা : ৩

এবং মানুষ জীবজন্তু ও উদ্ভিজ্জের চিত্রওয়ালা টেরাকোটার সীলমোহর[২] তার প্রমাণ। সিন্দুসভ্যতার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার শিল্পধারা লুপ্ত হয়নি, অন্তবর্তী জলধারার

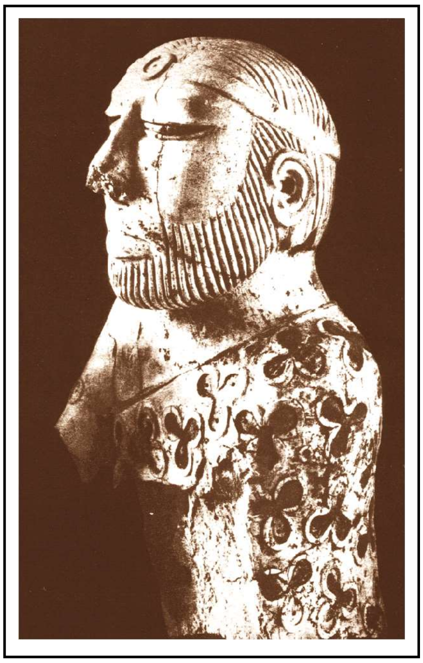

চিত্রসংখ্যা : ৪

মতোই তা বর্তমান ছিল এবং পরবর্তী যুগের শিল্পকলায় তার প্রকাশ স্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার আলোচনায় আর্য-অনার্যের বৈশিষ্ট্যটি শিল্পগত একটি পরিমণ্ডল তৈরী করে। আর্যরা ভারতবর্ষে বহিরাগত বলে অনুমেয়। অপরদিকে অনার্য বা দ্রাবিড়রা যে ভারতের নিজস্ব জাতিগোষ্ঠী তা ঐতিহাসিকরা দাবী করেন। আর্যরা

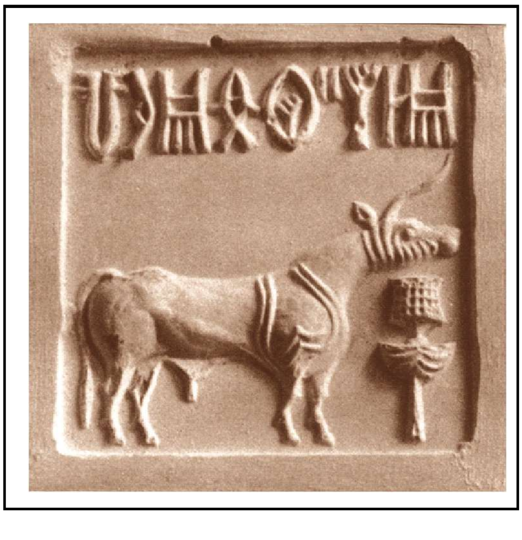

চিত্রসংখ্যা : ৫

ভারতে এসে দ্রাবিড়দের জয় করেন এবং তাদের সংস্কৃতি গ্রহণ করেন। এই দ্রাবিড় ও বৈদিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় শিল্পের উৎপত্তি। আর্য শিল্পধারা ছিল সাংকেতিক (symbolic), আলংকারিক ও বিমূর্ত (abstract)। অপরদিকে দ্রাবিড় শিল্প হল সাদৃশ্যাত্মক (representational)[৩]। আর্যদের মধ্যে যেহেতু মূর্তিপুজার প্রচলন ছিল না, তাই বৈদিকযুগের শিল্পনিদর্শনের মধ্যে আমরা ভাস্কর্যের নির্দশন পাই না। পরবর্তীকালে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পালযুগে উত্তরভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের প্রচলন হয়। উত্তর ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে দক্ষিণভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির বহুবিধ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিরভারতে ভাস্কর্যশিল্পের প্রভূত প্রসার ঘটেছিল, যার প্রমাণ প্রাচীন দক্ষিণভারতীয় শিল্প নিদর্শনগুলি। তবুও ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের সন্মেলনে ভারতশিল্পের চরম উৎকর্ষ ঘটে।

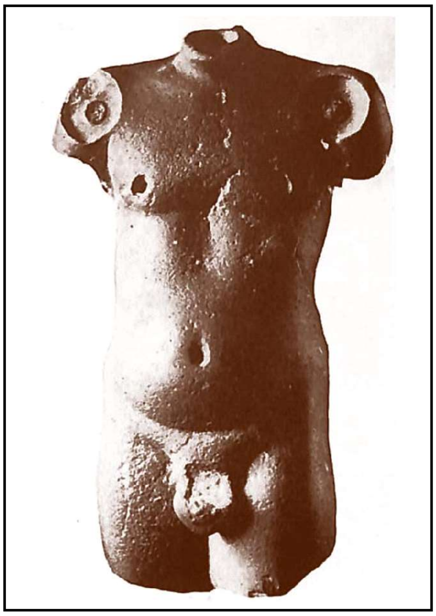

চিত্রসংখ্যা : ৬

ভারত ইতিহাসে ঐতিহাসিক যুগের শিল্প নিদর্শন বলতে মৌর্যযুগের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলাকে বোঝায়। এর পূর্বে যা কিছু সবই প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্পনিদর্শন। মগধরাজ শিশুনাগ ও নন্দবংশ থেকেই ভারতের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা।[৪] খ্রিস্টপূর্ব ৬৫০ থেকে ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসার রাজগৃহ স্থাপন করেন এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রু পাটলিপুত্র নগর স্থাপন

করেন। মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক এই রাজাদের শিল্পনিদর্শনের কথা বেদ ও জাতক আখ্যান থেকে পাওয়া যায়। জাতকে আঠারো প্রকার কারুশিল্পের উল্লেখ আছে।[৫] সূত্রধর, চিত্রকর, ধাতু-কর্মকার, চর্মকার প্রভৃতি আঠারো প্রকার উল্লেখ পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে এদের নিয়ে কারুগোষ্ঠী (craftman's guild) সংগঠিত হয়েছিল। শিশুনাগ-নন্দবংশ থেকেই ভারত শিল্পের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হলেও কোনও শিল্প-নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

মৌর্যযুগের শিল্পকলা ঃ

মৌর্যযুগে (৩২২-১৮৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভারতশিল্পের প্রভুত উন্নতি হয়েছিল[৬]। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নন্দ বংশের শেষ নৃপতিকে পরাভূত করে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রের অধিপতি হন। তাঁর পৌত্র সম্রাট অশোক (২৭২-২৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এই ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে প্রবর্তন করেন। তিনি আশি হাজার স্তুপ ও অসংখ্য বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সম্রাট অশোকের শাসনকালে মৌর্যযুগে রাজসভার শিল্পের (Court Art) জন্ম হয়। শিল্পীরা রাজানুগ্রহে শিল্প সৃষ্টি করতে শুরু করেন।

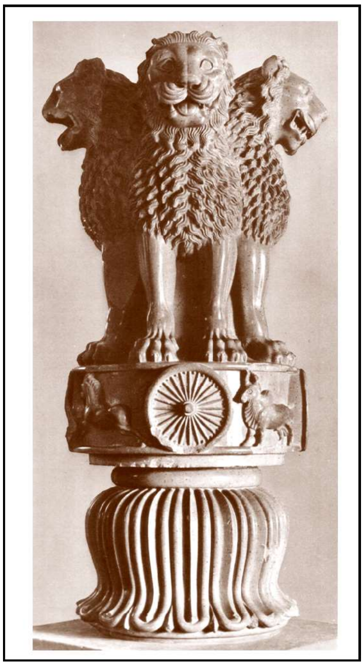

চিত্রসংখ্যা : ৭

মৌর্যযুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল যক্ষিণীমূর্তি [এটি বেসনগরে (বিদিশা) প্রাপ্ত, উচ্চতা ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী, কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত।] অপর নিদর্শন হল যক্ষের মূর্তি [এটি পারখামে প্রাপ্ত, উচ্চতা ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতাব্দী।] মূর্তিদুটির শিল্পরীতিগত বৈশিষ্ট হল - মূর্তি দুটি সোজা দণ্ডায়মান, দৃষ্টি সম্মুখবর্তী (frontality), স্বাভাবিক; যক্ষের স্ফীতোদর, যক্ষ-যক্ষিণী উভয়েই ধুতি পরিহিত, কোঁচাযুক্ত, কোমরবন্ধনীযুক্ত এবং যক্ষের বক্ষের নীচের অংশ কোমরবন্ধনীযুক্ত কিন্তু উত্তরীয় নেই। কোমর ও বক্ষের বন্ধনী উত্তরীয় বা চাদরকে ভাঁজ করে দড়ির মতো করা হয়েছে, দড়ির ফাঁস বক্ষ থেকে ঝুলছে। এটি একটি বিশেষ রীতি, যা পরবর্তী মথুরাযুগে বা গুপ্তভাস্কর্যেও কোমরে পাকানো চাদরের কোমরবন্দনী দেখা যায়, যার একদিকে দীর্ঘ ফাঁস ঝোলানো। এই সব কোমরবন্ধনী খুবই শৌখিনতার পরিচায়ক। মৌর্যযুগের ভাস্কর্যের অপর বিশেষত্ব হল - এই যুগের মূর্তির বস্ত্র (ড্রেপারি) শরীর থেকে পৃথক। কিন্তু পরবর্তী মথুরা ও গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যে বস্ত্র দেহের সঙ্গে লেগে আছে, বস্ত্রের ভিতর দিয়ে শরীরের গঠন

চিত্রসংখ্যা : ৮

বোঝানো হয়েছে, কোনো সময় বস্ত্র একেবারে স্বচ্ছ, শরীরের উপর কয়েকটা রেখা টেনে বস্ত্রের অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে। যক্ষ-যক্ষিণীর মূর্তির গলায় প্রচুর গহনা আছে। মৌর্যযুগের মূর্তি দুটি মনুমেন্টাল, বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যপূর্ণ এবং শক্তিশালী। যদিও মৌর্যপরবর্তী গুপ্তযুগে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, তা ভাবোদ্দীপক।

মৌর্যযুগের অপর শিল্পনিদর্শন হল - দিদারগঞ্জে প্রাপ্ত চামর-ধারিণীর মূর্তি। (পাটনা জাদুঘরে রক্ষিত, মসৃণ, চুনার বেলে পাথরে তৈরী, মনুমেন্টাল, উচ্চতা ১২ ফুট)। মৌর্যযুগের যক্ষ ও যক্ষিণী মূর্তির সঙ্গে এর তুলনা চলে। এই মূর্তি ভাস্কর্য দেখে মনে হয় মৌর্যশিল্পে মহেঞ্জোদারোর ধারা বা শিল্পরীতি রক্ষা করে আসছে।[৭]

মৌর্যযুগের ভাস্কর্য নিদর্শন বেসনগরে প্রাপ্ত কল্পবৃক্ষ (কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত, উচ্চতা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি)। এই বোধিবৃক্ষ (অশ্বত্থবৃক্ষ) কল্পবৃক্ষরূপে পরিকল্পিত এবং এটি প্রাচুর্য দান করে। এর নীচে রেলিং দেওয়া ও চতুষ্কোন বেদিকার উপর স্থাপিত।

চিত্রসংখ্যা : ৯

মৌর্যশিল্প নিদর্শনের মধ্যে অন্যতম হল সম্রাট অশোকের স্তম্ভগুলি। এই যুগের শিল্পের বিশেষত্ব হল তা লাট বা স্তম্ভে প্রকটিত। দুটি স্তম্ভে খরোষ্ঠী অক্ষর খোদিত, অন্যগুলিতে ব্রাহ্মী অক্ষর খোদিত। অশোকের সারনাথ স্তম্ভ হল সর্বশ্রেষ্ঠ। বারাণসীতে

যেখানে বুদ্ধ প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, সম্রাট অশোক সেখানে এই স্তম্ভ স্থাপন করেন। স্তম্ভটির বিশেষত্ব এইরূপ : এই স্তম্ভের উপর চারটি সিংহ উপবিষ্ঠ; সিংহের নীচে ধর্মচক্র, হাতি, ঘোড়া এবং সিংহ রিলিফে খোদাই করা যা ঘন্টাকৃতি উল্টোনো

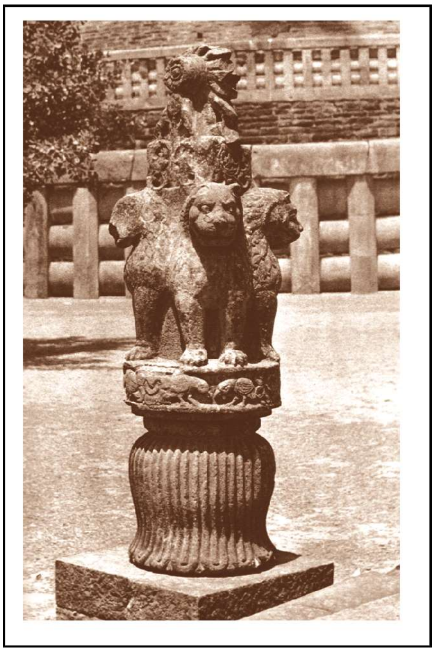

চিত্রসংখ্যা : ১০

পদ্মের উপর স্থাপিত। অনুমেয় এই শিল্পরীতি এসেছে সুদুর পারসিপোলিস থেকে। মূর্তিতে উচ্চাঙ্গের পালিশ এই শিল্প পরিকল্পনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সিংহ স্তম্ভের মতোই ষাঁড়, ঘোড়া ও চক্রের দৃষ্টান্ত মেলে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ষাঁড় খুব স্বাভাবিক আকৃতির, এর অ্যানাটমি খুব নিপুণতার সঙ্গে দেখানো হয়েছে (যা বর্তমানে কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত।)

ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী ধৌলি নামক স্থানে পাহাড়ের গায়ে অশোকের যে অভিলেখ আছে, সেখানে একটা হাতির শুঁড় খোদিত আছে (২৫৭ খৃষ্টপূর্বাব্দ)।

এছাড়াও সারনাথে কতকগুলি ভগ্ন মস্তক পাওয়া গেছে, যা মৌর্য অথবা মৌর্যপরবর্তী সুঙ্গযুগের প্রথমভাগের নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। এগুলি দাতাদের প্রতিকৃতি বলে অনুমিত। মূর্তিগুলির মাথায় নানাপ্রকার উষ্ণীষ লক্ষনীয়।

মূলতঃ সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মপ্রচারকদের ভারতের নানা স্থানে এবং সিংহলে, পশ্চিমে সিরিয়ায় ও মিশরে প্রেরণ করেন তাই নানান স্থানের শিল্পরীতি মৌর্যশিল্পের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাদের প্রভাব তাই এই যুগের ভাস্কর্যমূর্তিতে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়।

সম্রাট অশোকের রাজত্ব আফগানিস্থান ও কাশ্মীর থেকে আরম্ভ করে সমগ্র উত্তর ভারতে বিস্তৃত ছিল; দক্ষিণের সীমা দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত, তার পরবর্তী সুদূর দক্ষিণ শুধু এই রাজত্বের বাইরে ছিল। সম্রাট অশোক সহ মৌর্যযুগের ভারতীয় সভ্যতার বিবরণ মেগাস্থিনিসের ভারতভ্রমণ থেকে জানা যায়। ভারতে যে সাতটি শ্রেণীর মানুষের বাস ছিল, তাদের মধ্যে শিল্পী গোষ্ঠী হল অন্যতম।[৮] এছাড়াও জাতকের কাহিনী এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে যে সব বিবরণ পাওয়া গেছে — গ্রামে কারুশিল্পীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; চিত্রকর, স্বর্ণকার, কুম্ভকার প্রভৃতি এবং উচ্চশ্রেণীর কারিগরেরা কর্মকার নামে পরিচিত ছিল।[৯] সম্রাট অশোকের সময় থেকেই মূর্তি ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য পাথরের ব্যবহার শুরু হয় তৎকালীন শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল পাথরের উপর বিশেষপ্রকার পালিশ যা তৎকালীন স্তম্ভগুলিতে এই উচ্চশ্রেণীর পালিশ দেখা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পারস্যের সঙ্গে আর্য-ভারতের যোগাযোগ হয়। এর ফলে শিল্পসামগ্রীতে এর প্রভাব পড়ে। অশোকের স্তম্ভশীর্ষ (ক্যাপিটাল), প্রাসাদ, টেরাকোটা, সীলমোহর এবং মুদ্রায় অগ্নির প্রতীক, ছুঁচোলো টুপি প্রভৃতি দেখে মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসকে ‘জরথুশত্র যুগের ভারতের ইতিহাস’ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।[১০] এমনকি বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার উপর অগ্নি উপাসকদের প্রভাব পড়েছে, তাই বুদ্ধ, শিব এবং রাজার মূর্তিতে ‘কাঁধ থেকে আগুন বের হচ্ছে’ এমন একটি বৈশিষ্ট্য মৌর্যশিল্পে দেখা যায়।

মৌর্যযুগের শিল্পকলার যেসব নিদর্শন পাওয়া যায়, তা সবই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য। চিত্রশিল্প কিছু পাওয়া যায় না, তবে নিশ্চয়ই তৎকালীন সমাজে চিত্রশিল্পের প্রচলন ছিল, যা কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

মৌর্যযুগের ভাস্কর্যরীতির বৈশিষ্ট্যই হল মূর্তির সূক্ষ্ম ও নিপুণতাযুক্ত দেহগঠন অর্থাৎ অ্যানাটমি সুস্পষ্ট। এই সময়েই প্রথম মসৃণতাযুক্ত পাথরের পালিশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনুমেয় ইরানের ভাস্কর্যরীতি এই সময় ভারতীয় ভাস্কর্যকে প্রভাবিত করেছিল। মনে হয় প্রাচীন পারসিপোলিশ থেকে আগত এই রীতি ভারতীয় ভাস্কর্যকে বিশেষ মসৃণতা দান করেছিল। মৌর্যশাসনে ইরানীয় শিল্পকলার প্রভাবের ফল এটি। ইরানের অ্যাকামেনীয় শাসক দারায়ুসের ভারত আক্রমণের ফলে মৌর্যসাম্রাজ্যের কিছু অংশ ইরান সম্রাটের অধীনে ছিল। মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' থেকে জানা যায় চন্দ্রগুপ্তের কাঠের প্রাসাদ ইরানের রাজপ্রাসাদের মতো সুন্দর ছিল।[১১] ইরানের ভাস্কর্যরীতি যে ভারতীয় ভাস্কর্যকে প্রভাবিত করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এছাড়াও মৌর্য শিল্পকলার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল গ্রীক শিল্পরীতি।[১২] গ্রীক শিল্পরীতি ভারতীয় ভাস্কর্যকে আরও উন্নত করেছিল। মৌর্য শাসনকাল ভারতের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই সময় গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন ও সুবিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে গ্রীকদের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং গ্রীকদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন মৌর্যসম্রাটগণ। এর ফলে পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। মৌর্যপরবর্তী শাসকগণ গ্রীকদের সঙ্গে অবিছিন্ন সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। এই সময়েই গ্রীক শিল্পীরা তাদের শিল্পরীতি দ্বারা মৌর্যশিল্পকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছিল। ফলে ভারতীয় ভাস্কর্যের মধ্যে অ্যানাটমির দ্বারা গ্রীক ভাস্কর্যরীতির মতো খুবই বলিষ্ঠ দেহগঠন মৌর্যভাস্কর্যগুলিতে দেখা যায়, যা মৌর্য শিল্পরীতির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ভারত ও গ্রীসের মধ্যে এই প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলস্বরূপ গ্রীক ভাস্কর্যরীতির প্রভাবে পরবর্তীকালে ভারতে 'গান্ধার শিল্পরীতির' জন্ম নেয়।[১৩] ফা-হিয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় - সম্রাট অশোকের প্রাসাদ গ্রীক স্থাপত্যের মতো বিশাল পাথর নির্মিত স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

মৌর্যশিল্পকলায় ধর্মীয়প্রভাব এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সমাজে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ধর্ম পাশাপাশি অবস্থান করতো, যা তৎকালীন রাজাদের পরধর্মসহিষ্ণুতার

ফল বলা যেতে পারে, ফলতঃ এই সময়ের ভাস্কর্য মূর্তি ও স্থাপত্য শিল্প ঐসব ধর্মের প্রতীক বা দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে।

সর্বোপরি শিল্পীরা যেহেতু রাজতান্ত্রিক শাসনের ছত্রছায়ায় ও রাজপৃষ্ঠপোষকতায় শিল্প সৃষ্টি করতেন, তাই মৌর্যযুগের শিল্পরীতিতে তার প্রভাবও সুস্পষ্ট।

মৌর্যশাসনব্যবস্থার অন্তিমপর্যায়ে সুঙ্গরাজবংশের প্রতিষ্ঠার প্রাক্‌পর্বে ভারতে একাধিক বিদেশী জাতির আগমণ ঘটে — গ্রীক, রোমান, ইরানীয়দের পাশাপাশি শক, কুষাণ, বাহ্লিক বা ব্যাকট্রিয়, পহ্লব বা পার্থিয়ানরা ভারতীয় ভূখণ্ডে নিজেদের অধিকার স্থাপন করে। এর ফলস্বরূপ ভারতীয় শিল্পরীতি একাধিক বর্হিভারতীয় শিল্পরীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। মৌর্যশাসনের অন্তিমপর্ব থেকে শুরু করে কুষাণ সাম্রাজ্যের সূচনা পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পরীতিতে একাধিক প্রভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণেই দেশীয় শিল্পী ও বর্হিভারতীয় শিল্পীদের সম্মিলিত কীর্তিই ভারতশিল্পে প্রকাশিত। এসব সত্ত্বেও ভারতীয় ভাস্কর্যকে পৃথক করে চেনা যায়, কারণ বহু পূর্ব থেকেই ভারতীয় শিল্পরীতিতে দেশীয় পরম্পরাই বর্তমান।[১৪]

সুঙ্গযুগ (সুঙ্গ, অন্ধ্র ইন্দো-পার্থিয়ান অথবা ক্ষত্রপযুগ) -এর শিল্পকলা ঃ

১৮৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্যসাম্রাজ্যের ধ্বংশের পরে পুষ্যমিত্র সুঙ্গ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি যেহেতু গোঁড়া হিন্দু ছিলেন তাই বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করে বিহারগুলি ধ্বংস করেন। ১৫৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রীক আক্রমণকারী মেনান্ডারকে (পালি-মিলিন্দ) পরাজিত করে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন এই পুষ্যমিত্র। বিখ্যাত বৌদ্ধদর্শনগ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হ' থেকে জানা যায় - মেনান্ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধাচার্য নাগসেনের নিকট বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সুঙ্গযুগে একাধিক স্তূপ, চৈত্য ও বৌদ্ধবিহার স্থাপিত হয়। ইতিহাসগতভাবে, সুঙ্গদের পরে কান্ববংশ রাজত্ব করে প্রায় পঁযতাল্লিশ বছর (খ্রিস্টপূর্ব ৭২ - খ্রিস্টপূর্ব ২৭)। মথুরা ও পাঞ্জাবে এই সময় শকেরা খুবই পরাক্রমশালী ছিলেন, এরাই ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপ উপাধি ধারণ করেছিলেন। সূদুর দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা অন্ধ্ররা ছিলেন খুবই পরাক্রমশালী,

কৃষ্ণা-গোদাবরী প্রদেশে এরা নগর স্থাপন করেছিলেন। তাদের রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল নাসিক এবং উজ্জয়িনী পর্যন্ত। প্রায় সাড়ে চার শতাব্দী অন্ধ্রদের রাজত্ব শেষে ২৩৬ খ্রিস্টাব্দে এর অবসান হয় এবং সূচনা হয় পল্লব রাজত্বের। অন্ধ্ররাজারা হিন্দু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বহু বৌদ্ধ মন্দির ও বিহার তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। পশ্চিমঘাটের অধিকাংশ গুহামন্দির ও বিহার তাঁরা নির্মাণ করেছিলেন। বিখ্যাত অমরাবতী স্তূপ ও সাঁচীর তোরণ অন্ধ্ররা নির্মাণ করেছিলেন।[১৫]

ঠিক এরকম সময়ে পূর্বভারতে সম্রাট অশোকের সময় পরাজিত হওয়া কলিঙ্গরা স্বাধীন হয়। জৈন ধর্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ খারবেল ১৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সুঙ্গ রাজধানী পাটলীপুত্র জয় করেন।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে বহু গুহামন্দির নির্মিত হয়। এই গুহামন্দিরগুলি ছাড়া প্রাচীনকালের স্থাপত্যের নিদর্শন বিশেষ কিছুই নেই। প্রাচীন সাহিত্য ও অনান্য ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন স্থাপত্য নির্মিত হয়েছিল কাঠের দ্বারা, তার সবই প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এই দারুনির্মিত রেলিং-এর ন্যায় স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায় গুহামন্দিরে, স্তূপের রেলিঙে।

প্রাচীন গুহামন্দিরগুলির বিবরণ :

মৌর্যশাসনাধীনে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর বুদ্ধগয়ার নিকট প্রাচীনতম গুহা হল – 'লোমশ ঋষি-গুহা'। এই গুহার সম্মুখভাগের স্থাপত্যে কাঠের অনুকরণ আছে। এই গুহা আজীবক সাধুদের জন্য সম্রাট অশোক নির্মাণ করেছিলেন। গুহার ভেতরের দেওয়ালে বজ্রলেপ আছে যা শঙ্খচূর্ণ, শ্বেতপাথরচূর্ণ ও চুনের প্রলেপ দ্বারা নির্মিত। কঠিন পাথরে খোদিত ও কাচের মতো মসৃণ দেওয়াল বিশিষ্ট আরও কয়েকটি মৌর্যযুগের গুহা বুদ্ধগয়ায় অবস্থিত।

সুঙ্গযুগে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে নির্মিত পশ্চিমঘাট পর্বতে পুনার নিকট অবস্থিত 'ভাজা বিহার'। এই গুহাগাত্রের ভাস্কর্য প্রাচীনতম। গুহাগাত্রে ভাস্কর্য নমুনা এইরূপ : চারটি ঘোড়াযুক্ত রথে রাজার গমনদৃশ্য, সঙ্গে চামর ও ছত্রধৃত দুই রমণী। এই গুহাভাস্কর্যের বিশেষত্ব হল - অশ্বারোহী মূর্তিতে আছে পায়ে পা-দান, যা পৃথিবীর প্রাচীনতম পা-দানের নমুনা বলা যেতে পারে। বিরাট আকৃতির কুৎসিত নগ্ন রমণীমুর্তি এই রথকে পিঠে বহন করে নিয়ে চলেছে, রমণীর মুখ নীচের দিকে, মনে হয় যেন বাতাসে ভেসে চলেছে। এই দৃশ্য সূর্যের দুই স্ত্রীর বলে অনুমেয়, যারা সূর্যের সঙ্গে অন্ধকার দূর করে চলেছে।[১৬]

ভাজাগুহার অপর বৃহৎমূর্তি হল - পতাকাবাহী এক সঙ্গীর সাথে রাজার হস্তি গমনের দৃশ্য। প্রকাণ্ড হাতির মুর্তি ইন্দ্রের ঐরাবতে আরোহনের ন্যায়, মূর্তির পশ্চাৎভাগে স্থানচিত্র দেখা যায়; হাতিটি শুঁড়ে ওপড়ানো গাছ ধরে আছে, পশ্চাদ্‌ভাগের তুলনায় হাতি ও তার বাহনকে খুব বড়ো করে দেখানো হয়েছে। এখানে বজ্র হস্তধৃত ইন্দ্র বৃষ্টির দেবতা। বেদের বর্ণনা অনুসারে এই মুর্তি উৎকীর্ণ হয়েছে।[১৭] বৌদ্ধ বিহারে অ-বৌদ্ধ বিষয়ের অবতারণা লক্ষ্য করার মতো। এটি ভারতের প্রাচীনতম স্থানচিত্রের (Landscape Painting) নমুনা বলা যেতে পারে। চাক্ষুস পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষণ এখানে নেই, হরাইজন বা দিঙ্‌মণ্ডল এখানে নেই। এই গুহাভাস্কর্য দেখে এই সিধান্তে আসা যায় যে, ভাজার ভাস্কর্য থেকে সাঁচির ভাস্কর্যের পরিণতি। সাঁচি কেবল রিয়ালিজম ও মডেলিং এর দিকে ঝুঁকেছে এবং নর-নারীর গঠন ও পারিপাট্যের দিকে নজর দিয়েছে।

এই সময় বহু চৈত্য নির্মিত হয়েছিল, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিহারের নিকট অবস্থিত ভাজার চৈত্য, পুনার নিকটবর্তী মানমোদা চৈত্য (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক), নাসিক চৈত্য (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক), অন্ধ্রে অবস্থিত কার্লি চৈত্য (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক), বেদশা চৈত্য (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫), উড়িষ্যার উদয়গিরি-খণ্ডগিরি (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতক) প্রভৃতি। এদের মধ্যে কার্লির চৈত্য হল প্রাচীন গুহামন্দিরের মধ্যে বিশালতম এবং প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রাচীন স্তূপের বিবরণ ঃ

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শন হল বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধশিল্পের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্তূপগুলি। প্রাক্-বৌদ্ধযুগে নির্মিত এই স্তূপগুলি মূলতঃ বুদ্ধের কোনো চিহ্নকে রক্ষা করার জন্যই নির্মিত হয়। ভারতে ও এশিয়ার নানা স্থানে বৌদ্ধধর্মের প্রতীকরূপে স্তূপ নির্মিত হয়েছে। শিল্প নিদর্শনরূপে দ্রষ্টব্য স্তূপ নির্মিত হয়েছে। শিল্প নিদর্শনরূপে দ্রষ্টব্য স্তূপের মধ্যে ভারহুত, সাঁচী ও অমরাবতী স্তূপ প্রসিদ্ধ। গুহাচৈত্যের মধ্যে মনোলিথিক স্তূপ দেখা যায়। স্তূপের রেলিং-এর ভাস্কর্য প্রাক্-গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের নিদর্শন।

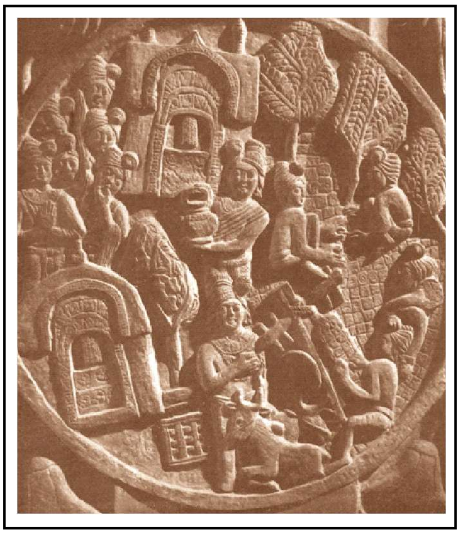

চিত্রসংখ্যা : ১১

চিত্রসংখ্যা : ১২

ভারহুত স্তূপ :

মধ্যভারতের এলাহাবাদ এবং জব্বলপুরের মধ্যে অবস্থিত, সুঙ্গ আমলে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নির্মিত ভারহুত স্তূপ মূলতঃ ইঁটের তৈরী। কলকাতা

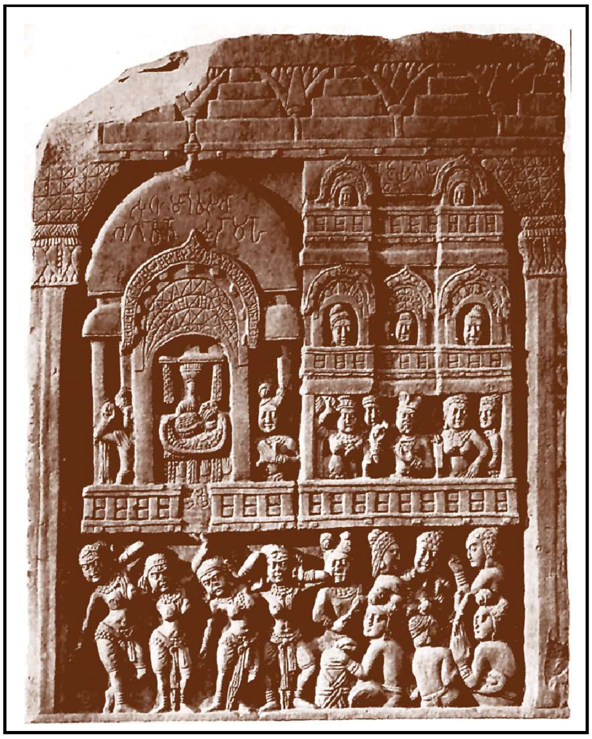

চিত্রসংখ্যা : ১৩

জাদুঘরে রক্ষিত ভারহুত রেলিং ও তোরণে যক্ষ, যক্ষিণী, নাগরাজ, দেবতা, জাতক ও বুদ্ধের জীবনের ঘটনা খোদিত আছে। এখানে বেস্‌স্‌ণ্ডর জাতকের কাহিনীই প্রধানরূপে চিত্রিত।[১৮] এছাড়াও ফুল লতাপাতা (floriated design) এবং জন্তু-জানোয়ারের আলংকারিক চিত্র আছে। মূলতঃ বুদ্ধকে এখানে প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়েছে, তাই বুদ্ধের কোনো মূর্তি এখানে নেই। চৈত্যবৃক্ষ (বোধিবৃক্ষ), ছত্র, ধর্মচক্র, পদচিহ্ন দ্বারা বুদ্ধের উপস্থিতি সূচিত হয়েছে। ভারহুতের স্তূপ-ভাস্কর্যের মধ্যে দেখা যায় একটি মইয়ের দু-দিকে এবং নীচে প্রার্থনারত জনতা। মইয়ের সর্বোচ্চ ধাপে একটি পায়ের ছাপ এবং সর্বনিম্নধাপে একটি পায়ের ছাপ; এর অর্থ বুদ্ধ তেত্রিশ দেবতার স্বর্গ থেকে নামছেন।

ভারহুত স্তূপ রিলিফে বোধিবৃক্ষের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধ উপস্থিত নেই কিন্তু বোধিসত্ত্বকে (ভবিষ্যৎ বুদ্ধ) সশরীরে উপস্থিত করা হয়েছে।

কখনো বা বুদ্ধের জন্মের কাহিনী সূচিত হয়েছে মায়াদেবীর চিত্র দ্বারা। একটি রিলিফে মায়াদেবী পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, হাতি শুঁড়ে কলসী নিয়ে জল ঢালছে। যদিও পরবর্তী যুগে এটি বৌদ্ধ ভাস্কর্য থেকে লোপ পায় এবং এই চিত্র হিন্দুশিল্পে শ্রী বা লক্ষীরূপে উদিত হন।

চিত্রসংখ্যা : ১৪

ভারহুত স্তূপ ভাস্কর্যের বিশেষত্ব হল - সব মূর্তির চেহারা প্রায় এক রকম। কোনোটা গোল, কোনোটা চ্যাপ্টা, কোনোটা বা ডিম্বাকৃতি। সবমূর্তিই চোখ সম্পূর্ণ খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কিন্তু চোখে কোনো তারকা নেই। ভারহুতের সঙ্গে পরবর্তী গুপ্ত ভাস্কর্যের পার্থক্য হল গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের চক্ষু অর্ধনিমীলিত। ভারহুত স্তূপের রেলিং-এর বৈশিষ্ট্য যা পূর্ববর্তী বুদ্ধগয়ার রেলিং-এর (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) অনুরূপ। ভারহুতের রেলিং-এর গায়ে একপ্রকার মন্দির খোদিত

দেখা যায়, এটি বোধিবৃক্ষ ঘিরে আছে, ভারহুতের এই নিদর্শন পরবর্তী সাঁচী, মথুরা ও অমরাবতীতে স্তূপেও দেখা যায়।

ভারহুত শিল্পরীতির অপর বৈশিষ্ট্য হল - রিলিফগুলির পার্সপেকটিভ বা পরিপ্রেক্ষণ, যা নগ্ন চোখে দেখার বিষয় নয়, এটি সম্পূর্ণ মানসিক পরিপ্রেক্ষণ। কোনো একটি কাহিনীকে ব্যক্ত করার জন্যই মানুষগুলিকে ক্ষেত্রের উপর সাজানো হয়েছে, এর মধ্যে আলংকারিক পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী একটা মানুষের ওপর আর একটা মানুষকে স্থান দিতে সংকুচিত হননি। এতে কাহিনী ব্যক্ত করার একটা চেষ্টা দেখা যায় যেখানে সত্যিই যদি পার্সপেকটিভ ব্যবহার করা হোত, তাহলে ঐ চিত্রগুলি তেমন সুস্পষ্ট হতো না। এছাড়া পাথরের ভাস্কর্যে চিত্রসুলভ পার্সপেকটিভ দেখানোর কাজটি শিল্পীদের কাছেও যুক্তিযুক্ত নয়।

ভারহুতের চিত্র থেকে সে যুগের মানুষের জীবনযাত্রা, সে যুগের ঘরবাড়ি, অলংকার, পোষাক-পরিচ্ছদের একটা ধারণা পাওয়া যায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় সে যুগের নারী-পুরুষ উভয়ের পোষাক একই। কাছা কোঁচা দিয়ে কাপড় পরিহিত, উত্তরীয় দ্বারা আবৃত, মেয়েদের লম্বা বেণী ও খোঁপা বর্তমান। যক্ষিণীর মূর্তির ক্ষেত্রে মাথার ওপর থেকে একটি চাদর পিঠের ওপর ঝুলছে, গলায় হাতে পায়ে গহনার আধিক্য, গহনাগুলি খুব মোটা মোটা ও ভারী। কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত ও পাল যুগের শিল্পে গহনা সূক্ষ্মরূপে দেখা যায়। যক্ষ বা কুবের মূর্তিতে চাদর ভাঁজ করে বাম কাঁধের ওপর দিয়ে ডান হাতের তলা দিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী মথুরা মূর্তিতে এমনকি পূর্ববর্তী মৌর্যমূর্তিতে চাদরকে গুটিয়ে দড়ির মতো করার রীতি ছিল। এর থেকে অনুধাবন করা যায় এক একটি বিশেষ রীতি এক এক যুগের ভাস্কর্যে বিরাজমান ছিল।

ভারহুত চিত্র-ভাস্কর্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা দেখে ভারহুত শিল্পরীতিকে চিহ্নিত করা যায়, তা হল দেবতা, রাজা, জনসাধারণ - সবার মাথায় পাগড়ি আছে। পরবর্তী যুগে দেবতা ও রাজার মাথায় একমাত্র মুকুট দেখা যায়। কিন্তু ভারহুতে কোথাও মুকুটের ব্যবহার নেই। পাগড়ির আকার বড়ো, কারণ পুরুষদের মাথায় মেয়েদের

মতো লম্বা চুল থাকতো, তা বিরাট পাগড়িতে ঢাকা থাকতো, অনেকসময় পাগড়ির কাপড়ের ভাঁজের মধ্য দিয়ে চুল বাইরে বেরিয়ে আছে - এমন দৃশ্য দেখা গেছে। ভারহুতে চিত্র-ভাস্কর্যে স্থাপত্যশিল্পের নমুনা দেখা যায়, যা থেকে তৎকালীন সমাজের ঘরবাড়ীর ধারণাটি স্পষ্ট হয়। স্থাপত্যে দেখা যায় ব্যারেল বা পিলার আকারে ছাদ, চৈত্য জানালা, যেখানে একাধিক তলা, বারান্দা থেকে নর-নারী দাঁড়িয়ে দেখছেন।

ভারহুত রিলিফে যে জন্তু-জানোয়ারের চিত্র দেখা যায়, তা থেকে মনে হয় শিল্পীরা এই বিষয়ে খুবই পারদর্শী ছিলেন। ভারহুত রিলিফ বিষয়ে ফার্গুসন সাহেব বিবৃতি দিয়েছেন — Some animals such as elaphants, deer, monkeys are better representated there than in any sculpture known in any part of the world; so too are some trees and the architectural details are cut with an elegance and precision that are very admirable. The human figures, too, though very different from our standard of beauty and grace, are truthful, to nature and where grouped together, combine to express the action intended with singular facility. For an honest purpose - like Raphaelite kind of art, there is probably nothing much better to be found elsewhere.[১৯]

ভারহুতের ভাস্কর্যের সৌন্দর্য প্রসঙ্গে বলা যায় primitive native simplicity অর্থাৎ আদিম অকপট সরলতা।

সাঁচি স্তূপ :

বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের অন্যতম শিল্প নিদর্শন হল সাঁচি স্তূপ। প্রাচীন মালব রাজ্যের রাজধানী বিদিশার (বেসনগর) নিকটে এটি অবস্থিত ছিল (বর্তমানে ভূপাল রাজ্যে অবস্থিত)। সাঁচি স্তূপের-সুঙ্গযুগে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক) স্তূপ ও রেলিং নির্মাণ হলেও, তোরণ নির্মিত হয়েছে অন্ধ্রযুগে (খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক)। সাঁচি ভাস্কর্য

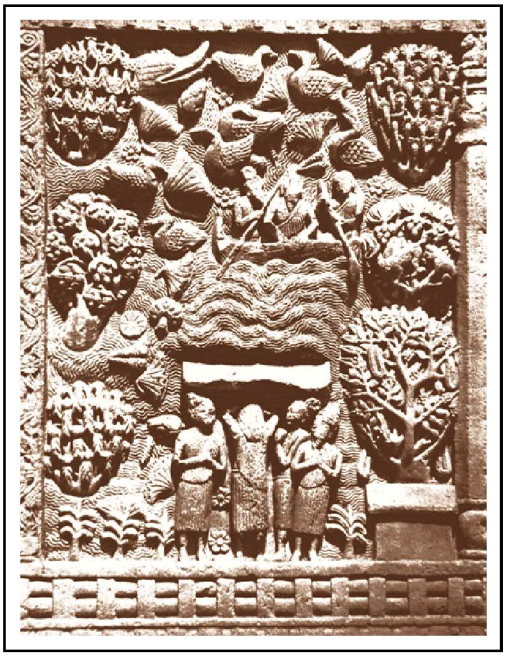

চিত্রসংখ্যা : ১৫

ভারহুতের সমপর্যায়ভুক্ত। এখানেও ভগবান বুদ্ধের প্রত্যক্ষ মূর্তির দেখা মেলে না, প্রতীক দ্বারা তাঁর উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে। স্তূপের তোরণে জাতকের কাহিনীর দ্বারা story telling quality বা কাহিনী ব্যক্ত করার অপূর্ব চেষ্টা দেখা যায়।

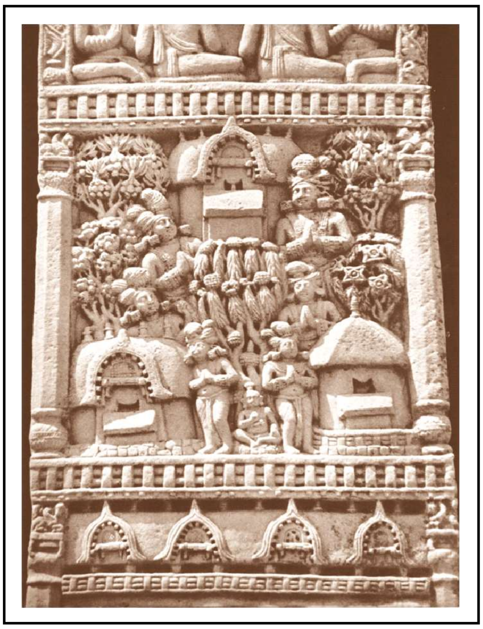

চিত্রসংখ্যা : ১৬

তোরণদ্বারের ওপর পার্শ্বে বৃক্ষ অবলম্বন করে দাঁড়ানো নগ্ন রমণী মূর্তি যাকে

রমণী যক্ষিণী বা 'বৃক্ষকা' (বৃক্ষের দেবতা) বলা হয়, সেটির অপূর্ব দেহসুষমা লক্ষ্য করা যায়। লীলায়িত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান এক মোহিনীমূর্তি। ভূমিদেবীর পূজার আর্দশ

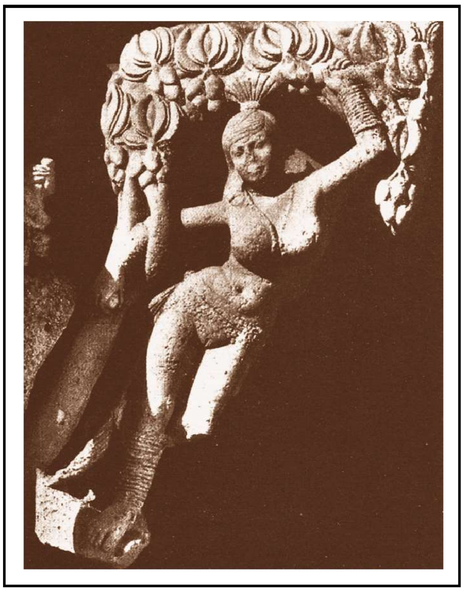

চিত্রসংখ্যা : ১৭

থেকেই এই মূর্তির সৃষ্টি হয়েছে। শিল্প সমালোচকদের মতে এটি উর্বরতার প্রতীক। এই অর্ধনগ্ন মূর্তির আদর্শে আরও বহুমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যে আছে রমণীর পদাঘাতে অশোকফুল ফুটে ওঠে।[২০] মায়াদেবী শালবৃক্ষ অবলম্বন করে থাকাকালীন বুদ্ধের জন্ম হয় - এই সংস্কার থেকে উর্বরতার প্রতীক বলা হয় এই ভাস্কর্যমূর্তিকে। সাঁচিতে নগ্নমূর্তি থাকলেও ভারহুতে কিন্তু কোনো নগ্ন মূর্তির দেখা মেলে না।

এছাড়াও সাঁচির স্তম্ভগাত্রে লতাপাতা ফুল (floriated design) প্রভৃতির পরিকল্পনা আছে, এই উদ্ভিজ্জের অলংকরণ ছন্দ ও সজীবতার প্রতীক। শিল্পী মডেলিং-এর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে linear scheme বা রৈখিক নকশার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। সাহিত্যের সঙ্গে শিল্পকলা যে একই সূত্রে গ্রথিত তার নানান নিদর্শন স্তম্ভগাত্রে পাওয়া যায়। কাহিনীমূলক শিল্প সৃষ্টি করেছেন তৎকালীন শিল্পীরা, শিল্প সমালোচকগণ যাকে পটচিত্রের সঙ্গে (scroll painting) তুলনা করেছেন।[২১] ড. স্টেলা ক্রামরিশ মনে করেন, এই লতাপাতার অলংকরণের সঙ্গে মহেঞ্জোদারোর সীলমোহরের উদ্ভিজ্জের

চিত্রের সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ, ভারতীয় শিল্পে শিল্প পরম্পরা যুগে যুগে চলে এসেছে, পরিবর্তন হয়েছে কেবল বহিরঙ্গে, মূলসুরটি একই রয়েছে।[২২]

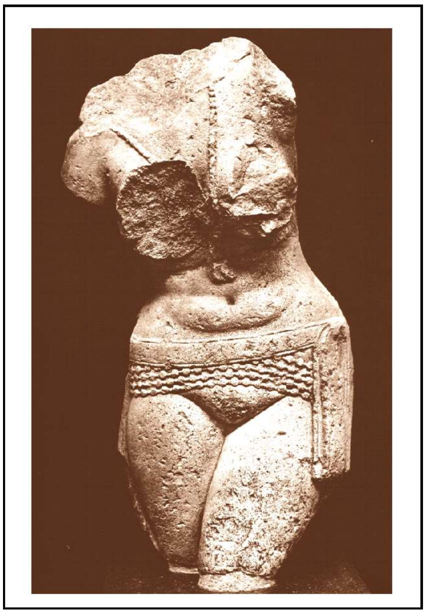

চিত্রসংখ্যা : ১৮

সাঁচির তোরণের কম্পোজিশন ভারহুতের থেকে পৃথক, সাঁচির তোরণের শিল্পকলায় স্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায়, ভারহুতের শিল্পরীতি সম্পূর্ণভাবে আলংকারিক। এর কারণ ভারহুতের ভাস্কর্যশিল্পে আর্যভারতের বা সুঙ্গশিল্পরীতির প্রকাশ আর সাঁচির শিল্পরীতিতে দ্রাবিড় বা অন্ধ্র শিল্পরীতির প্রকাশ। সাঁচির ক্ষেত্রে মূর্তির অবয়ব গভীরভাবে খোদাই করা, মডেলিং দ্বারা আলোছায়ার সুস্পষ্ট রেখা বর্তমান, একটা ঘনক্ষেত্র (three diamension) দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কম্পোজিশন খুব massive বা ভারী এবং সতেজ হয়েছে। শিল্পী যেন পাথর থেকে দেহগুলিকে বের করতে চেয়েছেন এবং দেহগুলি সজীবতার প্রতীক।

ভারহুত এবং সাঁচির শিল্পীরা কোনো আদর্শবাদ বা শিল্পশাস্ত্র দ্বারা চালিত হননি, এই শিল্পসৃষ্টিতে কোনো তত্ত্ব বা আধ্যাত্মিক বার্তা নেই। শিল্পী যা অনুভব করেছেন, যা নগ্নচক্ষে দেখেছেন, তাই অকপটভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই শিল্পকলা পরবর্তী গুপ্তযুগের মতো কোনো রাজার দরবার বা পুরোহিতের অনুশাসনে চালিত নয়। তাই এটিকে জনগণের শিল্প বা ফোক্ আর্টের উচ্চতম সংস্করণ বলা যেতে পারে।

কুষাণযুগের শিল্পকলা (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক) ঃ

কুষাণরা ভারতে বহিরাগত, তারা চীনের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইউ চি জাতির শাখা, এরা শক (সিথিয়ান), পহ্লব (পার্থিয়ান) ও গ্রীকদের পরাজিত করে উত্তর ভারতের অধিপতি হন। কুষাণ রাজারা ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী, ফলতঃ এইসময় বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক শিল্পকলাও প্রতিষ্ঠিত হয়। শিল্পকলা এই সময় থেকে রাজানুগ্রহ লাভ করে, শিল্পীরা বিশেষ কোনো রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পকর্ম শুরু করেন। তৎকালীন রাজারা যে অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই অঞ্চলের শিল্পকলা ভারতশিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিদেশী শিল্পরীতি। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষাণদের দলপতি প্রথম কদফিসেস কাবুল ও গান্ধার জয় করেন। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় কদফিসেস কাশী পর্যন্ত জয় করেন। এই দ্বিতীয় কদফিসেস পুত্র কুষাণদের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কণিষ্ক ৭৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কণিষ্কের পর একে একে বশিষ্ঠ, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক এবং বাসুদেব রাজত্ব করেন। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পরই গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। যেহেতু গুপ্তযুগের শিল্পকলাই আমাদের প্রধান আলোচনার বিষয় তাই এই অর্থেই কুষাণযুগের শিল্পকলার প্রভাবে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলা কতটা প্রভাবিত হয়েছে, কতটা বর্জন করেছে তাই আমাদের

চিত্রসংখ্যা : ১৯

দেখবার বিষয়। গুপ্তপূর্ববর্তী যুগের শিল্পকলা হিসেবে তাই কুষাণযুগের শিল্পকলার গুরুত্ব রয়েছে। কণিষ্কের রাজধানী ছিল কপিশ (আফগানিস্তান) এবং পুরুষপুর (পেশোয়ার)। তাঁর সাম্রাজ্য কাবুল উপত্যকা থেকে কাশী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণিষ্ক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তিনি বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধনের জন্য চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসভা আহ্বান করেছিলেন। কণিষ্কের সময়েই বৌদ্ধধর্ম মহাযান ও হীনযান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মহাযান সম্প্রদায় ছিল মূর্তিপূজার সর্মথক, তাই এই সময় থেকেই বিপুল পরিমাণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন ভাস্কর্যশিল্পীরা। কুষাণযুগের অপর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল - এই সময় থেকেই ভক্তিমার্গের প্রচলন হয়, এর ফলস্বরূপ কুষাণ রাজাদের সঙ্গে সঙ্গে বহু শক ও গ্রীক রাজন্যবর্গ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে এই সময় গ্রীক, শক ও কুষাণগণ মুদ্রায় হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতীক গ্রহণ করেন। হিন্দুদের কাছে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হিসেবে গণ্য হন এবং বৌদ্ধদের কাছে বুদ্ধ দেবতা হিসেবে আর্বিভূত হন, যার প্রভাব তৎকালীন শিল্পকলায় প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার এই সময়ের চিন্তায় পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের প্রভাব বিস্তার করেছিল, পতঞ্জলির দর্শনে অবতারবাদ দেখা যায়। পতঞ্জলির অবতারবাদ অর্থাৎ অশরীরী দেবতারা দেহধারণ করতে পারেন - এই তত্ত্ব দেবমূর্তি গঠনে প্ররোচিত করে এবং এই সঙ্গে গ্রীক-হেলেনিক আদর্শও বৈদিক ভারতকে মূর্তিপূজায় উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা হয়তো এই আর্দশবাদের দ্বারা ভাবিত হয়েছিল। কুষাণ পরবর্তী ভারহুত যুগে শিল্পদের দেবমূর্তি গঠনের তীব্র আকাঙ্খা ছিল, কিন্তু তা আর্যধর্মবিরুদ্ধ বলে সম্ভব হয়নি। আবার এটিও মনে করা যেতে পারে পৌত্তলিক গ্রীক ও যাযাবর বর্বর শকদের জন্য বেদের ধর্ম উপযোগী ছিল না, তাঁদের জন্য religion made easy সংস্করণের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম সবসময়ই elastic, তাঁরা আর্য আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েও কালোপযোগী ধর্ম সৃষ্টি করেছেন এবং বহু বিদেশীকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়েছেন। এই আভ্যন্তরীণ এবং বাইরের প্রভাবের ফলে Anthropomorphism বা মূর্তিপূজা মথুরা শিল্পে সম্ভব হয়েছে। কুষাণ আমলে দুটি ভিন্ন শিল্পধারার জন্ম হয়। প্রথমটি গান্ধার শিল্প, দ্বিতীয়টি মথুরার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্প। মথুরার কাজে কোথাও গ্রীকপ্রভাব লক্ষ্য করা যায় না।

গান্ধার শিল্পরীতি ঃ

কুষাণ সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে ছিল গ্রীক ব্যাকট্রিয়ান রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য, কাজেই গ্রীক ও রোমান কারিগরেরা কুষাণ সাম্রাজ্যে কর্মের সন্ধানে আসতেন এবং তারা গৃহ-মন্দির ও মুর্তি নির্মাণের প্রচুর কাজে পেতেন। এই যুগে এরা প্রচুর

চিত্রসংখ্যা : ২০

মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের কাজ আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিমভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় শিল্পের সাথে গ্রীক ও রোমান শিল্পরীতির মিশ্রণই গান্ধার শিল্প নামে সুপরিচিতি লাভ করে। গান্ধার শিল্প মধ্য-এশিয়ার ঘোটানের মধ্য দিয়ে সুদূর প্রাচ্যে প্রবেশ করেছিল। গান্ধার ভাস্কর্য শিল্পের নির্মাণকাল ৫০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যায়। যদিও কোনো একটি গান্ধার ভাস্কর্যের নির্মাণকাল একেবারে সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় না। গান্ধার ভাস্কর্যকে 'ডিকাডেন্ট গ্রেকো-রোমান' ভাস্কর্য বলা হয়।[২৩] গ্রীক আদর্শে বৌদ্ধ শিল্পের যে বিকাশ ঘটেছিল, শান্ত সমাহিত ভারতীয় মূর্তির আদর্শ এতে ক্ষুন্ন

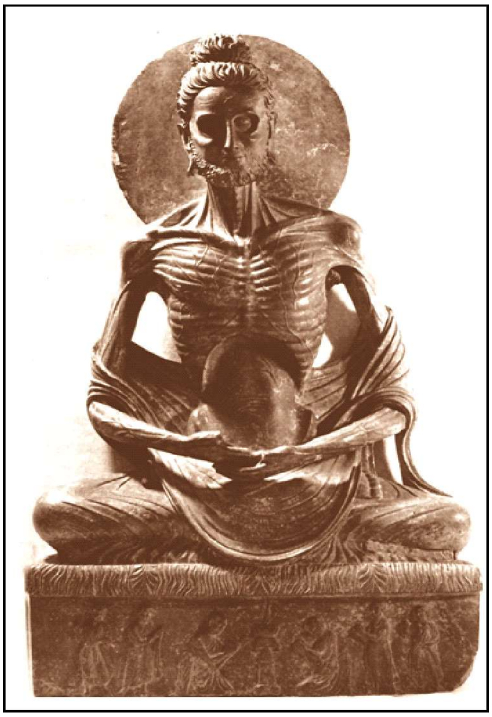

চিত্রসংখ্যা : ২১

হয়েছিল, যেন গ্রীক দেবদেবীগণ ভারতীয় বেশে উপস্থিত, তাই স্থাপত্যে ও দেহের গঠনে গ্রীক প্রভাব বর্তমান। যেগুলি অধিক গ্রীকভাবাপন্ন, সেই সব ভাস্কর্যগুলিকে অধিক পুরোনো মনে করা হয় এবং যেগুলি ভারতীয় ভাবাপন্ন, সেগুলিকে পরবর্তী

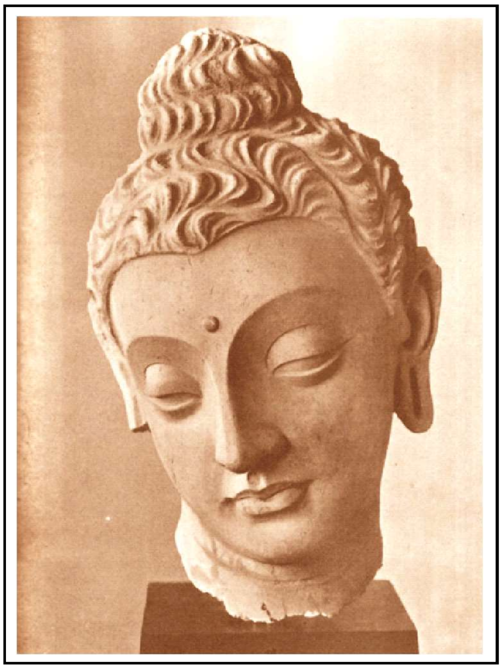

চিত্রসংখ্যা : ২২

যুগের বলে ধরে নেওয়া হয়। গ্রীক শিল্পীরা ভারতীয় আর্যদের ওপর কিছু টেকনিক্যাল বা কলাকৌশলের প্রভাব ছাড়া আর কোনো স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি বরং গ্রীক শিল্পীরাই ভারতীয় ভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চিত্রসংখ্যা : ২৩

গান্ধার শিল্পের ফলে ভারতীয় চিত্রে এবং ভাস্কর্যে মূর্তি শিল্প প্রবল উৎসাহ পায়, ফলে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে প্রচুর দেবমূর্তি নির্মিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষ যারা বেদের মর্ম অনুধাবন করতে পারতেন না, তারা মুর্তিপূজার দিকে ঝুঁকে পড়েন। জাতক ও বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা গান্ধার ভাস্কর্যের বিষয় হয়ে ওঠে। এমনকি এই সময় হাজার হাজার বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়েছে। গান্ধার বুদ্ধের মূর্তির কাঁধের দুই দিক থেকে কাপড় নেমে এসেছে, এই রীতি পরবর্তী মথুরা শিল্পরীতি থেকে ভিন্ন, মথুরা বুদ্ধমূর্তিতে ডান কাঁধ খোলা, বাঁ কাঁধ থেকে কাপড় নেমে এসেছে।

গান্ধার ভাস্কর্যের একটি নমুনা : শক্রের (ইন্দ্র) বুদ্ধকে ইন্দ্রশৈল গুহায় দর্শন; কুবের ও তার সঙ্গী হারিতি দেবীর মূর্তি দেখা যায়। লাহোরের জাদুঘরে রক্ষিত বিশালদেহ গোঁফযুক্ত কুবেরের মূর্তি যা গ্রীসের 'জিয়াস'-এর মূর্তিকে মনে করায়।

গান্ধার ভাস্কর্যের অপর একটি নিদর্শন বোধিসত্ত্বের মূর্তিতে গোঁফ, লম্বা চুল

চিত্রসংখ্যা : ২৪

যুক্ত, যা ভারতীয় রীতির বহির্ভূত, এটি গান্ধার মূর্তির বৈশিষ্ট্য, বহু শিল্পীর পরীক্ষণ চলেছিল বুদ্ধমূর্তি নিয়ে। বুদ্ধবূর্তির অপর গান্ধার শিল্পরীতি হল লাহোর জাদুঘরে রক্ষিত তপশ্চর্যারত কঙ্কালসার বুদ্ধের মূর্তি। মূর্তিটির চক্ষু কোটরাগত, বুকের পাঁজর-গুলি দৃশ্যমান। বুদ্ধকে এভাবে দেখানো নেহাতই অভারতীয়। হিন্দু বা বৌদ্ধ কোনো শিল্পশাস্ত্রেই এইরূপ কঙ্কালসার দেহের সমর্থন মেলে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ভারতীয় মূর্তিশিল্পের রীতিনীতির উল্লেখ আছে গুপ্তযুগে লিখিত শিল্পশাস্ত্র বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে; সেখানে বলা হয়েছে 'দেবতাদের মূর্তি নির্মাণ করতে হবে পনের বছর বয়স্ক তরুণ যুবকের মতো।'[২৪] গান্ধার ভাস্কর্যের প্রভাবে চীন-জাপানে এইরূপ কঙ্কালসার মূর্তি এবং গোঁফওয়ালা বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। হিন্দু ভাস্কর্যে কেবল শিবের অনুচর ভৃঙ্গীর কঙ্কারসার মূর্তি দেখা যায়, কারণ সাহিত্যে উল্লেখ আছে — কঠিন তপশ্চর্যরত ভৃঙ্গী বহুকাল ধরে উপবাস করে কঙ্কালে পরিণত হয়েছিলেন[২৫] — যার মূর্তি এলিফ্যান্টা গুহায় রয়েছে।

গান্ধার ভাস্কর্যে স্টাকো ও টেরাকোটার প্রচুর মূর্তি দেখা যায়। ২/৩ ইঞ্চি ক্ষুদ্রকার মূর্তি থেকে প্রমাণ আকৃতির মূর্তি পাওয়া যায়। বৌদ্ধরা মন্দিরে মূর্তিদান

করাকে পূণ্যকাজ মনে করতেন, কাজেই অল্পমূল্যে স্টাকো বা টেরাকোটার মূর্তি পাওয়া যেত, তা কেবল বিত্তহীন মানুষেরা উৎসর্গ করতো, বিত্তশালী বা ধনীরা দান করতেন পাথর বা ব্রোঞ্জের মূর্তি। এইসব উৎসর্গীকৃত বা মানত করা মূর্তির (votive offering) জন্যই এত অধিক সংখ্যক মূর্তি আমরা পাই। মূর্তি ছাড়াও কখনো বা পাথরে খোদাই করা ছোট ছোট স্তূপ (votive stupa) দান করা হতো।

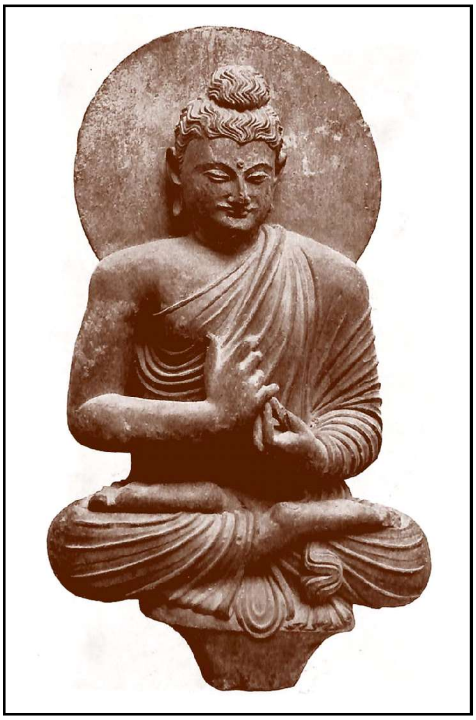

চিত্রসংখ্যা : ২৫

পরবর্তী যুগে হিন্দুরাও বৌদ্ধদের অনুসরণ করে মন্দিরে দেবমূর্তি দান করে পূণ্য সঞ্চয় করতেন, দাক্ষিণাত্যে এইরূপ ব্রোঞ্জ মূর্তি দান করতে দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীসেও মন্দিরে দেবমূর্তি দান করার বিধি প্রচলিত ছিল।

গান্ধার শিল্পরীতির পরবর্তীযুগের মূর্তিগুলি স্টাকো ও মাটির সমাবেশে প্রস্তুত, একই ছাঁচ থেকে মূর্তিগুলির মস্তক প্রস্তুত হোত। এমনকি মূর্তিতে রঙ্ দেওয়ার বিধি প্রচলিত ছিল গান্ধার শিল্পে।

গান্ধার শিল্পের বেশীরভাগ নিদর্শন ছড়িয়ে আছে জালালাবাদে, হাড্ডা, আফগানিস্তান, তক্ষশীলা, পেশোয়ার ও লাহোর জাদুঘরে। গান্ধার স্থাপত্যে গ্রীক-

স্তম্ভ-ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়, যা কোরিন্থিয়ান ভাস্কর্যের অনুরূপ স্তম্ভশীর্ষে প্রচুর কারুকার্য দৃশ্যমান, শিল্প সমালোচকগণ এই শিল্পকে ইণ্ডো-কোরিন্থিয়ান আখ্যা দিয়েছেন। হ্যাভেল সাহেব গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে আলোচনায় গ্রীক শিল্প সম্বন্ধে বলেছেন : Greek remained a child always, with childish dreams of life and beauty. Let us ever cherish those dreams of childhood which belong to the springtime of humanity. But the art of India grew to maturity and put away childish things. The art of Gandhara was her plaything as a child.[২৬]- E.B. Havell, India Sculpture and Painting, John Murray, London, 1908.

মথুরা ভাস্কর্যরীতি ঃ

কুষাণ যুগের শিল্পরীতির দ্বিতীয় অধ্যায় হল মথুরা ভাস্কর্যরীতি। যমুনার তীরে প্রাচীন মথুরানগরীতে এই রীতি গড়ে ওঠে। নিকটবর্তী খনিতে লাল বেলেপাথর সহজলভ্য হওয়ায় শত শত ভাস্কর্য এখানে থেকে মূর্তি নির্মাণ করেছেন। এই রীতি

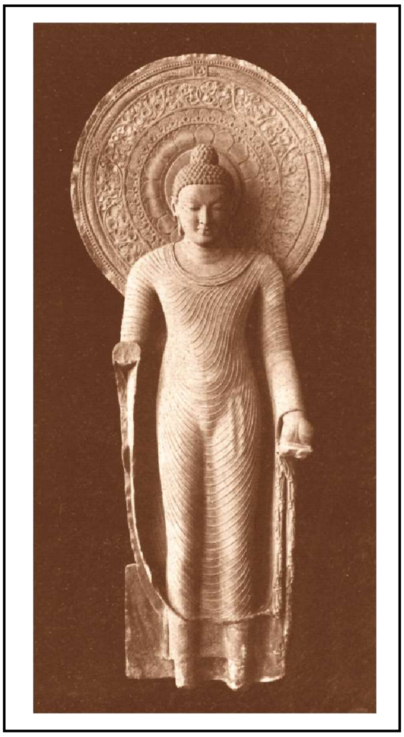

চিত্রসংখ্যা : ২৬

গ্রীক প্রভাবমুক্ত দেশীয় শিল্পরীতির পরিচায়ক। ভারহুত এবং মৌর্য ভাস্কর্যরীতির প্রভাব পরম্পরাক্রমে মথুরা শিল্পরীতিতে বিরাজমান। যদিও কোনো কোনো মূর্তি ও রিলিফে তৎকালীন গান্ধারশিল্পের প্রভাবও লক্ষ করা যায়। মথুরার অসংখ্য ভাস্কর্যের মধ্যে খুব কম মূর্তিতেই গান্ধার প্রভাব দেখা যায়। মথুরা ও গান্ধার শিল্পের জন্ম একই সময়ে। তবুও মথুরা শিল্পী-ভাস্কর বাইরের প্রভাব বর্জিত হয়েই তাদের শিল্প সৃষ্টি করেছেন। সময়ের দিক থেকে বিচার করলে, গান্ধার শিল্পীরাই প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেছেন, মথুরা শিল্পের অভ্যুত্থান পরে হলেও মথুরা শিল্প গান্ধার শিল্প দ্বারা

চিত্রসংখ্যা : ২৭

প্রভাবিত হয়নি। মথুরার বুদ্ধমূর্তি সম্পূর্ণভাবে দেশজ। গান্ধার বুদ্ধকে আর কোনো শিল্পই অনুসরণ করেনি, কাজেই বলা যায় প্রচলিত বুদ্ধমূর্তির পরিকল্পনা সর্বপ্রথম কুষাণ শিল্পীরাই খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে করেছেন। মথুরার বুদ্ধমূর্তি সারনাথ ও গয়ার বুদ্ধমূর্তির আদর্শ স্থাপন করেছে। মথুরার বুদ্ধমূর্তিকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। শিল্পীরা নিজেদের কল্পনা ও ধারণা অনুসারে বুদ্ধকে নির্মাণ করেছেন। মথুরা-ভাস্করশিল্পী বুদ্ধকে যক্ষের আকারে গড়েছেন, তাঁকে চক্রবর্ত্তীরূপে দেখিয়েছেন। এই বুদ্ধ সাংসারিক আত্মতৃপ্ত ব্যক্তি, তাঁর উন্মুক্ত চক্ষু হাস্যময়।

মথুরা বোধিসত্ত্ব মূর্তির বৈশিষ্ট্য হল - মূর্তি উচ্চ রিলিফ বা পূর্ণাবয়ব মস্তক মুণ্ডিত, কোনো কুঞ্চিত কেশ নেই, প্যাঁচানো উষ্ণীষ (spiral), ডান কাঁধ খোলা, ডান হাতে অভয়মুদ্রা, উপবিষ্ট মূর্তির বাঁ হাত হাঁটুর উপর ন্যস্ত; দণ্ডায়মান মূর্তিতে বাঁ হাত উত্তরীয় ধরে আছে, বস্ত্র দেহের গঠনকে স্পষ্ট করেছে, কাঁধ প্রশস্ত, বক্ষ উন্নত। মাথার পেছনে আলোকমণ্ডল (হ্যালো) সমতল ও কারুকার্যবিহীন (যা পরবর্তী গুপ্তযুগে কারুকার্যে পূর্ণ)। কোথাও পদ্মাসন নেই, বুদ্ধ সিংহাসনে উপবিষ্ট। দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির পায়ের ভিতর অনেকসময় উপবিষ্ট সিংহ দেখা যায়। মুখে শান্তি ও মাধুর্য্যের পরিবর্তে শক্তিমত্তার অভাব।

চিত্রসংখ্যা : ২৮

এই বৈশিষ্ট্যগুলিই অনান্য শিল্পরীতি থেকে মথুরা শিল্পরীতিকে পৃথক করেছে। এই যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সারনাথ জাদুঘরে রক্ষিত বোধিসত্ত্বের বিরাট মূর্তি। এটি কণিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বছরে (৮১ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত। সন্ন্যাসী ‘বল’ এটি দান

করেছিলেন। কলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত একই সময়ে নির্মিত মূর্তিটি শ্রাবস্তীর জেতবনের নিকট প্রাপ্ত।

মথুরা ভাস্কর্যশিল্পের অন্য নমুনা হল : ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত রেলিং-এর স্তম্ভে উচ্চ রিলিফযুক্ত বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও যক্ষিণীমূর্তি সহ নগ্ন রমণীমূর্তির ভাস্কর্য। প্রাচীন বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে এইরূপ নগ্ন নারীমূর্তি দেখা যায়। যার পরিণতি পরবর্তী খাজুরাহো ও কোণার্কের মৈথুন মূর্তিতে। অর্থাৎ মথুরার নগ্ন নারীমূর্তি শিল্পরীতি পরবর্তীযুগের ভাস্কর্যকে প্রভাবিত করেছিল সন্দেহ নেই। এই মূর্তি নির্মাণের ধারণাটি বৌদ্ধ, জৈন বা ব্রাহ্মণধর্ম থেকে প্রাপ্ত হয়নি; এর উৎপত্তি অতি প্রাচীন মাদার গডেস বা ভূমিদেবীর মধ্যে নিহিত ছিল। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া জুড়ে এই মাদার গডেসের পূজা প্রচলিত ছিল।[২৭]

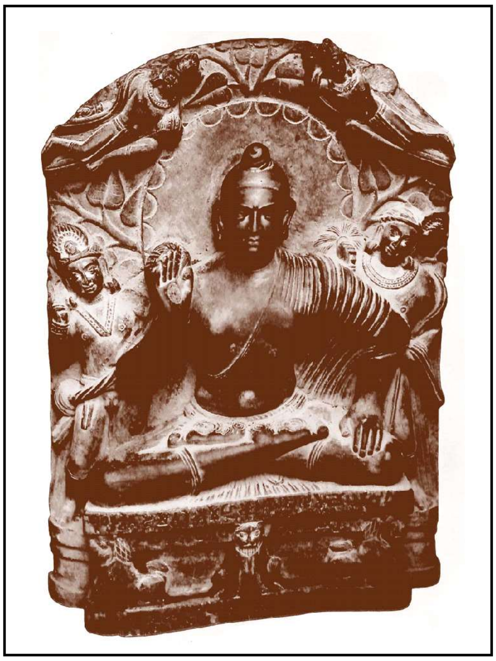

চিত্রসংখ্যা : ২৯

মথুরা শিল্পের আরও এক নির্দশন : জামালপুরে প্রাপ্ত জল-অপ্সরার মূর্তি, গোলাকার কলসী থেকে উদ্ভিন্ন পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান অপ্সরা মূর্তির সঙ্গে মায়াদেবী ও লক্ষ্মী দেবীর সম্বন্ধ আছে। এই মূর্তি পূর্ণঘটকে সূচিত করছে।

গান্ধার ভাস্কর্যে যেমন গ্রীক মূর্তির ন্যায় বস্ত্র স্বাভাবিকভাবে দেখানো হয়েছে, বস্ত্রের ভাঁজে দেহের গঠন বোঝা যায়, কিন্তু মথুরা ভাস্কর্যের মূর্তিশিল্পে বস্ত্র শুধু দেহের ওপর রেখা টেনে বোঝানো হয়েছে। দেহের ওপর কয়েকটি রেখা ছাড়া বস্ত্রের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। মথুরা শিল্পের বহু মূর্তিই অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র-আচ্ছাদিত। তাই নগ্নমূর্তিগুলি বহুক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ নগ্ন নয়, সেখানে শরীরের ওপর কয়েকটি রেখা টেনে এই বস্ত্রের অস্তিত্ব বোঝানো হয়েছে।

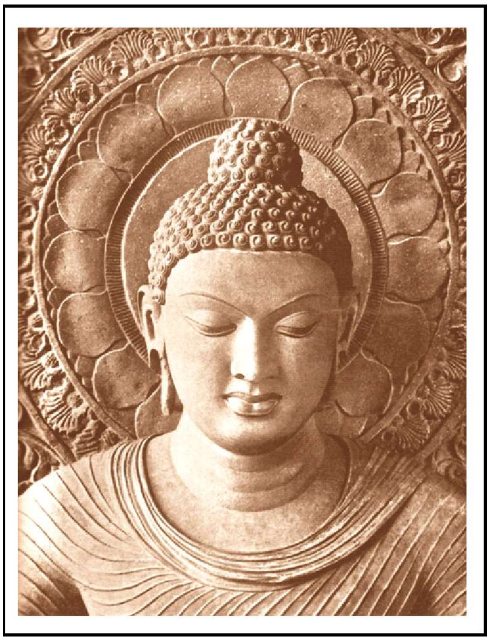

চিত্রসংখ্যা : ৩০

এইসব মূর্তি ছাড়াও মথুরা শিল্পরীতিতে ভাস্কররা আর একটি বিষয়ে মূর্তি গড়েছেন, তা হল - কুষাণ রাজাদের প্রতিকৃতি। সর্বপরিচিত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি যা শক (সিথিয়ান) শিল্পীর নির্মাণ; জোব্বা ও পাজামা পরিহিত, পায়ে বুট, কোমরে তরবারি - যা মধ্য এশিয়ার পোশাক; উল্লেখ্য প্রাচীন ভারতে মূর্তিশিল্পে সূর্যমূর্তি ছাড়া কারও পায়ে পাদুকা নেই; সূর্যের হাঁটু পর্যন্ত আধুনিক ধরণের লংবুট পরা। যেখানে গান্ধার মূর্তিতে গ্রীক স্যাণ্ডেল আছে। এই পরিকল্পনা শিল্পী বাইরে থেকে গ্রহণ করেছেন।

এছাড়াও কুষাণযুগের শিল্পরীতিতে নাগমূর্তির প্রচলন ছিল, শ্রেষ্ঠ নাগমূর্তি

মথুরার জাদুঘরে রক্ষিত; প্রমাণ আকার বিশিষ্ট, মানুষের মূর্তি কিন্তু পশ্চাতে সাপের ফণা রয়েছে। এছাড়াও স্ফীত উদরবিশিষ্ট যক্ষমূর্তির দেখা মেলে। এই রীতিতে পরবর্তীকালের বৌদ্ধ জাম্ভলমূর্তি ও হিন্দু গণেশমূর্তি নির্মিত হয়েছিল মনে করা হয়।

লক্ষনীয় বিষয়, কুষাণযুগের শিল্পে জাতকের বিষয় খুবই অল্প, যা ভারহুতে বেশী দেখা গিয়েছিল, সাঁচিতে তদপেক্ষা কম এবং কুষাণ শিল্পকলায় তা আরো কমে এসেছে। এই থেকে মনে করা যেতে পারে শিল্পীরা নিজেদের মানসিক প্রফুল্লতায় ও উৎসাহে শিল্প সৃষ্টি করার তাগিদ অনুভব করেননি - সবই মূলতঃ রাজানুগ্রহে ও নিছক ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই শিল্প ও ভাস্কর্যমূর্তি নির্মিত হয়েছে।

অন্ধ্র-ভাস্কর্য রীতি ঃ

উত্তর ভারতে যখন মথুরা শিল্পরীতি ও উত্তর পশ্চিমভারতে গান্ধার শিল্পরীতির কুষাণ রাজাদের আমলে বহুল প্রচলিত ছিল, তখন দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্ররাজাদের শাসনাধীনে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার কার্লি, কেনেরি ও নাসিক গুহাতে এবং দক্ষিণপূর্বে অমরাবতী ও নাগার্জ্জুন স্তূপ নির্মিত হয়।

অমরাবতী স্তূপ (খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক) :

দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর তীরে যথাক্রমে অমরাবতী ও নাগার্জুনকোণ্ডার স্তূপ অবস্থিত। এগুলি অন্ধ্ররাজাদের কীর্তি। ভারহুত ও সাঁচিতে কেবল রেলিং-এর ওপর ভাস্কর্য আছে, স্তূপে কোনো কাজ নেই। কিন্তু অমরাবতীর স্তূপ দুই সার প্রস্তর ফলকের উপর বুদ্ধের জীবনের নানান খোদিত ভাস্কর্য বিদ্যমান। মথুরা ও অমরাবতীর শিল্পীদের 'ত্রিভঙ্গ' ভঙ্গিমা অতি প্রিয় ও রমণীয়। অমরাবতীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য মডেলিং-এর সৌকুমার্য, দীর্ঘ অঙ্গ, নারীর তন্বী গঠন এবং পুরুষের শক্তিশালী কাঠামো উপভোগ্য। দেহের ও বাহুর বক্রতার রেখা ছন্দোময়, প্রার্থনারতা নতজানু এক রমণীর মূর্তি অতিশয় চিত্তাকর্ষক। 'থ্রি কোয়ার্টার' মুখ অমরাবতীর শিল্পীর খুব প্রিয়, যা ভারতের অন্য ভাস্কর্যে দেখা যায় না। গৃহের অভ্যন্তরের দৃশ্য

চিত্রসংখ্যা : ৩১

রচনায় অমরাবতীর শিল্পী foreshortening-এর নির্দশন দেখিয়েছেন। উৎসব সমারোহ, সঙ্গীত, নৃত্য ও শোভাযাত্রার বিষয় যা অজন্তা চিত্রকলাকে মনে করায়। ভারহুতে এটি নেই, সাঁচির শিল্পীরা এর চেষ্টা করেছিলেন আর অমরাবতীতে এর পরিণত রূপ দেখা যায়। পরবর্তী যুগের অজন্তা চিত্রকলায় এই প্রকার পরিপ্রেক্ষণ দেখা যায়। এমনকি অমরাবতীর মণ্ডপ অজন্তার চিত্রের ন্যায়; এরূপ মনে হতে পারে অজন্তার চিত্রকর নিশ্চয়ই অমরাবতী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অমরাবতীর ভাস্কর্যের বিশেষত্ব হল স্তম্ভসমূহের ওপর স্থাপিত দণ্ড (Coping)-এর বিশেষ নির্মাণ। ভারহুতের গ্রাম্য জীবনের দৃশ্যের মতো অমরাবতীতে পদ্মলতা, বহু ফুলের মালার সন্নিবেশে জনপ্রবাহ যেন বেগবান ও অধীর। কেউ লতা

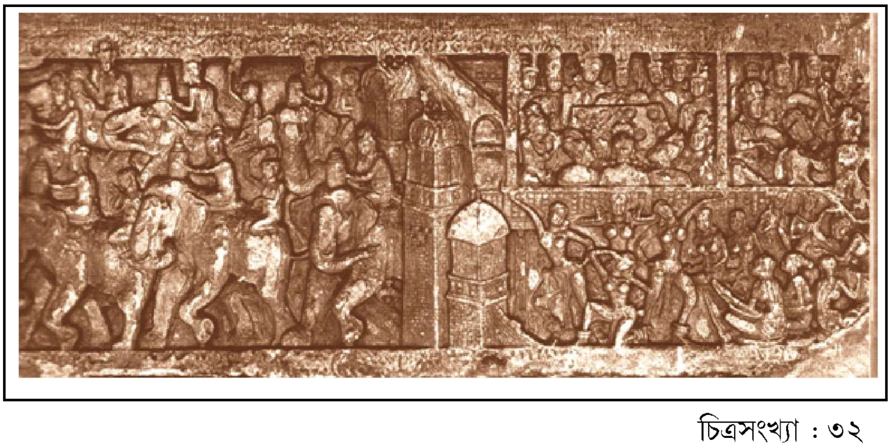

চিত্রসংখ্যা : ৩২

ধরে দণ্ডায়মান, কেউ উপবিষ্ট - যা এক প্রাণোচ্ছল জীবনের অভিব্যক্তি। মাঝে মাঝে রয়েছে বোধিবৃক্ষ, উদ্ভিদ ও মানুষ - মানবজীবন এখানে প্রকৃতির সাথে মিশে আছে। এই অনাবিল আনন্দ মথুরা শিল্পরীতির থেকে পৃথক। মথুরার শিল্পী নিজেকে দেহের

চিত্রসংখ্যা : ৩৩

লালসার উর্দ্ধে তুলতে পারেননি, কিন্তু অমরাবতীর শিল্পী দেহের ছন্দে যেন সঙ্গীতের ঝংকার তুলেছেন। অজন্তার চিত্রের ন্যায় অমরাবতীর ভাস্কর্য খুব sophisticated, বলা যেতে পারে অমরাবতী থেকেই গুপ্তযুগের শিল্পের সূচনা যদিও আধ্যাত্মিকতার বার্তা অমরাবতীর শিল্পে পৌঁছয়নি।

যেহেতু খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে গ্রীকরা সমুদ্রপথে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ ভারতে গিয়েছিল, অমরাবতীর মডেলিং-এ গ্রীক প্রভাব ধরা পড়ে। অমরাবতীতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিতে (৬ ফুট ৪ ইঞ্চি, মার্বেল নির্মিত, দণ্ডায়মান, খৃ. ৩য় শতক) গ্রীক প্রভাব স্পষ্ট; কাপড়ের ভাঁজে শরীর আবৃত, গুপ্তযুগের ন্যায় স্বচ্ছ বস্ত্র দ্বারা শরীরের অবয়ব ফুটে ওঠে তেমন নয়। বিশিষ্ট শিল্পসমালোচক কুমারস্বামী অমরাবতী সম্পর্কে বলেছেন - ‘It would hardly be possible to exaggerate the luxurious beauty or the technical proficiency of the Amaravati reliefs; This is the most voluptuous and the most delicate flower of Indian Sculpture.’[২৮]

গুপ্তযুগের শিল্পকলা ঃ

খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক ভারতে একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। উত্তর ভারতে কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন এবং দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র রাজত্বের বিলুপ্তির সময় থেকে ভারতীয় ইতিহাসে গুপ্তবংশের উত্থান ঘটে।

গুপ্তযুগে পুরাণ, কাব্য-নাটকাদি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং বহু শিল্পশাস্ত্র এই সময় রচিত হয়। বাঘ, অজন্তা ও সিংহলের ফ্রেস্কো এই সময়ে অঙ্কিত হয়েছে।

শিল্পের ইতিহাসে মৌর্য থেকে শুরু করে ভারহুত, সাঁচি, মথুরা ও অমরাবতী পর্যন্ত একটি যুগের সূচনা করে, এই যুগের শিল্পকে প্রিমিটিভ বা আদিম শিল্প বলা যায়।[২৯] এর পরবর্তী যুগ গুপ্তযুগ বা ভারতীয় শিল্পের ক্ল্যাসিকাল যুগ। এই যুগে শিল্পের আদর্শ একেবারে বদলে গেছে। বহু যুগের বহু দেশের বহু সাধনার ধারা গুপ্ত আদর্শে এসে মিশেছে। দেশজ অর্থাৎ ভারতের পূর্ববর্তী শিল্পরীতির সঙ্গে বৈদেশিক

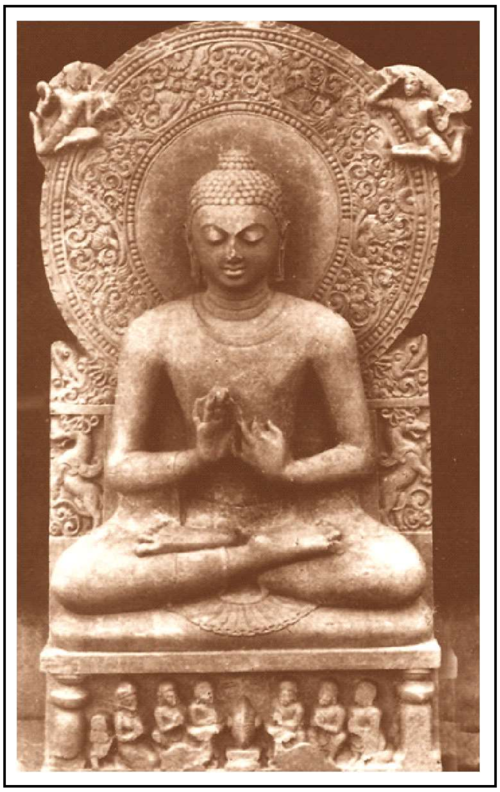

চিত্রসংখ্যা : ৩৪

রীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। কিন্তু বিদেশী শিল্পধারা গ্রহণ করেও গুপ্ত শিল্পী এই শিল্পরীতিতে নিজস্ব ভাষায় রূপদান করেছেন। বহু যুগ ধরে ভারতে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, গুপ্ত শিল্পে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। গুপ্তযুগের শিল্পে সম্পূর্ণ রূপে ভারতীয় শিল্পাদর্শের এবং টেকনিকের একত্রীকরণ ঘটেছে। Smith -এর মতে 'The three closely allied arts of Architechture, Sculpture and Painting attained an extraordianary high-points of achievements.' [৩০]

গুপ্তযুগে বুদ্ধমূর্তি ও ব্রাহ্মণ্যমূর্তি উভয়ই নির্মিত হয়েছিল। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল - সারনাথের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধমূর্তি এই সময়ে পূর্ণরূপ পায়। ধ্যানস্তিমিত নেত্র বা নাসাগ্র দৃষ্টি, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বস্ত্র; বস্ত্রের ভেতর দিয়ে দেহের গঠন দেখা যাচ্ছে, কাঁধের দুই দিকই কাপড়ে ঢাকা এবং মস্তকের পিছনে আলোকমণ্ডল (হ্যালো) কারুকার্যে পূর্ণ। $৫^{১}/_{২}$ ফুট উচ্চ, সাদা বেলে পাথরে নির্মিত, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কাজ, সারনাথ জাদুঘরে রক্ষিত মূর্তিটি বুদ্ধের ধর্মপ্রচারকালীন মূর্তি। মূর্তিটির আসনের নীচে একটি চক্র খোদিত আছে। মাথার পিছনে আলোকমণ্ডল কারুকার্যে পূর্ণ। দেহের গঠন মসৃণ, মুখে শান্তি সমাহিত ভাব।

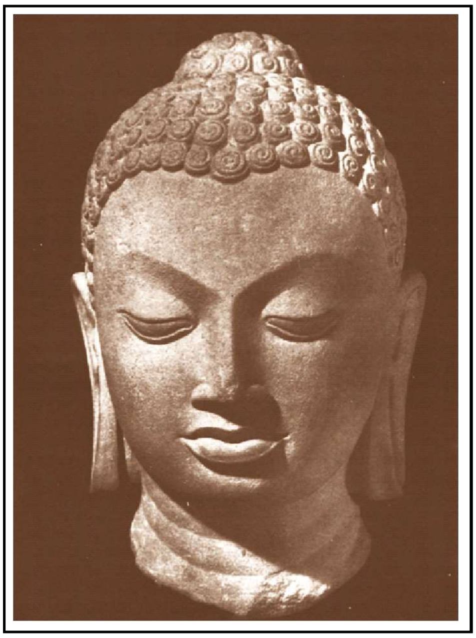

চিত্রসংখ্যা : ৩৫

এই যুগের অপর শিল্প নিদর্শন হল - মথুরার জাদুঘরে রক্ষিত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, ৭ ফুট ২$^{১}/_{২}$ ইঞ্চি উচ্চ, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত, স্বচ্ছ কাপড়ের ভেতর দিয়ে দেহের গঠন দেখানো হয়েছে। বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচল ধরা - এটি গুপ্ত ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য।

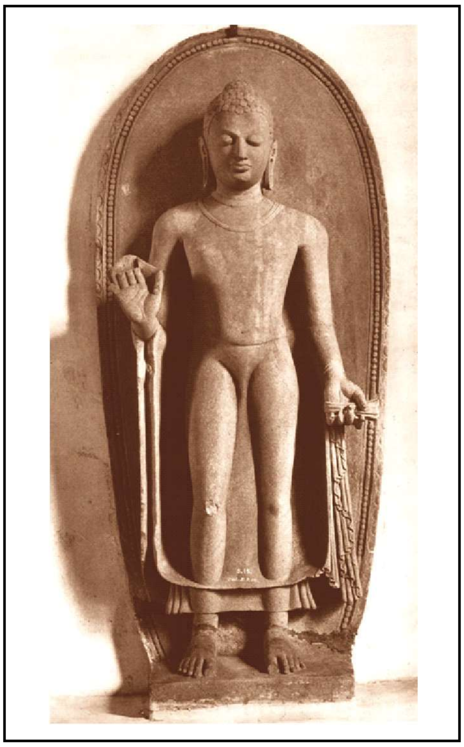

চিত্রসংখ্যা : ৩৬

অপর বুদ্ধমূর্তির নিদর্শন হল - বর্তমানের বার্মিংহাম জাদুঘরে রক্ষিত, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বিরাট আকারের ধাতু নির্মিত বুদ্ধ মূর্তি। ৭$^{১}/_{২}$ ফুট উচ্চ, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত - যা গুপ্তযুগের ভাস্কর্যশৈলীর নিদর্শন।

মানকুয়ার উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, যা খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত, কুষাণ বুদ্ধের মতো মাথা কামানো, হাতের আঙ্গুল জোড়া (webbed finger)।

হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যমূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হল - শিব-পাবর্তীর মূর্তি, যা কোলকাতা জাদুঘরে রক্ষিত, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত, এলাহাবাদ জেলার কোসাম (কৌশাম্বি)-এ প্রাপ্ত।

চিত্রসংখ্যা : ৩৭

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে নির্মিত দেওঘরের দশাবতার মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত ৩টি নিদর্শন — (১) শিবমহাযোগী, (২) গজেন্দ্র মোক্ষ, (৩) বিষ্ণুর অনন্তশয্যা - যা গুপ্তশিল্পরীতির নিদর্শন। এলাহাবাদের গরহোয়াতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত গুপ্তযুগীয় মন্দিরে কিছু ভাস্কর্য নির্মিত আছে।

চিত্রসংখ্যা : ৩৮

এছাড়াও, বেসনগরে প্রাপ্ত গঙ্গাদেবীর মূর্তি, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত যা বর্তমানে আমেরিকার বোস্টনে রক্ষিত আছে।

বিষ্ণুর অনন্তশয্যার দৃশ্যমূর্তি (আইহোল মন্দির ভাস্কর্য - খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক), কৃষ্ণের জন্ম (গোয়ালিয়র জাদুঘর, খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক), বরাহঅবতারের মূর্তি (গোয়ালিয়র-উদয়গিরি, খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতক) — গুপ্তযুগীয় মূর্তি ভাস্কর্যগুলির মধ্যে অন্যতম।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত বিকাশ ঘটে। গুপ্তযুগে স্তূপ, চৈত্য ও বিহার, মন্দির প্রভৃতি নিয়ে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। স্তূপ, চৈত্য, বিহার, হিন্দুমন্দির, সাধারণ গৃহ, নাট্যগৃহ নির্মিত হয়েছিল।

গুপ্তযুগের স্তূপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত সারনাথের ধামেক স্তূপ। অজন্তার ১৬, ১৭ এবং ১৯ নং গুহাও গুপ্তযুগের নির্মিত,

চিত্রসংখ্যা : ৩৯

এদের মধ্যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে নির্মিত ১৬, ১৭ নং গুহার স্তম্ভযুক্ত হল এবং 'প্রলম্বপাদ আসনে' উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য। ১৯নং গুহার মধ্যে আছে মনোলিথিক নলাকৃতি স্তূপ, এই স্তূপের গাত্রে মকর তোরণের ভিতর দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি খোদিত আছে। এই গুহার প্রবেশপথের দুই দিকে বুদ্ধের মূর্তি খোদিত আছে এবং এই গুহায় নাগরাজ ও রাণীর মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

অজন্তা গুহা যদিও চিত্রের জন্য বিখ্যাত, তবুও এর কিছু ভাস্কর্য খুবই উল্লেখযোগ্য। যেমন খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত ২৬নং গুহায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ মূর্তি (২৩১/৪ ফুট লম্বা)। বুদ্ধ ও মারের আক্রমণের মূর্তি খোদিত আছে।

গুপ্তযুগে স্থাপত্য ভাস্কর্যের পাশাপাশি চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। এই যুগ ভারতশিল্পের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এই চিত্রকলার কারণেই। অজন্তাগুহায় অঙ্কিত চিত্রকলা গুপ্তযুগের নির্মাণ। তাঁর আগে কোনো রাজাদের আমলেই চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগে যেমন ভারতীয় ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছে, একইসঙ্গে অজন্তা চিত্রেরও বিকাশ ঘটেছে। গুপ্তযুগের চিত্রকলার দৃষ্টান্তস্বরূপ অজন্তা গুহাচিত্রের প্রসঙ্গ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের অজন্তার কয়েকটি প্রধান চিত্র হলো —

চিত্রসংখ্যা : ৪০

(১) ১৬-সংখ্যক গুহা - বুদ্ধ ত্রিমূর্তি, ঘুমন্ত নারী, মুমূর্ষু রাজকুমারী। (খ্রিস্টীয় ৫ম শতক)

চিত্রসংখ্যা : ৪১

(২) ১৭-সংখ্যক গুহা - সংসার চক্র, সপ্তবুদ্ধ, বিজয় সিংহ অবদান। কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন, অভিষেক দৃশ্য, প্রণয়লীলা, গন্ধর্ব এবং অপ্সরা (flying figures),

চিত্রসংখ্যা : ৪২

মহাহংস, মাত্রোপাসক, রুরু, ছদ্দণ্ড, সিধি, বেস্সান্তর, নলগিরি জাতক। (খ্রিস্টীয় ৫ম শতক)

(৩) ১৯ সংখ্যক গুহা - বহু বুদ্ধমূর্তি কপিলাবস্তুতে প্রত্যাবর্তন। (খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক)

(৪) ১ সংখ্যক ও ২ সংখ্যক গুহা - এই গুহাগুলি গুপ্তপরবর্তী যুগের হলেও এতে গুপ্তযুগের প্রভাব লক্ষিত হয়। (খ্রিস্টীয় ৭ম শতাব্দী)

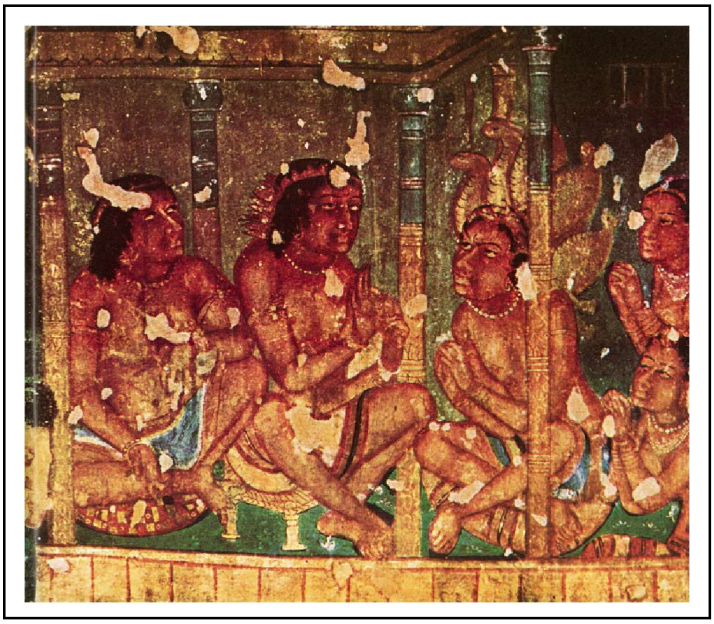

চিত্রসংখ্যা : ৪৩

১ সংখ্যক গুহা (খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৬৫০ অব্দ) - বোধিসত্ত্বের মূর্তি, মারধর্ষণ, মদ্যপায়ীর দৃশ্য (পুলকেশীর সভায় পারস্যের রাজদূত বলে পরিচিত), ছাদের প্রণয়লীলার চিত্র, শিবি (দেহ থেকে মাংস কেটে দান করছেন), নলজাতক, ছাদের কারুকার্য।

২ - সংখ্যক গুহায় (খ্রিস্টীয় ৬০০ থেকে ৬৫০ শতক) - শ্রাবস্তির অলৌকিক ঘটনা, ইন্দ্রলোক দৃশ্য, রাজপ্রাসাদের দৃশ্য, ক্ষান্তিবাদিন ও মৈত্রীবালা জাতক, ছাদের কারুকার্য।

উপরোক্ত চিত্রগুলি অজন্তার প্রধান কয়েকটি চিত্র। কুমারস্বামী এশিয়ার শিল্পকলায় গুপ্তযুগের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছেন – "Far eastern races have developed independently elements of culture no less important that those of India; but almost all that belongs to the common spiritual consciousness of Asia, the ambient in which, its diversities are reconcilable, is of Indian origin in the Gupta period."[৩১]

১৬, ১৭ এবং ১৯ নং গুহাতেই গুপ্তযুগের চিত্র দেখা যায়। অজন্তার ২৯টি গুহার মধ্যে প্রধান চিত্রগুলি আছে ১, ২, ৯, ১১, ১৬, ১৭, ১৯ ২১ সর্বমোট ৮টি গুহাতে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক চিত্র আছে ১৭ সংখ্যক গুহাতে। বাকাটক রাজাদের আমলে নির্মিত ১৬, ১৭, ১৯ নম্বর গুহার চিত্র গুপ্তযুগে অঙ্কিত হয়েছে। যদিও ১ ও ২ সংখ্যক গুহার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে চালুক্য সম্রাটদের আমলে। অন্ধ্ররাজাদের পরে বাকাটক রাজারা দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করেছিলেন এবং বাকাটক রাজ্য গোদাবরী নদীর সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পথে গুপ্তদের শিল্পরীতি বাকাটক রাজ্যে প্রবেশ করেছিল, এর প্রমাণ হিসেবে ১৬ নং গুহায় বাকাটক শিলালিপি পাওয়া গেছে।[৩২]

অজন্তার অধিকাংশ গুহার চিত্র চালুক্য সম্রাটদের আমলে (খ্রিস্টীয় প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক) নির্মিত হয়েছিল। চালুক্যরা ছিলেন বৌদ্ধ, কাজেই তাঁরা বৌদ্ধশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। এরপর চালুক্যদের পরাজিত করে পল্লবরা সিংহাসন অধিকার করেন। পল্লবরা ছিলেন শৈব, তাঁরা বৌদ্ধকীর্তি রক্ষা করার তাগিদ অনুভব করেননি। ফলে অনেক গুহা অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে।

গুপ্তযুগে একই আদর্শ ভাস্কর্যে ও চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে, বস্তুতঃ দুটি শিল্পকে পাশাপাশি অনুশীলন করা যায়। পার্থক্য একটাই গুপ্ত ভাস্কর্যের একটি প্রিমিটিভ বা আদিযুগ আছে যেমন মৌর্য, সুঙ্গ, মথুরা, অন্ধ্র। কিন্তু চিত্র যেহেতু বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছিল, তাই সাহিত্যের ওপর নির্ভর করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বুদ্ধের জীবনী ও জাতকের চিত্রই মূলতঃ অজন্তা চিত্রের বিষয়বস্তু।

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের কৃষ্ণা জেলায় কপোতেশ্বর মন্দির, যা আগে চৈত্য হল ছিল; পরে এই বৌদ্ধ চৈত্য ব্রাহ্মণ্য মন্দিরে রূপান্তরিত হয়েছে।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত আইহোল দূর্গা মন্দির, বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দির, নালন্দা বিহারে (সূচনা, গুপ্তযুগে ৪৬৭-৪৭৩ খ্রী. নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য) বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে হুনদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। পরবর্তী গুপ্ত রাজত্ব খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মগধে টিকে ছিল। এরপর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগে স্থানেশ্বর ও কণৌজের হর্ষবর্ধন (খ্রিস্টীয় ৬০৬-৬৪৭) ক্ষমতালাভ করেন ও গুপ্তদের লুপ্ত গৌরব জাগ্রত করেন। অধিকাংশ উত্তর ভারত এবং নর্মদা পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তৃত ছিল।

হর্ষবর্ধনের ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব, সূর্য ও বুদ্ধ এবং এই দেবতাদের জন্য তিনি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে তিনি মহাযান বৌদ্ধমতাবলম্বী হয়ে ওঠেন। হর্ষবধর্নের সমসাময়িক যুগকে গুপ্তোত্তর যুগ বলা হয়, কারণ এই যুগে গুপ্তযুগের ধারাকেই প্রবহমান রাখা হয়েছে। এইসময় ভারতে আগত হিউয়েন সাঙ্‌-এর বিবরণ অনুযায়ী সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধবিহার সমূহ ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় উৎকর্ষের শিখরে অবস্থান করে। R. C. Majumder - এর মতে Indeed the Gupta Sculpture may be regarded as typically Indians and classical in every sense of the term.[৩৩]

গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগে দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা :

মহাবলীপুরম্ : পল্লবরাজাদের শ্রেষ্ঠকীর্তি হল মহাবলীপুরম বা মামল্লাপুরমের মোনোলিথিক মন্দির ও ভাস্কর্য। এটি মাদ্রাজ থেকে ৩৫ মাইল দুরবর্তী, মহাবলীপুরমের পাহাড়ের গায়ে ৯৬ ফুট দীর্ঘ ৪৩ ফুট চওড়া রিলিফের কাজ — বিরাট প্যানোরামা, শিল্পীর বৃহৎ কল্পনায় দেবদেবী, মানুষ, নাগনাগিনীর চিত্র, গঙ্গাবতরণের দৃশ্য, অর্জুনের তপস্যা এছাড়াও নানান পশুর রিলিফ পাওয়া যায়।

চিত্রসংখ্যা : ৪৪

গঙ্গাবতরণের দৃশটি এইরূপ : পাহাড়ের গায়ের ফাটলের দুই দিকে প্রার্থনারত মানুষের মূর্তি খোদাই করা, শিবের উপস্থিতি, নাগনাগিনীর মূর্তি, মন্দির, সাধু-তপস্বীর মূর্তি, হাতির মূর্তি খোদিত।

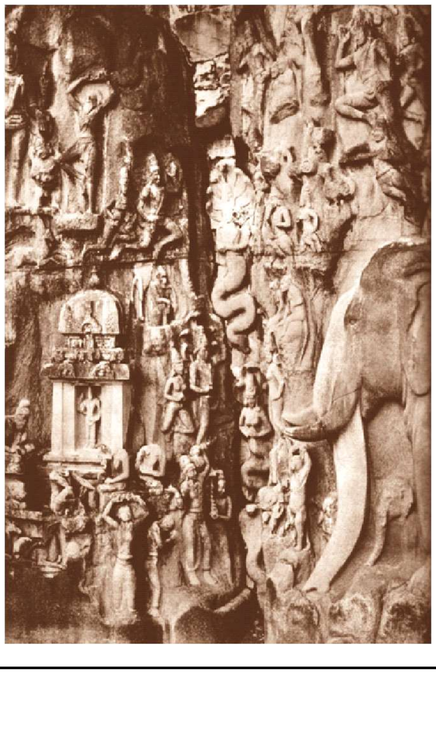

চিত্রসংখ্যা : ৪৫

পঞ্চপাণ্ডবের নামে পাঁচটি রথমন্দির প্রস্তরখণ্ড খোদাই করে নির্মিত, যাতে পল্লব বা দ্রাবিড় স্থাপত্যের শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। এখানে দৌপদীর রথ বাংলার চালার ন্যায়, গণেশ রথ বৌদ্ধ চৈত্যের ন্যায়।

এছাড়াও বরাহগুহায় বরাহঅবতার, বামন অবতার, সূর্য, দূর্গা এবং দুই রাণীর সঙ্গে মহেন্দ্রবর্মণের মূর্তি এবং সিংহবাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দূর্গার তেজস্বী মূর্তি আছে। বিভিন্ন পশুর মূর্তি বানর, হাতির মূর্তি উল্লেখযোগ্য।

চালুক্যশাসনাধীনে দক্ষিণ ভারতে গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পকলা : রাজপুত বংশোদ্ভব প্রথম পুলকেশী (খ্রিস্টীয় ৫৫০-৫৬৬) বিজাপুর জেলার বাতাপি (বাদামী) নগরে

চিত্রসংখ্যা : ৪৬

রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি হর্ষবর্ধনকে বিতাড়িত ও কাঞ্চীর রাজা মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করেন। ৬৪২ খিস্টাব্দে নরসিংহবর্মণ কর্তৃক দ্বিতীয় পুলকেশী নিহত হন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬ খ্রিস্টাব্দ) ৭৪০ খিস্টাব্দে পল্লব রাজধানী কাঞ্চীপুরম জয় করেন। যদিও ৭৫৩ খিস্টাব্দে চালুক্যগণ রাষ্ট্রকুট রাজাদের কাছে পরাজিত হন।

চিত্রসংখ্যা : ৪৭

চালুক্য শাসনাধীনে উল্লেখযোগ্য শিল্প নিদর্শন হল - আদি চালুক্য মন্দির, বাদামির শিবালয়, যা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত। শ্রেষ্ঠ মন্দির হল পট্টদকলের বিরূপাক্ষ মন্দির - যা শিব বা লোকেশ্বরের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাণী কর্তৃক উৎসগীকৃত। কাঞ্চীপুরম জয়ের কালে ৭৪০ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়। এই

চিত্রসংখ্যা : ৪৮

মন্দিরটিতে পল্লব প্রভাব দেখা যায়। কাঞ্চীপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরের আদর্শে এটি নির্মিত। কুমারস্বামী এই মন্দির সম্বন্ধে বলেছেন – 'One of the noblest structure of India.'[৩৪] - Coomaraswamy, Ananda K., History of Indian and Indonesian Art, New York, 1959.

দক্ষিণভারতীয় গুহামন্দির : গুপ্তশিল্পের প্রভাব কেবল উত্তর ভারতে আবদ্ধ ছিল না, দক্ষিণ ভারতেরও তা বিস্তারলাভ করেছিল গুপ্তরাজাদের আনুকূল্যে। দাক্ষিণাত্যের গুহামন্দির ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় তার প্রভাব সুস্পষ্ট।

গুপ্তযুগের শিল্পের সঙ্গে গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পের পার্থক্য দেখা যায়। গুপ্তযুগ ছিল বৌদ্ধধর্মকেন্দ্রিক তাই তৎকালীন মূর্তিগুলির মধ্যে আছে শান্ত ও স্থিতিশীল একটা ভাব। আর, গুপ্তোত্তর বা গুপ্ত পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় মূর্তি ভাস্কর্য পাওয়া গেলেও সেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় শিল্পই প্রবল, তাই তৎকালীন শিল্পরীতি গতিশীল ও পৌরুষভাবাপন্ন। এর কারণ ব্রাহ্মণ ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিষয়ের মতো শান্ত নয়। গুপ্তোত্তর যুগের শিল্পরীতি মূলতঃ গুপ্ত ও মধ্যযুগের শিল্পের মধ্যবর্তী সময়ের। এই সময় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কমে আসার ফলে, হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মণ্যধর্মের উৎকর্ষতাই গুহা ভাস্কর্যকে উন্নত করেছে। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক থেকে অষ্টম শতক হিন্দুভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ সময় বলা যায়। এই সময়ের আগে বা পরে গুহামন্দির দেখা যায় না। ভারতে গুহামন্দির হল বৌদ্ধধর্মাশ্রিত, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে হিন্দুরা প্রচুর পরিমাণে বৌদ্ধদের থেকে গ্রহণ করেছে।

ঔরঙ্গাবাদে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর, চালুক্য শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ বেশ কয়েকটি গুহা আছে, যেগুলিতে নানানদৃশ্য রিলিফের আকারে বর্ণিত, তাদের মধ্যে অন্যতম হল – মাতাল দলের দৃশ্যের ভাস্কর্য। বোম্বাই রেসিডেন্সির অন্তর্গত বিজাপুর জেলায় বাদামি গুহা অবস্থিত, যা চালুক্য সম্রাট প্রথম পুলকেশীর (খ্রি. ৫৫০-৫৬৬) সময়ে নির্মিত; এই গুহার শিল্প খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর চালুক্য শিল্পরীতিকে নির্মিত। এই গুহায়

৩নং গুহার বিষ্ণুমূর্তি উল্লেখযোগ্য। অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট বিষ্ণু ও নরসিংহ মূর্তি আছে।

নিজাম রাজ্যে অবস্থিত খ্রিস্টীয় সপ্তম থেকে অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত ইলোরার ভাস্কর্য ভারতীয় শিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গুহাগুলির মধ্যে ১৭টি বৌদ্ধগুহা, ১৭টি ব্রাহ্মণ্যধর্মের গুহা, বাকি সব জৈন গুহা। চালুক্য আমলে নির্মিত (খ্রি. ৬৫০-৭৫০) রামেশ্বরে চারহাতযুক্ত শিবের নৃত্যপরায়ণ মূর্তি আছে, যা বিরাটশক্তি ও গতির নিদর্শন। বারান্দার স্তম্ভে আছে নগ্ন বৃক্ষকার মূর্তি, গঙ্গা-যমুনার মূর্তি।

চিত্রসংখ্যা : ৪৯

দশঅবতার গুহায় শৈব ও বৈষ্ণব উভয় বিষয়ের শিল্পকর্ম আছে। এখানে ভৈরব, কালী ও হিরণ্যকশিপুর মূর্তি লক্ষ্যনীয়।

বিশ্বকর্মা গুহা মূলতঃ (৬০০ খ্রিস্টাব্দ) বৌদ্ধচৈত্য বিশেষ, এখানে বুদ্ধের মূর্তি বিশ্বকর্মা নামে সুপরিচিত। বিশ্বকর্মা মূলতঃ সূত্রধরদের দেবতা। ইলোরার গুহাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল কৈলাসনাথ মন্দির, যার নির্মাতা রাষ্ট্রকুট সম্রাট দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৭-৯১৩ খ্রিস্টাব্দ)। এটি পৃথিবীর মধ্যে বিস্ময়কর শিল্পনিদর্শন। এই দ্রাবিড় পদ্ধতির মোনোলিথিক মন্দিরের দেওয়ালে মকরবাহিনী গঙ্গা ও কচ্ছপবাহিনী যমুনার মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরগাত্রে রাবণকর্তৃক কৈলাস পর্বত উত্তোলনের দৃশ্য খোদিত আছে।

অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত বোম্বাই-এর নিকটবর্তী হস্তীগুম্ফার বিরাটকার ত্রিমূর্তি হল ভারতীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ মূর্তি। এখানে যে ধ্যানী শিবের মূর্তি, তা দেখে মনে হল বুদ্ধ যেন শিবের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এলিফ্যান্টা গুহাও উল্লেখযোগ্য।

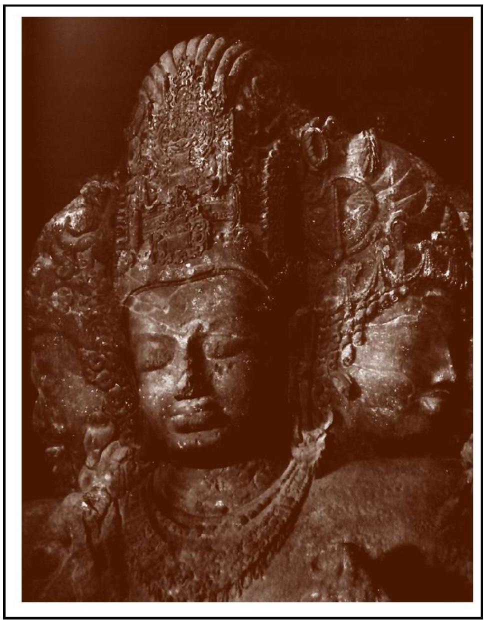

চিত্রসংখ্যা : ৫০

গুপ্তরাজত্বের অবসানে গুপ্তযুগীয় শিল্পধারা পরবর্তী পালযুগের (খ্রি. ৮ম-১২দশ শতক) চিত্র ও ভাস্কর্যের মধ্যে পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। পরবর্তী উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের চিত্র ও ভাস্কর্যে গুপ্তরীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্তযুগ এক ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী, যে ঐতিহ্য গুপ্তযুগে শুরু হয়ে গুপ্তযুগের সীমানা ছাড়িয়ে গুপ্তোত্তর ভারতের শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছিল। গুপ্ত শিল্পধারা তাই ভারতীয় শিল্পের মধ্যে যেন সদা বিরাজমান। তাই গুপ্তযুগের শিল্পকলা নিছক কোনো প্রদেশের বা নির্দিষ্ট রাজন্যবর্গের অধীনস্থ শিল্পরীতি নয়, তা সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ল্যাসিকালযুগের শিল্প।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*. 1985, পৃ. ৩-৫।

২। *তদেব,* পৃ. ১৯।

৩। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত,* ২০১২, পৃ. ১৭।

৪। Vincent Smith : *The Early History of India*. 1962, পৃ. ৩২।

৫। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত,* ২০১২, পৃ. ১৮।

৬। Vincent Smith : *The Early History of India*. 1962, পৃ. ১৬৫।

৭। মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, *শিল্পে ভারত ও বহির্ভারত,* ২০১২, পৃ. ২০।

৮। Vincent Smith : *The Early History of India*. 1962, পৃ. ১৬৭।

৯। *তদেব,* পৃ. ১৬১।

১০। *তদেব,* পৃ. ১৯৫।

১১। *তদেব,* পৃ. ১২৪।

১২। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*. 1985, পৃ. ৪৭।

১৩। J. C. Harle : *The Art and Architecture of the Indian Subcontinent.* 1986, পৃ. ৯৯১।

১৪। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*. 1985, পৃ. ১১৮।

১৫। Vincent Smith : *The Early History of India*. 1962, পৃ. ২০৯।

১৬। *তদেব,* পৃ. ২০৯।

১৭। *তদেব,* পৃ. ২১০।

১৮। E. B. Havell : *The Art Heritage of India* . 1964, পৃ. ৩৭।

১৯। Jemes Fergusson : *History of Indian and Eastern Architecture, Vol. I* . 1891, পৃ. ৪৭।

২০। *মালবিকাগ্নিমিত্র*, ৩.১১।

২১। Stella Kramrisch : *Indian Sculpture* . 2013, পৃ. ৩২।

২২। *তদেব*, পৃ. ৩৩।

২৩। J. C. Harle : *The Art and Architecture of the Indian Subcontinent.* 1986, পৃ. ৮৯।

২৪। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*, প্রতিমালক্ষণম্, ৩.৪৭।

২৫। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India* . 1985, পৃ. ১৪২।

২৬। E. B. Havell : *Indian Sculpture & Painting. Ed. John Murray* . 1908, পৃ. ২০৮।

২৭। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India* . 1985, পৃ. ১৭।

২৮। Ananda K. Coomaraswamy : *History of Indian and Indonesian Art* . 1959, পৃ. ৫২।

২৯। E. B. Havell : *The Art Heritage of India* . 1964, পৃ. ৩৬।

৩০। Vincent Smith : *History of Fine Art in India and Ceylon* . 1962, পৃ. ৭৩।

৩১। Ananda K. Coomaraswamy : *History of Indian and Indonesian Art* . 1959, পৃ. ২৩।

৩২। G. Yazdani : *Ajanta Text* . 1930, পৃ. ৫।

৩৩। R. C. Majumder : *Ancient India* . 1952, পৃ. ২৩৩।

৩৪। Ananda K. Coomaraswamy : *History of Indian and Indonesian Art* . 1959, পৃ. ৩৬।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায় রস, রীতি, ধ্বনি প্রয়োগ ঃ

ক) চিত্রকলা

খ) ভাস্কর্য

(ক) চিত্রকলা

বাৎসায়নের কামসূত্র গ্রন্থে চৌষট্টি প্রকার কলার অন্যতম কলা হল আলেখ্য (চিত্রকলা)।

গীতং বাদ্যং নৃত্যং আলেখ্যং বিশেষকশ্চদম্ ইত্যাদি।[১]

সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সঙ্গে চিত্রকলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, নাটকাদিতে চিত্রকলার প্রদর্শন ঘটে। গুপ্তযুগে রচিত *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণের* তৃতীয় খণ্ডে 'চিত্রসূত্র'-এর উল্লেখ আছে[২]। *বিষ্ণুধর্মোত্তরে* বজ্রের প্রতি মার্কণ্ডেয়ের উক্তি থেকে জানা যায় যে, চিত্রবিদ্যার আদি গ্রন্থ হল 'চিত্রসূত্র'। চৌষট্টি কলার মধ্যে অন্যতম চিত্রকলা যা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুবর্গ ফলের প্রদায়ক এবং চিত্র যে গৃহে স্থাপিত হয়, সেখানে মঙ্গল বিধান করে —

কলানাং প্রবরং চিত্রং ধর্মকামার্থমোক্ষদম্।
মঙ্গল্যং প্রথমং বৈ তদ্ গৃহে যত্র প্রতিষ্ঠিতম্।।[৩]

চিত্রের সঙ্গে দৃশ্যকাব্যের সম্পর্ক আছে। কারণ, চিত্রের সঙ্গে নৃত্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। মার্কণ্ডেয় মুনি বলেছেন - নৃত্যের ন্যায় চিত্রেরও ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি হয়ে থাকে। সুতরাং মহানৃত্যে যেরূপ দৃষ্টি, ভাব, অঙ্গোপাঙ্গ ও হস্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, চিত্রেও সেইরূপ নিয়ম খাটে। নৃত্যকে 'পরমচিত্র' বলা হয়েছে। দৃশ্যকাব্যে নৃত্যের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে।

যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টয়শ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্বশঃ।।
করাশ্চ যে মহানৃত্যে পূর্বোক্তা নৃপসত্তম।
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্যং চিত্রং পরং স্মৃতম্।।[৪]

নৃত্য, গীত, বাদ্য ও চিত্রকলার প্রয়োজন হয় নিজের চিত্তবিনোদন ও অন্যের অনুরাগ জন্মানোয়।

এতানি পরানুরাগ জননান্যাত্মবিনোদনার্থনিচ।[৫]

তৎকালীন যুগে চিত্রশিল্পচর্চার উদ্ভব হয়েছিল ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কোনও ধর্মীয়তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে ধর্মীয় মাহাত্ম্যকে প্রকাশ করার জন্য এবং ধর্মনিরপেক্ষভাবে জনসাধারণ বা রাজার মনোরঞ্জনের জন্য। সেক্ষেত্রে রাজদরবার প্রভৃতিকে চিত্র প্রদর্শনের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হতো। কাজেই নিছক শিল্পের জন্য শিল্প যা বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে দেখা যায়, তা ভারতবর্ষে কখনোই ছিল না।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে ও *অভিনয়দর্পণে* চিত্রশিল্পকে নৃত্যাদির পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* বলা হয়েছে —

বিনা হি নৃত্যশাস্ত্রেণ চিত্রসূত্রং সুদুর্বিদম্।[৬]

অর্থাৎ, নৃত্যশাস্ত্রের জ্ঞান ছাড়া চিত্রসূত্রের জ্ঞান হওয়া কখনোই সম্ভব নয়। নৃত্যের উদ্ভবের বহু পরে চিত্র এসেছে। নৃত্যের অঙ্গভঙ্গীগুলি চিত্রে হুবহু অনুসৃত হয়েছে। মানুষের ভাব নৃত্যাকারে প্রকাশিত হওয়ার পরে তা চিত্রে স্থানলাভ করে। নৃত্যের সঙ্গে অভিনয়ের যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রয়েছে তা নন্দিকেশ্বর তাঁর *অভিনয়দর্পণ* গ্রন্থে বলেছেন — যাঁরা অভিনয়ের সঙ্গে পরিচিত নন তাঁরা কখনোই নৃত্যভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হতে পারে না। অভিনয়ই সম্ভবত নৃত্যশিল্পের উৎস।[৭]

একজন ব্যক্তি যদি যদি অভিনয় দক্ষ হন তাহলেই তিনি সুদক্ষ চিত্রশিল্পী হতে

পারেন। তবেই বিভিন্ন ভাবভঙ্গীর মানসিক প্রতিক্রিয়া যথাযথভাবে ভাব অনুযায়ী ব্যক্ত করতে পারেন। একমাত্র অভিনয়ের জ্ঞানই ঐ ভাবভঙ্গীকে সুচারুভাবে চিত্রে প্রতিবিম্বিত করে। এ বিষয়ে আচার্য ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্রে* বলেছেন —

ন তজ্জ্ঞানং ন তচ্ছিল্পম্ ন সা বিদ্যা ন সা কলা।
ন স যোগো ন তৎকর্ম নাট্যে'স্মিন্ যন্ন দৃশ্যতে।। [৮]

অর্থাৎ, এমন কোন জ্ঞান, শিল্প, কলা, বিদ্যা বা কর্ম নেই যা নাটকে দৃষ্ট হয় না, নাটকই সব কলার আধার।

আচার্য বামনের মতে, নাটক প্রভৃতি দশরূপক সৌন্দর্যের দিক থেকে সবচেয়ে বেশী উপাদেয়, কারণ চিত্রের সমস্ত বৈশিষ্টসমূহ এই দশরূপকে বর্তমান —

সন্দর্ভেষু দশরূপক শ্রেয়ঃ তদ্ধি চিত্রং চিত্রপটবিশেষসাকল্যাৎ। [৯]

'চিত্র' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল — *চীয়তে ইতি চিত্রম্।* [১০] চিত্রকর বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ উভয়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ্য চয়ন করেন, রূপ, প্রমাণ, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক পরিণতি যে চিত্তহরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমালা তাই চিত্র। আবার চিত্তম্ রীতি ইতি চিত্র অর্থাৎ যা আমাদের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে তাই চিত্র।

প্রাচীন ভারতে, বিশেষতঃ গুপ্তযুগে চিত্রকলা নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। বাৎসায়নের কামসূত্র থেকে জানতে পারি, শিষ্ট ব্যক্তিদের গৃহে একটি করে চিত্রপট ও তুলিকা প্রভৃতি ছবি আঁার সরঞ্জাম থাকতো। এছাড়া *রামায়ণ, মহাভারত,* পালি বৌদ্ধ সাহিত্য, সংস্কৃত নাটক, কাব্য - সর্বত্রই এই চিত্রবিদ্যার জনপ্রিয়তার প্রমাণ রয়েছে। *অভিজ্ঞান-শকুন্তল*-এ দুষ্যন্ত, *কুমারসম্ভব*-এ পার্বতী, *মৃচ্ছকটিক*-এর বসন্তসেনাকে যেমন প্রেমের আবেগে ছবি আঁকতে দেখি, তেমনি হর্ষচরিতের যমপটুয়াকে (যমপট্টিক) জীবিকা অর্জনের জন্য রাজধানীর পথে পরলোকে ছবি আঁকা পট দেখিয়ে গান করে বেড়াতেও দেখি।

চিত্রশিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন রকম কিংবদন্তী ও কাহিনী প্রচলিত আছে। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে* এ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বিবরণে জানা যায় - নারায়ণ মুনি লোকসমূহের হিতকামনায় আম্ররসের সাহায্যে পরম রূপবতী উর্বশীর ছবি এঁকেছিলেন —

নারায়ণেন মুনিনা লোকানাং হিতকাম্যয়া
প্রাপ্তানাং বঞ্চনার্থায় দেবস্ত্রীণাং মহামুনিঃ।
সহকাররসং গৃহ্য উর্ব্যাঞ্চক্রে বরস্ত্রিয়ম্।
চিত্রেণ সা ততো জাতা রূপযুক্তা বরাপ্সরাঃ।। [১১]

সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রশিল্পের বিশদ আলোচনা পাওয়া যায়। সেখানে চিত্রের বৈশিষ্ট্য, চিত্রের অঙ্কণ প্রণালী, চিত্রের রসবোধ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* নাটকে কালিদাস চিত্রশিল্পের এক বিশেষ দিক সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন —

যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যাঃ লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্।। [১২]

অর্থাৎ, একটি চিত্রে শুধুমাত্র প্রকৃতির অনুকরণই থাকে না বরং প্রকৃতির মধ্যে যে অপূর্ণতা থাকে তা দূর করে চিত্রকে উপস্থাপিত করা উচিত। কালিদাস দুষ্যন্তের মুখে এই শাশ্বত চিত্রকথাটি তুলে ধরেছেন। তিনি দুষ্যন্তকে চিত্রশিল্পী ও সমালোচক উভয়রূপের অঙ্কণ করেছেন। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করে দুষ্যন্ত যে বিরহানলে দগ্ধ হচ্ছিলেন, তখন তিনি দহন দূরীকরণের জন্য মনের মধ্যে নিহিত শকুন্তলার চিত্র অঙ্কণ করলেন ও অঙ্কিত চিত্র সম্বন্ধে উক্ত মন্তব্য করলেন। কালিদাস চিত্রের মধ্যে প্রকৃতির হুবহু অনুকরণের বিরোধী। তাঁর মতে সাধারণ চিত্রশিল্পীর কাজ হচ্ছে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে যা কিছু অপূর্ণতা রয়েছে, তা দূর করা। অর্থাৎ চিত্র যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপূর্ণতাকে দূর করতে সমর্থ তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সম্পূর্ণ উপস্থাপন করবে না। বাৎসায়ণ তাঁর কামসূত্রে বলেছেন যে — নাটকাদি শিল্পসমূহ আর কিছুই

নয়, স্বর্গ মর্ত, পাতালবাসীদের আচরণের অনুকরণমাত্র।[১৩] কিন্তু কালিদাস এই ধারণা স্বীকার করেননি। বলা যেতে পারে, কালিদাস পুরোপুরি অনুকরণ তত্ত্বের বিরোধী ছিলেন। Aristotle-এর মতে, *Art is the mode of imitation.*[১৪] যদিও এই যুক্তি কালিদাস-এর ক্ষেত্রে খাটে না।

কালিদাসের রঘুবংশ মহাকাব্যে এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে - পুরোপুরি চিত্রে না থাকলেও তা যেন অবাস্তব না হন। এই বাস্তবতার খাতিরেই তিনি অনুকরণবাহুল্যের কথা বা অনুকরণ সীমার কথা বার বার বলেছেন। অর্থাং চিত্রটি যেন মানুষের কাছে জীবন্ত বলে প্রতিভাবে হয়। একটি চিত্রের উল্লেখ দেখতে পাই - সেখানে দেখানো হয়েছে একটি পানা ভর্তি পুকুরে এক হস্তী স্নান করছে, বিচরণরত একটি সিংহ তাকে যথার্থ মনে করে চিত্রাঙ্কিত হস্তীটিকে আঘাত করছে।

চিত্রদ্বিপা পদ্মবনাবতীর্ণা
করেণুভির্দত্তমৃণালভঙ্গাঃ।
নখাংশুকা ধানবিভিন্নকুম্ভাঃ
সংবদ্ধসিংহপ্রহৃতং বদন্তি।।[১৫]

এখানেই চিত্রের বাস্তবতা এবং শিল্পী কৃতিত্ব। চিত্র এত বেশী সজীব বলে প্রতিভাত হত যে পশুপক্ষীরাও তাকে যথার্থ বলে মনে করত।[১৬]

বার্ণভট্টের *হর্ষচরিত* ও *কাদম্বরী*-তে বলা হয়েছে - চিত্রকলা তৎকালীন যুগে সুন্দরী ললনাদের অবসর বিনোদনের একটি উপায় ছিল। সেখানে বলা হয়েছে, শুভ্রপটে যখন সুন্দরী ললনাগণ লতা, ফুল প্রভৃতি আঁকতেন তখন তাদের হস্তাঙ্গুলি বহুবিধ রঙের দ্বারা রঞ্জিত থাকতো।

বহুবিধবর্ণদিগ্ধাঙ্গুলীভির্গ্রীবা সূত্রাণি চ চিত্রয়ন্তীভিশ্চিত্রপত্রলতা লেখ্যকুশলাভিঃ।[১৭]

দণ্ডীর *দশকুমারচরিতে* চিত্রের রঙ সমন্ধে কিছু বর্ণনা পাই। কল্ক ও নির্যাস নামক গাছের আঠা ও ছাল থেকে রঙ প্রস্তুত করা হত। সেই রঙকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলার জন্য ব্যবহৃত হত বজ্রলেপ নামক এক সংমিশ্রণ।[১৮]

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে বলা হয়েছে — যদি কোন ব্যক্তি প্রভাবিশিষ্ট অগ্নি, ধূম, মেঘ, মৃত ও ঘুমন্ত মানুষের পার্থক্য, নিম্ন ও উচ্চ স্থানের পার্থক্য প্রভৃতি তুলে ধরতে পারেন তিনিই যথার্থ শিল্পী। সাধারণতঃ শিল্পী যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি চিত্রে সম্যকভাবে তুলে ধরতে পারেন, তিনিই যথার্থ শিল্পী। একটি জীবন্ত চিত্র দেখে দর্শকের যেমন মনে হয় চিত্রটি শ্বাস ফেলছে —

তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমবৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্।
সযুগত্যা লিখেদ্ বস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবৎ।।
সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জিতম্।
নিম্নোন্নতবিভাগং চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।।
লসতীব চ ভূলম্বো বিভ্যতীব তথা নৃপঃ
হসতীব চ মাধুর্যং সজীব ইব দৃশ্যতে।।
সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।[১৯]

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে আরও বলা হয়েছে — চিত্র এমনভাবে নির্মিত হবে, তা দেখে যেন সবার ভালো লাগে। চিত্রের মধ্যে রেখা রঙ, বাহ্যভূষণ প্রভৃতির মধ্যে এমন এক সামঞ্জস্য থাকবে যাতে বিভিন্ন দিক দিয়ে চিত্রটিকে বিভিন্নজন দেখলেও যেন তা সবার কাছে সুন্দর বলে প্রতিভাত হয়। কেননা একটি সুন্দর চিত্র বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন রূপে প্রশংসনীয় হয়।

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণামিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরেজনাঃ।।[২০]

অর্থাৎ, একজন বিচক্ষণ শিল্পী সেই শিল্পের রেখা দেখে প্রশংসা করবেন, একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই চিত্রের ভাবের প্রশংসা করবেন, স্ত্রীলোকগণ চিত্রের বাহ্যিক ভূষণের প্রশংসা করবেন এবং বাকি সবাই চিত্রের রঙের প্রশংসা করবেন।

চিত্রকলায় যে রস ও ভাবের প্রাধান্য রয়েছে তা বাৎসায়নের *কামসূত্রের জয়মঙ্গলটীকা*-তে স্পষ্ট। রস ও ভাব চিত্রশিল্পের প্রাণ ও আত্মা। চিত্রের ছটি অঙ্গের প্রসঙ্গ সর্বপ্রথম গুপ্তযুগীয় শিল্পের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।। [২১]

অর্থাৎ, চিত্রে ছটি অঙ্গ থাকবে — রূপভেদ, প্রমাণ, লাবণ্য, ভাবযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

পঞ্চদশী-র চিত্রদীপ প্রকরণে বিদ্যারণ্য মুনি চিত্রপটের অবস্থা চতুষ্টয়ের বিবরণ দিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ ও ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ এর রহস্য নির্ণয় করেছেন। এখানে, চিত্র সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাতে তংকালীন চিত্রকলা সম্পর্কে কিছু ধারণা আমরা পাই। ছবির যেমন চারটি অবস্থা বিদ্যমান ঠিক তেমনি পরমাত্মকারচিৎ, অন্তর্যামী, সুত্রাত্মা ও বিরাট এই চার অবস্থা বিদ্যমান।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্।
চিদন্তর্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্‌চাত্মা তথের্যতে।। [২২]

পঞ্চদশী-তে চিত্রের যে চারটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে -

যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ
স্বতঃ শুভ্রো'ত্র ধৌতঃ স্যাদ্‌ঘট্টিতোহন্নবিলেপনাৎ।
মষ্যকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্‌রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ।। [২৩]

ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত - এই চারটি অবস্থায় চিত্র বর্ণময় হয়ে ওঠে। যখন শুভ্রবর্ণ পটের ওপর চিত্রাঙ্কণ করা হয় সেটি ধৌত অবস্থা। যখন তার ওপর প্রলেপ দিয়ে অঙ্কণের উপযোগী করা হয় সেটি ঘট্টিত অবস্থা। কালো পেনসিলের সাহায্যে যখন চিত্রের বহির্ভাগ বা রেখাচিত্র অঙ্কিত হয় তখন সেটি লাঞ্ছিত অবস্থা এবং সেই চিত্র রঙের সন্নিবেশে যখন পূর্ণাঙ্গরূপ প্রাপ্ত হয় সেটি রঞ্জিত অবস্থা।

পঞ্চদশী-তে বলা হয়েছে — চিত্রপট দু'ধরণের হতে পারে - উন্নত এবং অনুন্নত। উভয়ক্ষেত্রেই মানুষকে অঙ্কিত করা যেতে পারে এবং সেই পোষাকগুলি এমন নিখুঁতভাবে অঙ্কিত হয় যেন মনে হয় সবই সত্য।[২৪]

এইরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে অজন্তা গুহায়। সেখানকার ভিত্তিচিত্রে সুন্দর ও বিচিত্র পোষাক পরিহিত মানুষজনের চিত্র এই কথাই মনে করিয়ে দেয়। অজন্তা ভিত্তিচিত্রের মধ্যে চিত্রগুলি যেন সত্য।

প্রাচীন ভারতবর্ষে চিত্রকলাকে তিনভাবে ভাগ করা হয়েছে - বিদ্ধ, অবিদ্ধ ও রসচিত্র। বিদ্ধচিত্রের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে — *সাদৃশং লিখ্যতে যত্তু দর্পণে প্রতিবিম্ববৎ* অর্থাৎ আয়নায় প্রতিবিম্বের মতো কোন চিত্র যদি বাস্তবের প্রতিফলনমাত্র হয় তাহলে বা বিদ্ধচিত্র। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্* দৃশ্যকাব্যে যখন রাজা দুষ্যন্তকে শকুন্তলার প্রতিকৃতি অঙ্কণ করতে দেখা যায়, তখন এই প্রকার বিদ্ধচিত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার যখন কোন চিত্রে কল্পনার ভাব বেশী থাকে তাকে বলা হয় অবিদ্ধ চিত্র।

আকস্মিকে লিখামীতি সদা তূদ্দিশ্য লিখ্যতে।
আকারমাত্রসংপত্তঃ তদবিদ্ধমিতি স্মৃতম্।।[২৫]

এই প্রকার চিত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ দৃশ্যকাব্যে যখন রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার প্রতিকৃতি অঙ্কনকালে তার চিত্রপটে মালিনী নদীর তীর, কন্বকুনির আশ্রম, হরিণশিশু অঙ্কণ করার কথা ভাবছেন।[২৬]

আবার এমন কিছু চিত্র আছে যা দেখা মাত্রই মানুষের মনের মধ্যে শৃঙ্গারাদি রসের অনুভূতি জেগে ওঠে তাকে বলা হয় রসচিত্র।

শৃঙ্গারাদিরসো যত্র দর্শনাদেবগম্যতে (তৎরসচিত্রম্)।[২৭]

আবার, *অভিলষিতার্থচিন্তামণি* গ্রন্থে বলা হয়েছে, তরল রঙের দ্বারা অঙ্কিত চিত্রকে চিত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ 'রসচিত্র' বলে থাকেন -

সার্দ্রৈর্বর্ণকৈর্লেখ্যং রসচিত্রং বিচক্ষণৈঃ।[২৮]

আবার যখন কোন চিত্র শুকনো রঙের দ্বারা অঙ্কিত হয় তখন তাকে ধুলিচিত্র বা ক্ষণিক বা তাৎক্ষণিক বলা হয়।[২৯]

সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিল্পশাস্ত্রে চিত্রাঙ্কনে নানান কারিগরী দিকের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ ও শিল্পরত্নে চিত্রাঙ্কণের ভূমি, বিভিন্ন প্রকার তুলির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে।[৩০]

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণও চিত্রকলা সম্বন্ধে তাঁদের ধ্যানধারণার কথা বলেছেন। আচার্য বামনের মতে অর্থ দু'প্রকার — অযোনি এবং অন্যচ্ছায়াযোনি। অন্যচ্ছায়াযোনিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন তিনি — প্রতিবিম্ববৎ, আলেখ্যপ্রখ্যবৎ এবং তুল্যদেহিবৎ। এখানে যে আলেখ্য প্রখ্যবৎ বলা হয়েছে তা এথকে চিত্র সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়।

চিত্রকর যেমন চিত্রাঙ্কণ করতে গিয়ে মূলের অবিকল অনুকরণ করেন না, কবিও ঠিক তেমনি অবিকল অনুকরণের বিরুদ্ধে। তুল্যদেহিবৎ বলতে বামন বলতে চেয়েছেন — দুটি সুন্দর আকৃতির মধ্যে যেমন এক সাদৃশ্য অনুভূত হয় ঠিক তেমনি দুটি কাব্যের মধ্যেও সাদৃশ্য থাকতে পারে - তাতে রমনীয়তা ক্ষুন্ন হয় না।[৩১]

আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের মতে — সাদৃশ্য মাত্রই পরিহরণীয় নয়। একই মূলবস্তু কবির লেখনীতে বিচিত্ররসে অভিসিক্ত হয়ে নব নব রূপ পরিগ্রহ করে —

সর্বে নবা ইব আভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ।[৩২]

এই বক্তব্য চিত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটি চিত্রের সঙ্গে অপর একটি চিত্রের সাদৃশ্য থাকতেই পারে, তা বলে তা পরিহার্য নয়। একই মূলবস্তু চিত্রকরের তুলির ছোঁয়ায় বিচিত্র রসে অভিষিক্ত হয়ে নব নব রূপ ধারণ করতে পারে।

আচার্য বামন 'রীতিই যে কাব্যের আত্মা' এই তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন —

যথা বিচ্ছিদ্যতে রেখা চতুরং চিত্রপণ্ডিতৈঃ।
অথৈব বাগপি প্রাজ্ঞৈঃ সমস্তগুণগুম্ফিতা।।[৩৩]

অর্থাৎ, সুনিপুণ চিত্রশিল্পী যেমন রেখাকে ছবির আত্মা বলে উল্লেখ করেছেন ঠিক তেমনি সমস্ত গুণান্বিতা রীতি কাব্যের আত্মা।

আচার্য ভরতমুনি তাঁর *নাট্যশাস্ত্র*-এ বর্ণের বিধি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন যা চিত্রের বর্ণ বা রঙের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ভরতমুনির মতে — কোন বর্ণ আমাদের আনন্দিত করে, কোন বর্ণ বিষণ্ণ করে, কোন বর্ণ বৈরাগ্য জাগায়, আবার কোন বর্ণ অনুরাগ জাগায় - বর্ণের এ সব প্রকৃতি জানলেই তার প্রয়োগ সম্ভব হয়। বিভিন্ন রঙের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হরিৎবর্ণ, পীত ও রক্তবর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন গৌরবর্ণ - এভাবে তিন, চার বর্ণের সংযোগে বহুতর উপবর্ণের সৃষ্টি হয়। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অপরিহার্য এই বর্ণসম্বন্ধীয় তথ্যাবলী ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* থেকে জানা যায়।

বর্ণানাং তু বিধিং জ্ঞাত্বা তথা প্রকৃতিমেব চ। কুর্মাদবঙ্গ রচনাম্।।

সিতপীতসমাযোগঃ পাণ্ডুবর্ণ ইতি স্মৃতঃ।

সিতরক্তসমাযোগঃ পদমবর্ণ ইতি স্মৃতঃ।।

সিতনীলসমাযোগঃ কাপোতো নাম জায়তে।

পীতনীলসমাযোগাদ্ হরিতো নাম জায়তে।।

নীরক্তসমাযোগাৎ কাষয়ো নাম জায়তে।

রক্তপীতসমাযোগাদ্ গৌর ইত্যভিধীয়তে।।

এতে সংযোগজাবর্ণাহ্যপবর্ণাস্তথা পরে।

ত্রিচতুর্বর্ণসংযুক্তা বহবঃ পরিকীর্তিতাঃ।[৩৪]

বহুপ্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় চিত্রের উল্লেখ *রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণে* আছে। কালিদাসের *অভিজ্ঞান-শকুন্তল* ও *মালবিকাগ্নিমিত্র* দৃশ্যকাব্যে আমরা পাই দুষ্যন্ত শকুন্তলার চিত্রাঙ্কন করছেন, মালবিকার ছবি দেখে অগ্নিমিত্র প্রণয়াসক্ত হচ্ছেন। এছাড়াও ভবভূতির *উত্তররামচরিত* দৃশ্যকাব্যে 'চিত্রদর্শন' একটি বিশেষ চিত্র সম্ভারকে নির্দেশ করছে। *মালতীমাধবে* মালতী ও মাধব পরস্পরের ছবি আঁকছেন। শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণে বসন্তসেনা চারুদত্তের চিত্রাঙ্কন করছেন। এইভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে চিত্রের বহু দৃষ্টান্ত আছে।

এইসব চিত্রের অধিকাংশই প্রতিকৃতি এবং চিত্রগুলি প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের রীতিই হল যে তাতে প্রতিকৃতি চিত্রাঙ্কণের উল্লেখ থাকবে। নায়ক-নায়িকারা যখনই বিরহকাতর, তখনই তাঁরা চিত্রফলক নিয়ে বসেন ও প্রণয়িনী বা প্রেমাস্পদের প্রতিকৃতি আঁকেন অথবা অন্যের প্রতিকৃতি দর্শনে প্রেমমুগ্ধ হন এবং পরে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এর থেকে অনুমিত হয় চিত্রকলা অতি প্রাচীন এক শিল্পরীতি। যদিও অজন্তা বা বাঘগুহা ছাড়া প্রাচীন চিত্রশিল্পের নিদর্শন আমরা কিছুই পাই না। কালের গর্ভে তা বিলীন হয়ে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের চিত্রের পর আমাদের কাছে চিত্রশিল্পের একমাত্র নিদর্শন হল অজন্তার গুহাচিত্র, বাঘগুহাচিত্র এবং সিংহলের সিগিরিয়ার চিত্রগুলি। এদের মধ্যে অজন্তা ও বাঘগুহার চিত্রগুলি গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার নিদর্শন।

গুপ্তযুগে চিত্রিত অজন্তা গুহাচিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুপ্তযুগের প্রভাব কেবল উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, দাক্ষিণাত্যের চিত্র ও ভাস্কর্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। অজন্তাচিত্র প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার এক ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। অজন্তার সর্বমোট ২৯টি গুহার মধ্যে ১, ২, ১১, ১৬, ১৭, ১৯, ২১ এই গুহাগুলি ও গুপ্ত ও গুপ্তোত্তরযুগে চিত্রিত হয়েছিল। অজন্তা চিত্রের মধ্যেই প্রথম চিত্রের পরিপূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে যেমন ভারতীয় ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছে, অজন্তার চিত্রেরও বিকাশ ঘটেছে এই সময়। গুপ্তযুগের একই আদর্শ ভাস্কর্য ও চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুতঃ দুটি শিল্পকে পাশাপাশি অনুশীলন করা যায়।

বৌদ্ধসংঘের জন্য ব্যয়ভার গ্রহণ করে তৎকালীন রাজারা খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত গুহাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। অজন্তার চিত্রাঙ্কণ চলেছিল রাজানুগ্রহে, তাই স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা অপূর্বরূপ লাভ করেছিল। কুমারস্বামী একে দরবার চিত্রের সঙ্গে (Court Painting) তুলনা করেছেন।[৩৫] এই সময় উত্তর ভারতীয় শিল্পরীতি দক্ষিণভারতে প্রসারলাভ করেছিল ফলতঃ গুপ্তদের শিল্পরীতি দক্ষিণভারতে প্রসারলাভ করেছিল। সেইদিক থেকে অজন্তা চিত্রশিল্পের রীতি মূলতঃ গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতেই চিত্রিত হয়েছিল। অজন্তার চিত্রে রেখাই প্রাণ, এই রেখাপ্রধান শিল্পরীতি গুপ্তযুগীয় রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। অজন্তা চিত্র ভাব প্রধান, তার কারণ বৌদ্ধ সাহিত্য জাতকের কাহিনী থেকে বিষয় ভিত্তিক চিত্রাঙ্কণ করা হয়েছে।

অজন্তার চিত্ররীতিকে Narrative Style বলা হয়। কাহিনীভিত্তিক চিত্র অজন্তাচিত্রে ব্যক্ত হয়েছে। গুপ্তযুগীয় চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছিল *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, শিল্পরস-* প্রভৃতি শিল্প শাস্ত্রগুলিকে অনুসরণ করে। অজন্তা চিত্রের একটা বড় অংশ নারীচিত্র। শিল্পী নারীকে নান ভঙ্গীতে, নানা সৌন্দর্যে, নানা অবস্থায় এঁকেছেন। নারী মাতৃরূপে, রাজ্ঞীরূপে, প্রণয়িণীরূপে, পূজারিণীরূপে, নর্তকীরূপে, দাসীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিটি চিত্রই ভাবপ্রধান। তাই চিত্রের মধ্যে শৃঙ্গার, করুণ, অদ্ভুত প্রভৃতি রসের সমাগম ঘটেছে। গুপ্তযুগের সাহিত্যের আদর্শে এই শিল্প সৃষ্টি হয়েছে। কারণ গুপ্তযুগে সাহিত্য ও চিত্রকলা পাশাপাশি চলেছে, তাই চিত্রকে বুঝতে গেলে সাহিত্যকে অনুধাবন করতে হয়।

তাই অজন্তা চিত্রের ভাষা বুঝতে গেলে গুপ্তযুগের আদর্শকে বুঝতে হবে। গুপ্তযুগের সাহিত্যের ভেতরেও এই আদর্শ ফুটে ওঠে। সাহিত্যে যেমন কমলানন, করকমল, চরণকমল, চম্পক অঙ্গুলি, হরিণনয়ন, সিংহকটি শিল্পেও তাই। সাহিত্যে যেমন আমরা *উপমা কালিদাসস্য* বলে থাকি, অর্থাৎ ভারতীয় কাব্যে যে উপমা স্থান পেয়েছে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে সেই উপমার তত্ত্ব লক্ষ করা যায়। কালিদাসের শ্লোকে যেভাবে পাবর্তীর বর্ণনা পাই, অজন্তার নারী সৌন্দর্যের আদর্শও তাই —

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং
বাসো বসানা তরুণার্করাগম্।
পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।।[৩৬]

অজন্তা শিল্পকলায় পুরুষচিত্রের সৌন্দর্য কল্পনা করা হয় কালিদাসের *ব্যূঢোরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজ* — এই শ্লোকানুযায়ী। অজন্তা চিত্রে যেহেতু মানুষ প্রধান, তাই তা স্পষ্টভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। অজন্তার চিত্রকলায় প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রগুলির প্রভাব সুস্পষ্ট। বিশেষতঃ *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, চিত্রলক্ষণ* এবং *ষড়ঙ্গসূত্র* — এগুলি অনুযায়ী শিল্পীরা অজন্তার ছবি এঁকেছিলেন। শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে — *মুখম্ বর্তুলাকারম্ কুক্কুটাণ্ডাকৃতি* — অর্থাৎ ললাট হবে ধনুকের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকার। ভ্রুযুগল হবে নিম্বপত্রাকার ও ধনুকাকার। চোখ নানান প্রকারের খঞ্জন-নয়ন, হরিণ-নয়ন, কমল-নয়ন, পদ্ম-পলাশ নয়ন ইত্যাদি। অধর হবে বিম্বফলের ন্যায়, চিবুক হবে আম্রবীজের মতো। অঙ্গুলী হবে শিম্বফলের মতো — এরকম সৌসাদৃশ্য অজন্তা চিত্রবলীতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট যুগবিভাগের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার সুবিস্তৃত ক্ষেত্রটির খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের শিল্পকলাকে স্থির করা হয়েছে, কারণ এই সময়কাল ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগকেই সূচিত করে। গুপ্তযুগে সাহিত্য ও শিল্পকলা পাশাপাশি

উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। গুপ্তোত্তর যুগকে গুপ্তযুগের ধারাবাহিক সময়কাল রূপে চিহ্নিত করা যায়।

গুপ্তযুগের চিত্রকলার প্রধান নিদর্শন হল — অজন্তার গুহাচিত্রগুলি। এই চিত্রগুলি জগৎ বিখ্যাত এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্প। অজন্তা গুহাচিত্রে চিত্রের পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটেছে। অজন্তার চিত্র টেকনিকে, পরিকল্পনায়, বিষয়-বিন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। গুপ্তযুগে যেমন ভারতীয় ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটেছে, এই একই সময়ে অজন্তার চিত্রেরও বিকাশ ঘটেছে। গুপ্তযুগের একই আদর্শ ভাস্কর্যে ও চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

অজন্তা গুহাচিত্রের কয়েকটি নিদর্শন বর্ণনা করা হল, যেখানে রস, রীতি ও ধ্বনি-র সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায় ঃ

বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুল, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং - ১৭ ঃ

অজন্তা গুহাচিত্রের অন্যতম চিত্র বুদ্ধদেব, যশোধরা ও রাহুল যা গুপ্ত শিল্পরীতির পরিচায়ক। সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁর জন্মভূমি রাজপ্রাসাদে ভিক্ষায় এসেছেন, তাই যশোধরা পুত্র রাহুলকে নিয়ে রাজদ্বারের বাইরে এসেছেন। বুদ্ধের গ্রীবাভঙ্গী যশোধরা ও রাহুলের দিকে আনত, দক্ষিণ হস্তে ভিক্ষাপাত্র, বামহস্তে চীবরের প্রান্তদেশ ধরে আছেন। মস্তকের পেছনে শিরচক্র বা হ্যালো। পেছনে উড়ন্ত বিদ্যাধর মস্তকে ছত্রধারণ করে আছেন। এই আলেখ্যটিতে গুপ্তশিল্পরীতির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষ কতগুলি রঙের ব্যবহার অজন্তা চিত্রকে অনান্য চিত্র থেকে পৃথক করেছে। অজন্তা চিত্র যে রেখা প্রধান সে বিষয়টিও এখানে ধরা দিয়েছে।

চিত্রের মধ্যে বুদ্ধদেবকে বৃহৎ আকারে দেখানো হয়েছে, সে তুলনায় যশোধরা ও রাহুল ক্ষুদ্রাকৃতির। এই চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — জ্যোতিস্তম্ভ বিরাট পুরুষের কাছে যশোধরার আজ কত ছোট মনে হয় নিজেকে। শিল্পী তাই মহান ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে বুদ্ধদেবকে বিরাট করে রূপ দিয়েছেন এবং পার্শ্বমূর্তি যশোধরা ও

রাহুলকে সে তুলনায় যথাভাব প্রকাশার্থে অনেক ছোট করে চিত্রিত করেছেন। যশোধরা সেই বিরাট পুরুষের দিকে সশ্রদ্ধনয়নে চেয়ে আছেন অনিমেষে। হৃদয়ের গভীরে যে বিরহব্যথা এতকাল বিদ্ধ হয়ে আছে সেই ব্যথার সুর ও ঝঙ্কৃত তাঁর নেত্রে। ওষ্ঠের

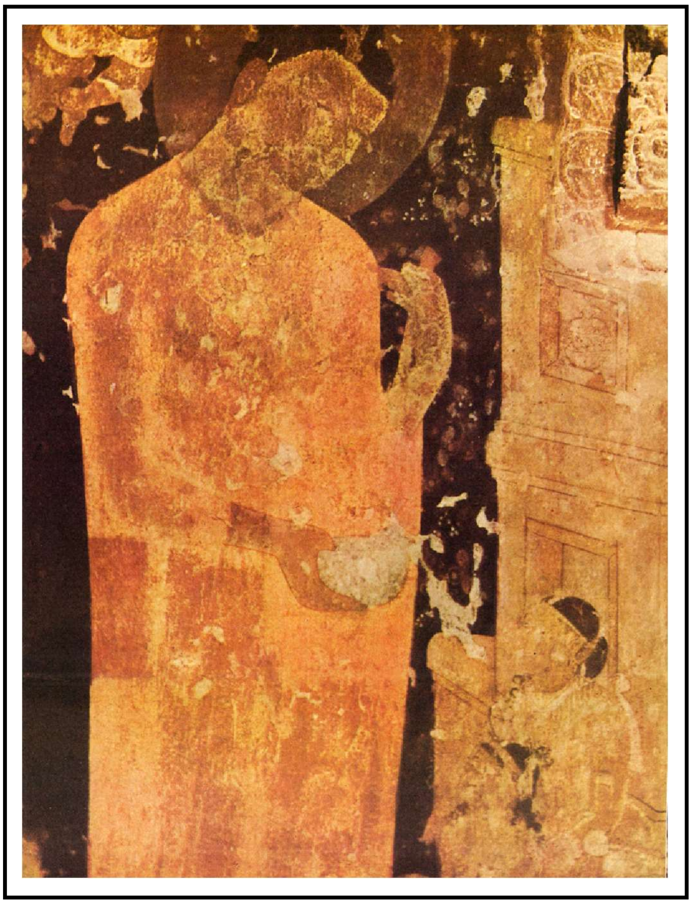

চিত্রসংখ্যা : ৫১

কোনে ক্ষীণ হাস্যরোখা কিন্তু তাও বিষাদময়। পুত্র রাহুলকে তিনি হারাতে চান না, তাই মাতা যশোধরার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলী বিন্যাস রাহুলের দক্ষিণ বাহুমূলে স্থাপিত করে নিজের দিকে আকর্ষণের ভাবদ্যোতক করে শিল্পী এঁকেছেন। শিল্পী অপরূপ রূপে মাতার দুই হস্ত স্থাপন ব্যঞ্জনায়, অঙ্গুলীর অর্থপূর্ণ বিন্যাসে, মাতৃহৃদয়ের মমতাময় সন্ধিগ্ধতার অন্তরভাবটি ব্যক্ত করেছেন। রাহুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে, ওষ্ঠে তার সরল হাস্যরেখা। হ্যাভেল সাহেব মাতা-পুত্রের এই চিত্রটিকে পাশ্চাত্বের

গিয়োভানি বেলিনির মাতৃমূর্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৩৭] মাতা ও বধূ এই দুটি চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ যশোধরার ভঙ্গীতে বহুবিধ ভাবের অনুরণন দেখা যায়। একাধারে মর্মস্পর্শী করুণ, পরম বিস্ময়, গভীর শ্রদ্ধা, অনুপম প্রেম আবার নিবিড় বাৎসল্যরসের সমাবেশ ঘটেছে। এমন মাতা-পুত্রের ভাবঘন চিত্র দুর্লভ। চিত্রটিতে করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

মহাজনকের অভিষেক - মহাজনক-জাতকের অংশ অজন্তা গুহাচিত্র, আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী। গুহা নং ১।

অজন্তা চিত্রগুলির মধ্যে ১নং গুহায় মহাজনক জাতকের চিত্রকথা অঙ্কিত হয়েছে। অলংকরণের দিকে থেকে বিচার করলে এটি শ্রেষ্ঠ আলেখ্য। এই গুহার

চিত্রসংখ্যা : ৫২

নির্মাণকাল নিয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত। জেমস্ ফার্গুসন ও জেমস বার্জেস- এর মতে এটি সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত।[৩৮] ড. ইয়াজদানী এটিকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বলে অনুমান করেছেন।[৩৯]

কারুকার্যমণ্ডিত অভিষেকশালায় রাজ-অভিষেকের আড়ম্বতা এখানে চিত্রিত হয়েছে। মন্ত্রঃপুত পবিত্র স্নানের দৃশ্যটি এখানে চিত্রিত। অভিষেক চিত্রপটে দেখা যাচ্ছে — বিশালবক্ষ মহাভুজ মহাজনক অভিষেকআসনে উপবিষ্ট মুখে বিষন্নভাব। ড. ইয়াজদানী এ সম্পর্কে বলেছেন — 'রাজার কিছুটা বিষন্নভাব এবং তাঁর বামহস্তের অঙ্গুলিপুঞ্জ দিয়ে যে মুদ্রাটি রচনা করেছেন তাতে ঐতিহ্যগতভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, রাজকীয় জীবনযাত্রার মাঝে প্রলোভনে এখনই তাঁর মন বিমূঢ়'।[৪০] এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল - চিত্রে রাজার মুখভাবে বিষন্নতার পরিবর্তে চিন্তাগ্রস্ততাই প্রকট।

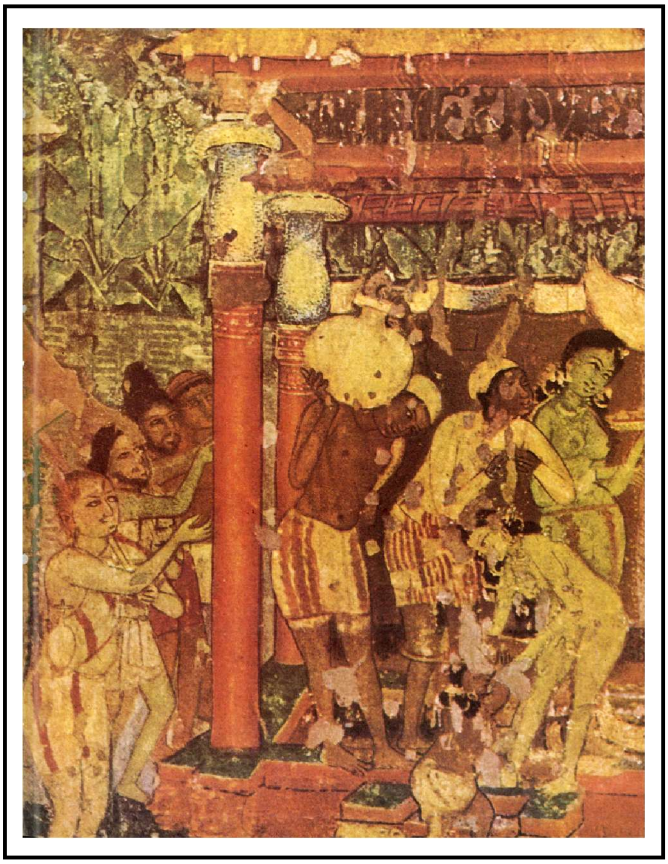

চিত্রসংখ্যা : ৫৩

অঙ্গুলিগুলি বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের ইঙ্গিতদ্যোতক। ওষ্ঠের ক্ষীণ হাস্যরেখা - রাজকীয় পরিবেশহেতু বাহ্য প্রসন্নতা। অজন্তা চিত্রকলা যেহেতু ভাবপ্রধান তাই এই ওষ্ঠে ক্ষীণ হাস্যরেখা চিত্রিত হয়েছে।

মহাজনকের সিংহাসনের পেছনে দুই অভিষেক্তা, তাঁদের উত্তমাঙ্গ অনাবৃত, মস্তক শ্বেত-বস্ত্রাবৃত, তাঁরা সুন্দর চিত্রিত কলসী হাতে পবিত্র অভিষেক বারি রাজা মহাজনকের উপর বর্ষণ করছেন। চিত্রের ডানদিকে এক বালিকা মাঙ্গলিক অভিষেক দ্রব্য নিয়ে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান।

আলোচ্য চিত্রটিকে গুপ্তরীতি প্রকাশমান, হস্তমুদ্রায় গুপ্তযুগীয় শিল্পশাস্ত্রের প্রতিফলন দেখা যায়। উপবেশন ভঙ্গীটিও গুপ্তযুগীয় মূর্তির অনুকরণে চিত্রিত হয়েছে। অলংকরণ আড়ম্বরতায় অজন্তা চিত্রশৈলীর প্রতিফলন স্পষ্ট। চিত্রটিতে রাজার মনে বিষন্নতা হেতু, বিমূঢ়তাহেতু করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে। আবার শিল্পী মুখমণ্ডলের ওষ্ঠে যে ক্ষীণ হাসিটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে মনে হয়, রাজ্যাভিষেকেবশতঃ আড়ম্বর উৎসবহেতু শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণ সংকল্প - মহাজনক-জাতকের অংশ অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং ১।

মহাজনকের প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃঢ়সংকল্পের চিত্র রূপায়িত হয়েছে। চিত্রটিতে রাজা মহাজনকের পশ্চাতে চামরধারিণী নারী দণ্ডায়মান, তিনিও ভক্তিনতা, মহাজনকের বাণী - অনুধ্যানে মগ্না। চামর চালনা করলেও মনটি মহাজনকের বাণীর ভাবরাজ্যে অবস্থান করছে। রাজার প্রব্রজ্যাগ্রহণ গ্রহণের সংকল্পহেতু তিনি বিস্ময়ান্বিত। রেখাপ্রধান চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় অজন্তা চিত্ররীতির প্রভাব স্পষ্ট। পদ্মপলাশলোচন, ভ্রু-ভঙ্গিমা, শিম্বীফলের ন্যায় অঙ্গুলী, করিশুণ্ডের ন্যায় বাহু, বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ, ধনুকের ন্যায় ললাট — এসবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

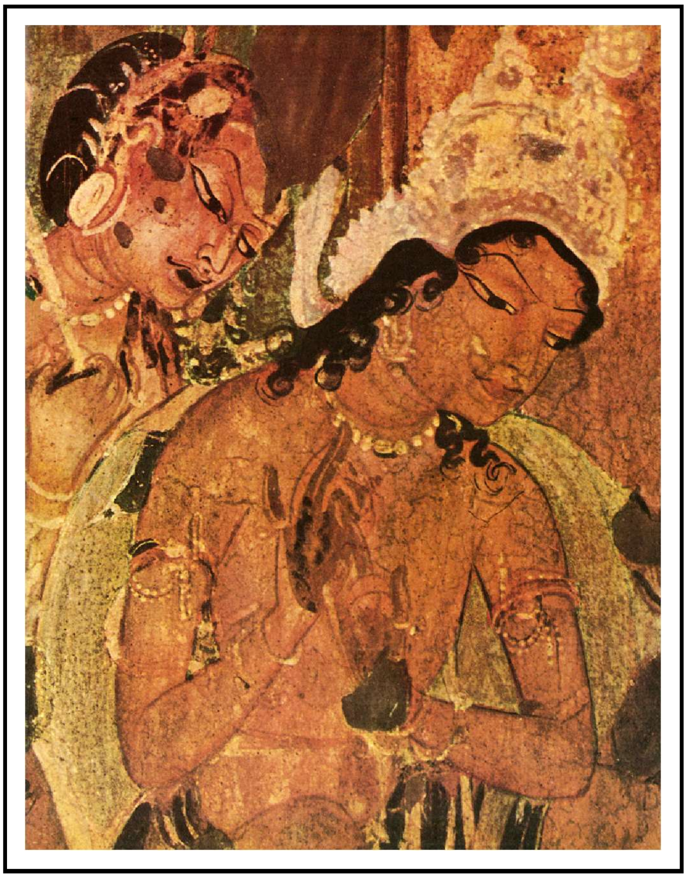

চিত্রসংখ্যা : ৫৪

এই চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — রাজা মহাজনকের দুই মহাবাহুর গতিরেখাটি বহির্ভাগ হতে এসে হৃদয়ের ওপর মিলিত হয়ে করাঙ্গুলিপুঞ্জের বিন্যাস হয়েছে, এর দ্বারা বহির্জগত থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আধ্যাত্মজগতে তাঁর মানসিক অবস্থান সূচিত করছে। মুখমণ্ডলে ঐহিক জগতের প্রতি অনীহা ও নির্বাণ স্পৃহা ধরা পড়েছে।

প্রবজ্যাগ্রহণের সংকল্পহেতু মুখমণ্ডল বিষাদময়, ইইজগতের প্রতি অনীহা — এসবই করুণরসকে ব্যঞ্জিত করেছে।

রাণী সীবলাদেবী ও তাঁর পার্শ্বে অবস্থিত নারীমূর্তিতেও ভিন্ন ভিন্ন রসের উপস্থাপন ঘটেছে। রাণীর পাশে উপবিষ্ট এক নারীমূর্তির নেত্র বিস্ফারিত, তিনি মহাজনকের মহানিষ্ক্রমণের কথা শুনছেন, বিষয়টি অনুধাবন করতে পারেননি। এ

সংবাদ তার কাছে ভয়ঙ্কর। তাই তিনি রাণীর আড়ালে বিস্ময়ে আকুঞ্চিত হয়ে আছেন। তাঁর নয়ন কোনে বিস্ময়াতঙ্কের দৃষ্টি। এখানে বিস্ময়ভাবহেতু অদ্ভুতরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চামরধারিণী নারী মূর্তির মধ্যে অজন্তাচিত্ররীতি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েচে। গুপ্তযুগে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী যে সব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম এই নারী মূর্তি, পদ্মপলাশ নয়ন, 'ললটম্ ধনুষাকারম্' অর্থাৎ কেশাগ্র থেকে ভ্রু পর্যন্ত ললাট এবং তা ধনুকের মতো অর্ধচন্দ্রাকার। বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ, হস্তের মুদ্রা - যা অজন্তা রীতির পরিচায়ক।

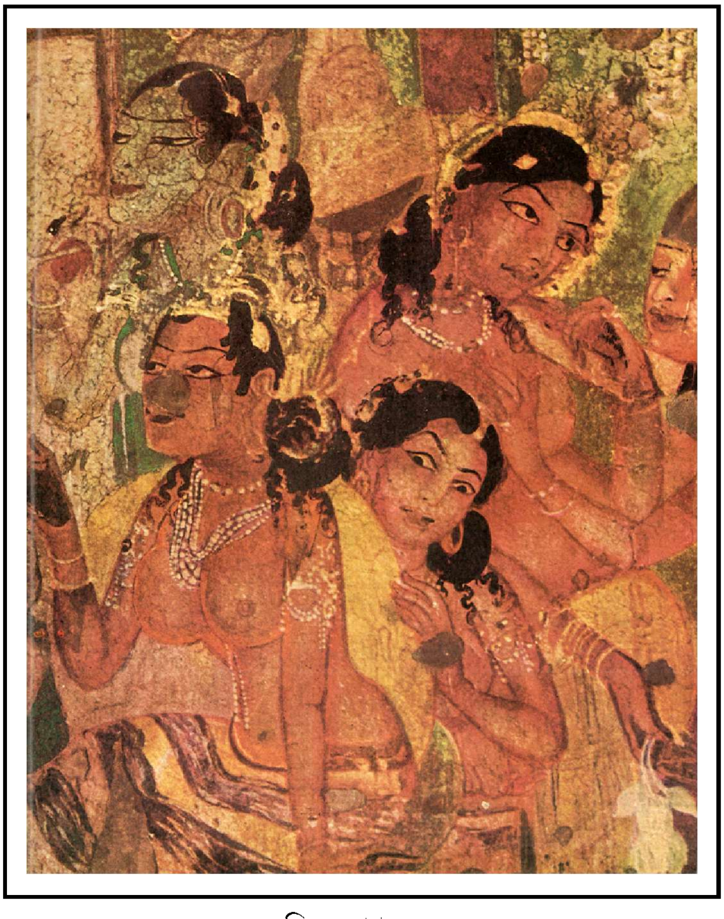

চিত্রসংখ্যা : ৫৫

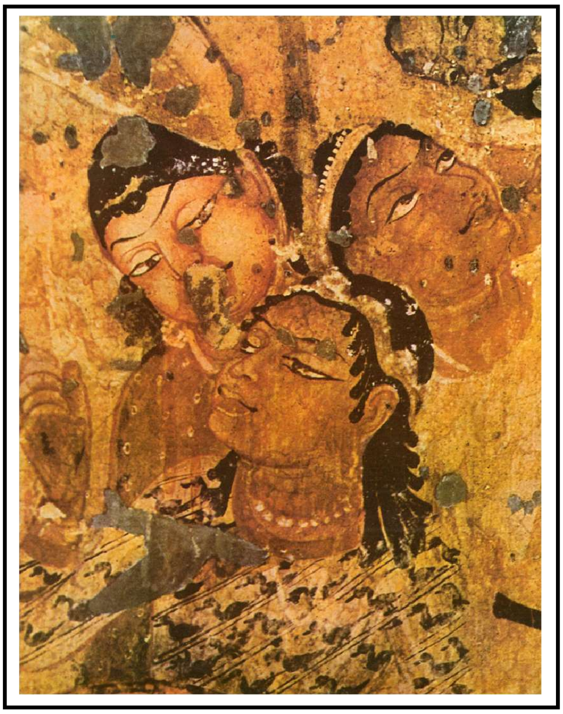

চিত্রসংখ্যা : ৫৬

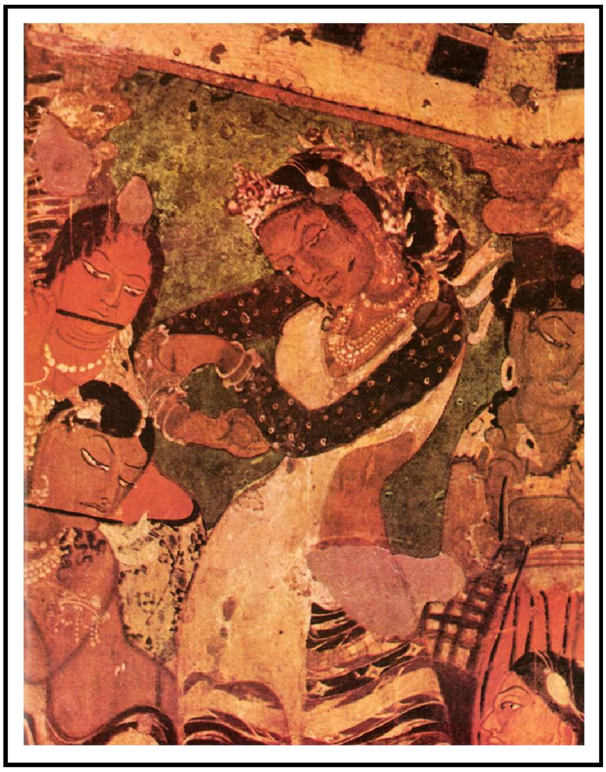

চিত্রসংখ্যা : ৫৭

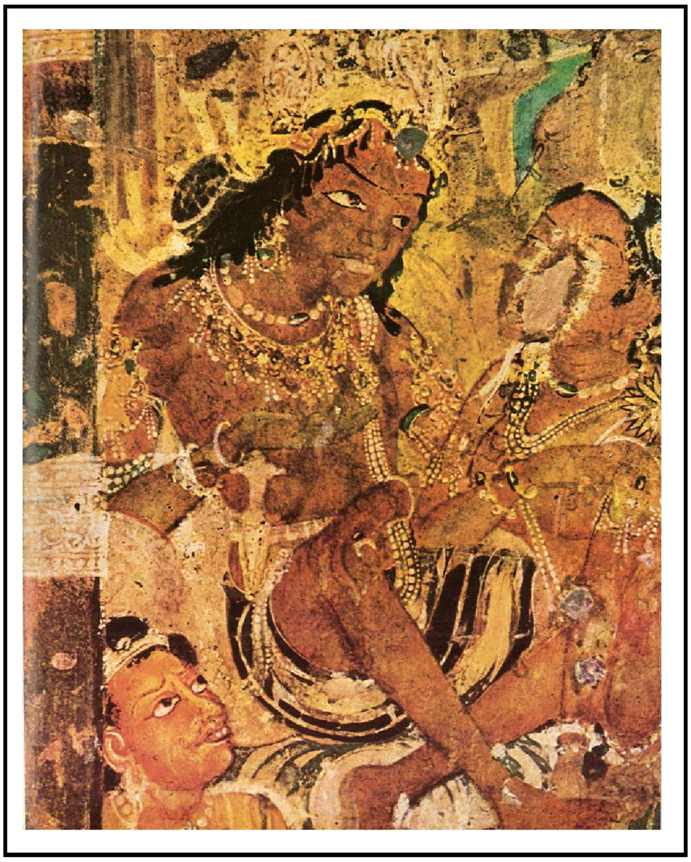

চিত্রসংখ্যা : ৫৮

শঙ্খপালজাতক, গুহা নং ১।

শঙ্খপালজাতকের কাহিনী চিত্রটি অজন্তার ১নং গুহায় অবস্থিত। শঙ্খপাল জাতকের উপাখ্যান অবলম্বন করে অজন্তা শিল্পী এক পটভূমিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্রের একত্র সংযোজনে বৃহৎ পূর্ণাঙ্গ চিত্রকাহিনী রচনা করেছেন। নাগরাজা শঙ্খপালের উপদেশ শ্রবণ করছেন এক স্ত্রীলোক। উপবেশন ভঙ্গীটি চমৎকার, মস্তকে ডান হাত এবং অপর হাত ভূমিতে স্থাপন করে ভারসাম্য রক্ষা করছেন। ইনি দর্শকের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে নারীসুলভ লীলায়িত ভঙ্গীতে ধর্মোপদেশ শুনছেন স্তব্ধ হয়ে। অজন্তার চিত্ররীতি খুবই বর্ণনাময় (Nararative)। প্রতিটি চিত্রের মধ্যে এক অসাধারণ গল্প লুকিয়ে আছে।

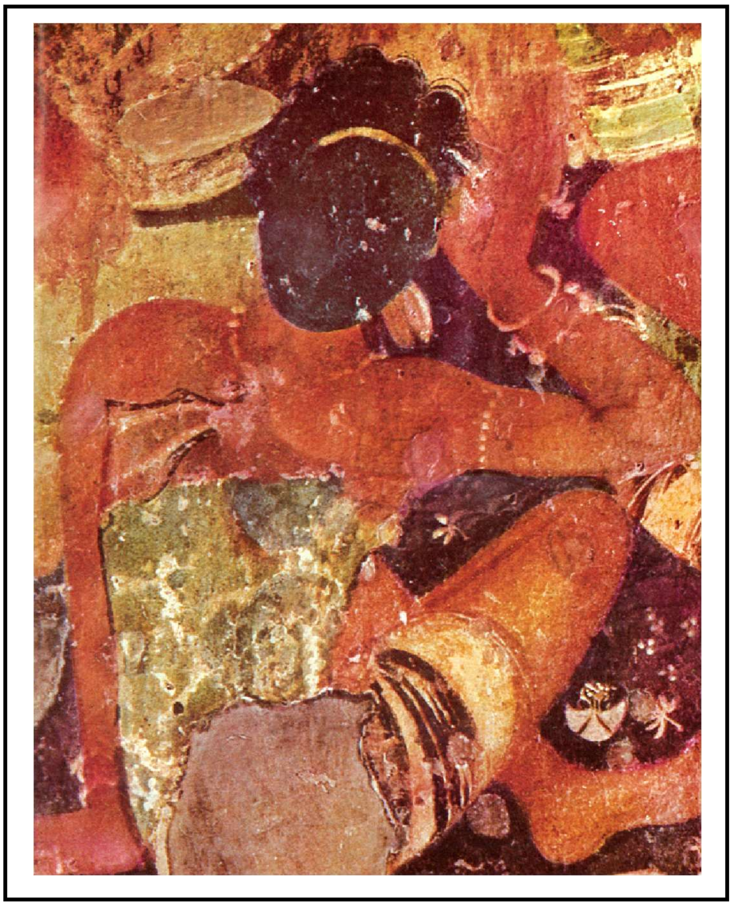

চিত্রসংখ্যা : ৫৯

ছাদের অলংকরণ সজ্জা, গুহা নং ১।

অজন্তার আলংকারিক শিল্প বিস্ময়কর ও চিত্তাকর্ষক। অলংকরণের নক্সাগুলি নানান ভাবের ব্যঞ্জক। তাতে ব্যক্ত করেছে কখনও রৌদ্ররস, কখনও বীভৎস রস, আবার কখনও হাস্য রস, করুণ রস।

অজন্তার আলংকারিক নক্সাচিত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায় —

প্রথমতঃ প্রাকৃত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত বস্তু থেকে উপাদান গ্রহণ করে আলংকারিক রূপ সংযোজন। দ্বিতীয়তঃ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের সঙ্গে আলংকারিক রূপের মৌলিক উদ্ভাবন। তৃতীয়তঃ জ্যামিতিক নক্সা। চতুর্থতঃ সমাজচিত্র।

চিত্রসংখ্যা : ৬০

চিত্রসংখ্যা : ৬১

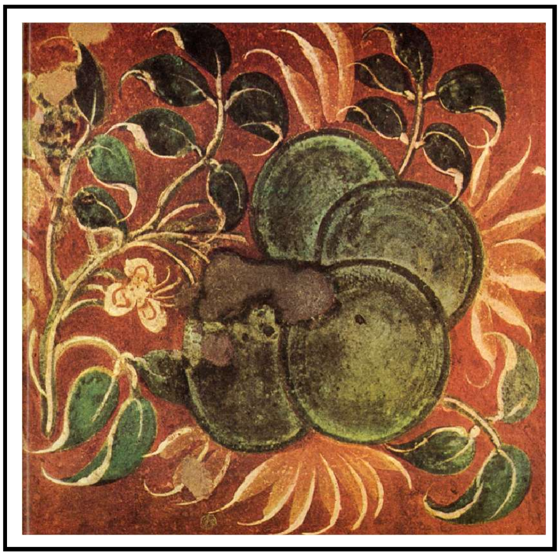

চিত্রসংখ্যা : ৬২

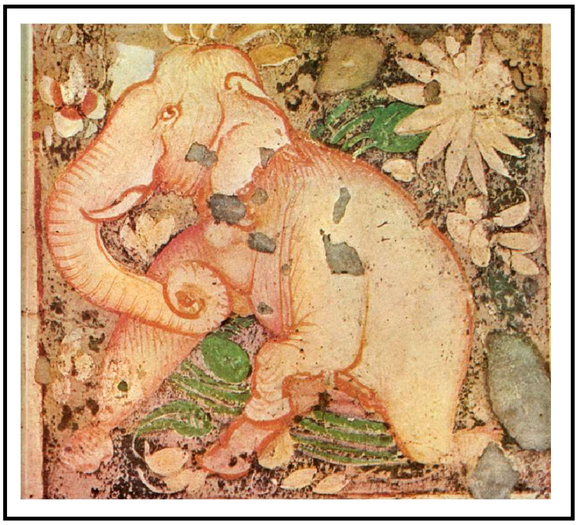

চিত্রসংখ্যা : ৬৩

প্রাকৃতরূপের ভাস্কর্যের মধ্যে বৃক্ষপত্র, পুষ্প, পশুপক্ষী, মানুষের এক তরঙ্গ প্রবাহ চলেছে। আশ্চর্যের বিষয় ফল-লতাপাতা পক্ষীয় আলংকারিক রূপের সঙ্গে চতুষ্কোণ আয়তনের মধ্যে মানব যুগলের রূপ সুসামঞ্জস্যও ছন্দায়িত।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রূপের সংমিশ্রণে তৈরী নক্সাতে বামনকে আলংকারিকরূপ দিয়ে চতুষ্কোন আয়তনটি এমনভাবে ছন্দায়িত করা হয়েছে, তা ছন্দায়িত হয়ে হাস্য

চিত্রসংখ্যা : ৬৪

চিত্রসংখ্যা : ৬৫

রসাত্মক রূপসৃষ্টি করেছে। কোথাও দুই বামন গভীর আলোচনারত। কোথাও অলংকরণে মাথায় পাগড়ীওয়ালা বিদেশী চরিত্রের মানুষও স্থান পেয়েছে, যারা সুরাপানরত।

পশুদের মধ্যে হস্তীর অলংকরণ চিত্তাকর্ষক। পদ্মবনে মত্তহস্তী অজন্তাচিত্রশিল্পীর একটি প্রিয় বিষয়।

চিত্রসংখ্যা : ৬৬

নানাপ্রকার পুষ্পলতার অলংকরণ রূপটিও চমৎকার। মানুষ পশুপক্ষী বর্জিত নানাপ্রকার পুষ্পলতা পাতা ও ফলের অলংকার দৃষ্ট হয়। পুষ্পের মধ্যে পদ্মফুলের নানা বিচিত্ররূপের অলংকরণ অধিক। এছাড়াও, জ্যামিতিক নক্সার নানান রূপ দৃষ্ট হয়। স্বস্তিকার নানাপ্রকার নক্সা দিয়ে জ্যামিতিক অলংকরণ আছে। জ্যামিতিক নক্সাগুলি চতুষ্কোন বিশিষ্ট। মাঙ্গলিক চিহ্নস্বরূপ নানা পুষ্প, পদ্ম, শঙ্খ প্রভৃতির দ্বারা অলংকৃত।

অজন্তা শিল্পী যেমন প্রকৃতির পুষ্পলতা, প্রাণীজগৎ অবলম্বনে কোন বিচিত্র নক্সা করেছেন তেমনি জ্যামিতিক নক্সা করেছেন তেমনি জ্যামিতিক নক্সায় সরললেখার বাঁধনে বক্ররেখার পাশাপাশি যোগসূত্র স্পষ্ট করে তুলেছেন।

চিত্রসংখ্যা : ৬৭

নক্সার মাধ্যমে শিল্পীর মননশীলতা ও সার্থক বোধের প্রতিফলন ব্যক্ত হয়েছে। গুহার অভ্যন্তরে (ceiling) চতুষ্কোনের মধ্যে বক্রাকারে অলংকরণ অতীব সুন্দর। হংসমিথুনের অলংকরণ শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটিয়েছে।

নক্সার মধ্যে নানান অদ্ভুত জন্তুর ব্যবহার অদ্ভুতরসের উপস্থাপন ঘটিয়েছে।

কোথাও পুষ্পের মধ্যে বালকের খেলার দৃশ্য বাৎসল্যরসের উপস্থাপন ঘটিয়েছে। পদ্মবনে মত্তহস্তী বা পুষ্পবনে ষাঁড়ের ভয়ঙ্কর চিত্র বীভৎসরসের উদ্বোধন ঘটিয়েছে।

এইসব অলংকরণের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল - অলংকরণে পদ্মফুলের ব্যবহার সবথেকে বেশী কারণ পদ্মফুল বৌদ্ধধর্মের একটি প্রতীক বিশেষ। মহাযান বৌদ্ধধর্ম মতে পদ্মফুল বুদ্ধের অত্যন্ত প্রিয় ফুল, তাই ছাদের অলংকরণে বৌদ্ধধর্মের প্রতীকরূপে পদ্মফুলের অলংকরণ বেশী। শ্বেতহস্তীও বৌদ্ধধর্মের অপর একটি প্রতীক বিশেষ। যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শুদ্ধতা, পবিত্রতা, তাই হস্তীর নানান চিত্র অলংকৃত হয়েছে।

চিত্রসংখ্যা : ৬৮

প্রতিটি অলংকরণই গুপ্তচিত্ররীতির পরিচায়ক। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য হল — সাদৃশ্যাত্মক। ষড়ঙ্গসূত্রের মধ্যে সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বর্ণনাত্মক রেখাপ্রধান এই অলংকরণগুলি গুপ্তশিল্প রীতি বিশেষতঃ অজন্তা চিত্ররীতিকে প্রকাশ করছে।

বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি - অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং ১।

বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি আলেখ্যটি অজন্তাশিল্পের এক জোতিষ্ক স্বরূপ। এঁর অপর নাম অবলোকিতেশ্বর। অজন্তা চিত্ররীতি মূলতঃ গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি, তাই গুপ্তযুগের

বৈশিষ্ট্যগুলি এই চিত্রে বর্তমান। অজন্তা শিল্পী বোধিসত্ত্ব চিত্রকে ত্রিভঙ্গীমরূপে চিত্রিত করেছেন। বোধিসত্ত্বের দক্ষিণহস্তে লীলাপদ্ম, বামহস্তে কটিবস্ত্রের প্রান্তর ধরে আছেন। গ্রীবার ভূষণ বা অলংকার হল মুক্তার ক্ষুদ্রমালা, যার কণ্ঠের কাছে একটি বড় নীলকণ্ঠমণি। মস্তকে, মণিখচিত শিরোভূষণ, যার পশ্চাৎদেশে কেশরাশি স্থান পাচ্ছে। কন্ধদেশে যজ্ঞোপীত, যা ছোট ছোট মুক্তার সংযোজনায় নির্মিত। মনোহর এই উপবীতটির বোধিসত্ত্বের তনুভঙ্গিমায় ছন্দায়িত হয়ে বক্ষঃস্থল থেকে ক্রমে দক্ষিণবাহু পরিক্রমা করে পশ্চাৎদিকে অদৃশ্য হয়েছে। তাঁর দুই বাহুতে কেউর ও কটক বাহুভূষণ। গুপ্তযুগীয় চিত্ররীতিকে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। বোধিসত্ত্বের মহাভুজদ্বয় ও ক্ষীণ সিংহকটিতে মহাবীর্যের ভাব - পৌরুষভাব এবং দেহে কমনীয় ভঙ্গিমায় ললিতভাব গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

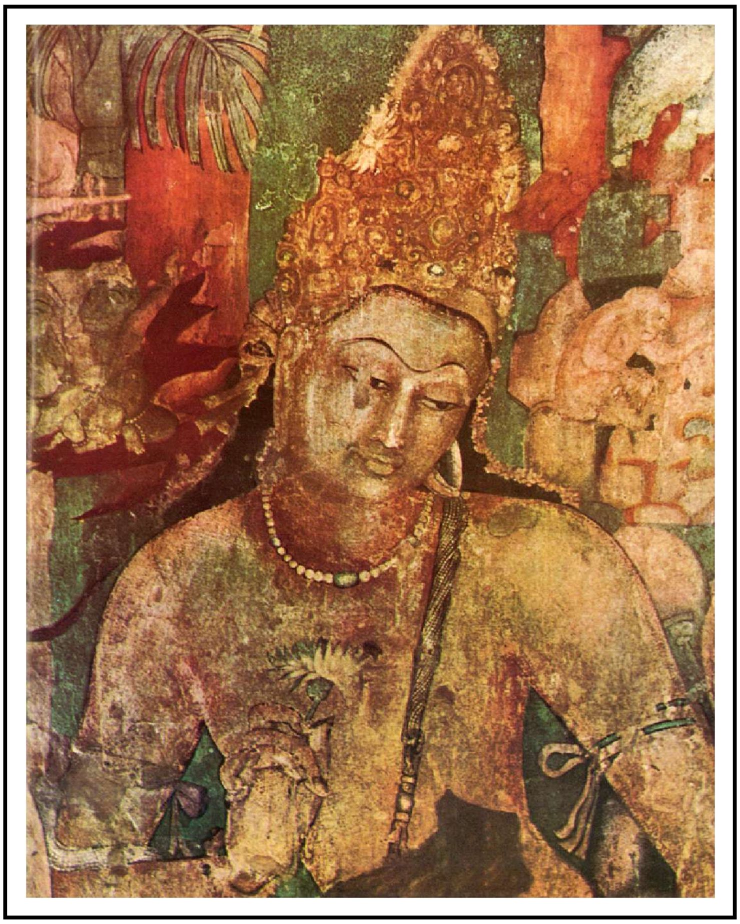

চিত্রসংখ্যা : ৬৯

এই চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল — 'ত্রিভঙ্গরূপী বোধিসত্ত্ব'। পরম করুণার অভিব্যক্তিতে কোমলতার আতিশয্যে তাঁর এই ত্রিভঙ্গরূপ। ত্রিভঙ্গ অবস্থা ধ্যানের এক বিশেষ অবস্থা, যে অবস্থায় পরিপূর্ণ করুণার অভিব্যক্তিতে দেহ ঋজুত্ব পরিহার করে তরঙ্গায়িত বঙ্কিমরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখন আভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ ও অতিভঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে। বোধিসত্ত্বের দক্ষিণহস্তধৃত লীলাপদ্ম ব্রহ্মযোনি বা দেবোৎপত্তির পরিচায়ক।

এই চিত্রটিতে কারুণ্যের ভাব অধিক প্রকটিত। প্রেম ও করুণার সংমিশ্রণ ঘটেছে চিত্রটিতে। এখানে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। 'লীলাপদ্ম' অর্থে শৃঙ্গার চেষ্টার্থ বা ক্রীড়ার্থ করধৃত পদ্ম। শৃঙ্গাররস তাই লীলাপদ্মে ব্রহ্মলোক হতে জগৎ সম্ভোগের বা লীলাবিলাসের নিমিত্ত বোধিসত্ত্বের অবতরণ বোঝায়। এই নীলোৎপলদল শ্যামবর্ণের। আলংকারিকদের মতে শৃঙ্গাররসের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। তাই হস্তধৃতপদ্মের বর্ণ নীল, যা নরলীলা বা বিলাসের প্রতীক। এই নীলবর্ণ অনন্ত অসীমের দ্যোতক, যা অপার করুণা জ্ঞাপন করে। নাট্যশাস্ত্রকার আচার্য ভরত আদিরস শৃঙ্গারকে সৃষ্টিরস আখ্যা দিয়ে বলেছেন তা নির্বেদ ও বৈরাগ্যের উদ্বোধক।

অজন্তার চিত্রশিল্পী ধ্যানের মধ্য দিয়ে এই নিরঞ্জন মূর্তি দর্শন করে চিত্রে প্রতিফলিত করেছেন। তিনি অব্যক্তকে ব্যক্তে প্রকাশ করেছেন। অমূর্তকে মূর্ত করেছেন।

নাগরাজকন্যা ইরন্দতী - বিধুরপণ্ডিত জাতক কথার অংশ, গুহা নং ২।

চিত্রে দেখা যাচ্ছে নাগ-রাজোদ্যানে রাজকন্যা ইরন্দতী একটি দোলনায় দোল খাচ্ছে। এখানে রাজকন্যা উদ্ভিন্ন যৌবনা লজ্জানতা নারী। ত্রিভঙ্গিমায় দেহটি শিল্পী অঙ্কণ করেছেন। সন্মুখে নায়ক পূর্ণক উপস্থিত, এখানে নায়ক-নায়িকার দৃষ্টি বিনিময়টি রতিভাবের অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছে, তাই এখানে শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে। এই চিত্রে যুবক ও যুবতী একটি বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ আবেদনে চিত্রিত। দোলনায়

উপবিষ্ট ইরন্দতীর দৃষ্টিতে আকুতি, বিস্ময় ও সংশয়, তারপরেই দণ্ডায়মানা ইরন্দতীর দৃষ্টিতে প্রত্যয়যুক্ত মোহিনী কটাক্ষ। অপরদিকে পূর্ণকের চোখে একান্ত বিমুগ্ধ আবিল দৃষ্টি।

দোলনায় রাজকুমারীকে শিল্পী এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, রাজকুমারী যে হাত দিয়ে দোলনাটি ধরে আছেন, তার বক্রতা, সরলরেখায় নয়। সরলরেখায় অঙ্কিত হলে এখানে ছন্দপতন ঘটতো। তাই বক্রভাবে দোলনার রজ্জুটিকে চিত্রিত করেছেন শিল্পী — এটি ভারতীয় শিল্পরীতির একটি বৈশিষ্ট্য।

চিত্রের পশ্চাৎপটে সর্পের উপস্থিতি গভীরভাবে ব্যঞ্জিত হচ্ছে। উদ্যানটি যে নাগরাজার এবং নাগরাজকন্যার উপস্থিতি স্বরূপ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি চিত্রকর এখানে সর্পের দ্বারা ব্যক্ত করেছেন।

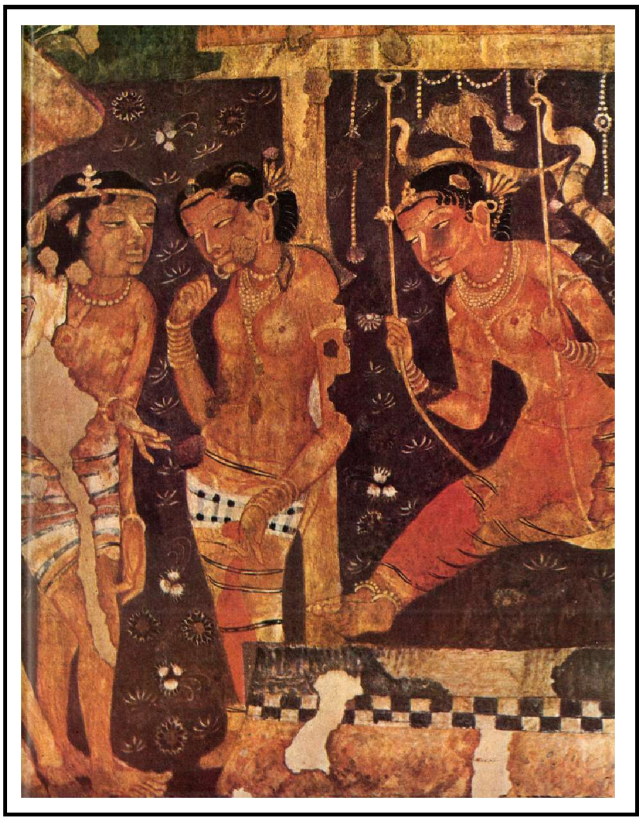

চিত্রসংখ্যা : ৭০

চিত্রটিতে গুপ্তশিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। হস্তের মুদ্রায়, চক্ষের দৃষ্টিতে, ত্রিভঙ্গ দেহাবয়বে গুপ্তযুগের মূর্তিকলার সাদৃশ্য দেখা যায়।

মুমূর্ষু রাজকন্যা গুহা নং ১৬।

বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদ পেয়ে রাজকুমারী জনপদ কল্যাণীর মানসিক হতাশার কাহিনী চিত্রটি অজন্তা শিল্পী অঙ্কণ করেছেন। মূর্চ্ছাতুরা হতে চলেছেন রাজকুমারী তাঁর মনে শোকের উদয় হয়েছে। এই শোকভাব হেতু এখানে করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে। অনান্য নারীচরিত্রের মধ্যেও বিষাদের ছায়া শিল্পী অঙ্কণ করেছেন। শোকভাবের প্রকাশটিকে শিল্পী স্পষ্ট করেছেন - জনপদ কল্যানীর অবসন্ন মস্তকটি বেদনায় আনত, একদিকে একটু হেলান - গ্রীবা যেন মস্তকের ভার বহন করতে পারছে না, যেন এখনই সংজ্ঞাহীন হয়ে যাবেন। সামান্য উঁচু একটি আসনে ছিন্নলতার মতো এলায়িত হয়ে আছেন। পশ্চাৎদিকে বাম হাতটি উপাধানে ন্যস্ত করে তিনি দেহভার লাঘর করতে সচেষ্ট। পদদ্বয় ভূমিতে প্রসারিত। নেত্রদ্বয় নিমীলিত করে আছেন। পেছন থেকে এক সখী তাঁকে ধরে আছেন।

চিত্রসংখ্যা : ৭১

করুণরসের প্রকাশে শোকভাবের অভিব্যক্তিতে চিত্রটি দর্শকের নিকট মর্মস্পর্শী। আনত নয়নে, দেহভঙ্গীমায় করুণরসের প্রকাশ ঘটেছে। এই চিত্রে রীতি বা ব্যঞ্জনাটি হল - রাজকুমারীর মূর্চ্ছিতভাব যে প্রিয়জনের বিচ্ছেদের কারণে, প্রেমিকে সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য তা প্রকাশিত হয়েছে চিত্রে নায়িকা রাজকুমারীর শীর্ণ দুই পদদ্বয়ের মাধ্যমে।

চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি বিশেষতঃ অজন্তা চিত্ররীতি প্রকট। রাজকুমারীর দৈহিক অবয়ব শিল্পী যেভাবে চিত্রিত করেছেন, যা গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির পরিচায়ক। রেখাপ্রধান এই চিত্রে রঙের ব্যবহারও ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চিত্রিত করেছেন অজন্তা শিল্পী। ষড়ঙ্গের মধ্যে বর্ণিকাভঙ্গ নামক উপাদানটি এখানে সুপ্রযুক্ত হয়েছে।

নন্দের ধর্মপরিবর্তন কথা ঃ নন্দের পত্নী জনপদ কল্যাণী, গুহা নং ১।

১নং গুহায় মূর্চ্ছাহত জনপদ কল্যানীর একটি আলেখ্য দেখা যায়। ড. ইয়াজদানী এখানে দুটি আলেখ্যের উল্লেখ করেছেন। (১) A Bikshu at a Palace door (২)

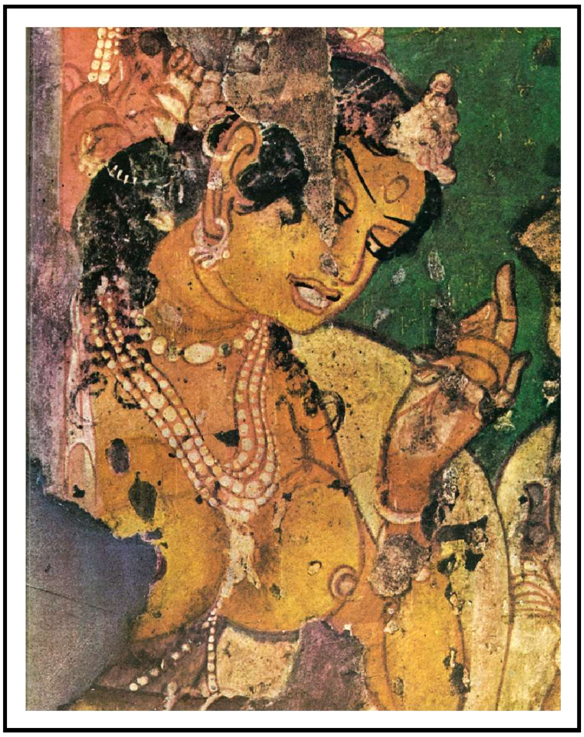

চিত্রসংখ্যা : ৭২

A palace scene : A Lady reclining on a couch।[৪১] বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভাই নন্দ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন, সেকথা শুনে নন্দের স্ত্রীর অবস্থা বর্ণিত হয়েছে চিত্রটিতে। স্ত্রীলোকটির মনে শোকের উদয় হয়েছে, কারণ তাঁর স্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করছেন, সংসারের মায়া বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন। যদিও রাণীর মধ্যে সংসারের প্রতি অনাসক্তি ঘটেনি, তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি। নন্দের সন্ন্যাসগ্রহণে তাই তাঁর মনে দুঃখের বাতাবরণ রচিত হয়েছে। তাই শোকভাব হেতু এখানে করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রসংখ্যা : ৭৩

এই চিত্রটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল — স্ত্রীলোকের আনত দৃষ্টির দ্বারা শোকভাব প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্ণযৌবনা পত্নীকে ত্যাগ করে নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করুণরসের উদ্রেক করেছে। আনতদৃষ্টি এখানে করুণরসকে ব্যঞ্জিত করছে। চিত্রে দেখা যায় ভিক্ষুবেশে স্বয়ং নন্দ তাঁর প্রব্রজ্যার খবর দিতে এসেছেন প্রিয়তমাকে। তাঁকে দেখা যাচ্ছে - তিনি রাজদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন শ্বেতবস্ত্র ব্রহ্মচারী ভিক্ষুবেশে। মুণ্ডিত

মস্তক, বামহস্তে দীর্ঘ পরিব্রাজক দণ্ড, গ্রীবাতে ভিক্ষুচিহ্ন মালা - এগুলি নন্দের প্রব্রজ্যা গ্রহণকে ব্যঞ্জিত করছে। অপর একটি ব্যঞ্জনা হল - নন্দের দক্ষিণ হস্তের তর্জনীটি বৃদ্ধাঙ্গুলের সঙ্গে উর্দ্ধদিকে থাকায় বৈরাগ্যভাবকে ব্যঞ্জিত করছে। ব্রহ্মচারীরূপী নন্দের দৃষ্টিও আনত, কারণ তাঁর প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংবাদে তাঁর প্রিয়তমার কি নিদারুণ প্রতিক্রিয়া হবে। তাই সহানুভূতির মর্মবেদনায় তাঁর আনত দৃষ্টি।

চিত্রে জনপদ-কল্যানী প্রাসাদকক্ষে সখী পরিবৃতা হয়ে উপবেশন মূর্তিতে রয়েছেন। উদ্ভিন্ন যৌবনা, সুবেশা, সালঙ্কারা রাজকন্যা বিষাদগ্রস্তা, বিভ্রান্ত - এই ভাবটি প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর আনত মস্তকে, নয়ন ভঙ্গীতে। হস্তমুদ্রা ভিক্ষু নন্দেরই অনুরূপ - উভয়ের মধ্যে যেন একই সুর বিরাজমান। এখানে নয়নের আনত ভঙ্গিমায় করুণরসই প্রকাশিত হচ্ছে।

চিত্রে গুপ্তশিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী ভারতীয় নারীর পীনোন্নত বক্ষ, করপল্লব, বাহুলতা দ্বারা মূর্তিটি চিত্রিত হয়েছে যা গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। চিত্রটিতে রস, রীতি, ধ্বনি সার্থকরূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি দৃশ্যের অংশ, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা নং ১।

বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি আলেখ্যের অন্তর্গত নরমিথুনের সম্ভোগের চিত্রটিতে উপবিষ্ট নারী অপূর্ব লীলায়িত ভঙ্গিতে পুরুষের বক্ষলগ্না - তাঁর অপাঙ্গ দৃষ্টি নিপেক্ষ করছেন পুরুষ-সঙ্গীটির দিকে। সুন্দরী এই নারীর পেলব দক্ষিণ হস্তটি পুরুষ সঙ্গীটির জঙ্ঘায় মৃদু পীড়নরতা। বামবাহুর ভঙ্গিমাটি দয়িতকে তাঁর নিজের দেহসৌন্দর্যের দিকে আর্কষণের প্রয়াস করছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ধরা দিচ্ছেন না, মদন ক্রীড়া কৌতুকে যেন একটু ব্যবধান রক্ষার ভান করছেন। পুরুষ মূর্তিটির যৌবনদৃপ্ত শ্রী, শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী 'বৃষস্কন্ধ'। তিনি বামহস্তে সঙ্গিনীর মৃণালসম হস্তটিকে আর্কষণ করে আলিঙ্গনে উদ্যত। দক্ষিণহস্তে মদিরার পূর্ণ পাত্রটি তুলে ধরে সুন্দরীনারীর দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করে আছেন। Heinrich Zimmer এই নরমিথুন চিত্রটিকে সুখী কামুক দম্পতি (a happy and amorous couple) এবং এঁদের দেবতা ও দেবী অথবা রাজা ও রাণী

বলেও অনুমান করেছেন।[৪২] শিল্পী মুকুল চন্দ্র দে মহাশয় এই নরমিথুন চিত্র সম্বন্ধে বলেছেন, 'ফেস্কোচিত্রের উপর অংশে অনেক ক্ষুদ্র পরিমাপে বুদ্ধ-যশোধরার প্রেমলীলা চিত্রিত।'[৪৩]

নর-নারী উভয়ের দেহসৌষ্ঠবে শিল্পশাস্ত্রের প্রভাব স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে। গুপ্তযুগীয় শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী — নারীর পীনোন্নত বক্ষ, ক্ষীণ ডমরুকটি, কদলীবৃক্ষবৎ করিশুণ্ডবৎ পদদ্বয়, করপল্লব, বাহুলতা - এগুলি চিত্রিত হয়েছে। হস্তের মুদ্রাও

চিত্রসংখ্যা : ৭৪

শাস্ত্রীয় লক্ষণ অনুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রীতিগত দিক থেকে চিত্রটি গুপ্তশিল্পরীতির প্রকাশক।

নর-নারীর মিথুন চিত্রে রতিভাবের প্রকাশ ঘটেছে। পুরুষের বক্ষলগ্না নারীটির উপবেশনের ভঙ্গিটি শৃঙ্গাররসের প্রকাশক। সাহিত্যের বর্ণনা অনুযায়ী একটি সম্ভোগশৃঙ্গারের দৃশ্য। চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — নারীমূর্তিটিতে শ্যামবর্ণের

ব্যবহার এখানে শৃঙ্গাররসের প্রকাশক। হস্তমুদ্রায় কামনার ভাবটি ব্যক্ত হয়েছে।

বোধিসত্ত্বপদ্মপাণির পশ্চাতে অঙ্কিত এই দৃশ্যটিতে রস, রীতি, ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ ঘটেছে। শৃঙ্গাররস প্রধান চিত্রটিতে কামনার ভাবটি অজন্তা চিত্রশিল্পী তুলে ধরেছেন।

বুদ্ধের জন্মসম্বন্ধীয় কাহিনীর অংশ, মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শন, গুহা নং - ২ ঃ

বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধীয় আলেখ্যে দণ্ডায়মান মায়াদেবীর চিত্রটি গুপ্তশিল্পরীতির অন্যতম নিদর্শন। মা হতে চলেছেন মায়াদেবী, তিনি স্বপ্নদর্শন করেছেন, পার্শ্বচরিত্রেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে তাঁর সেই স্বপ্নদর্শনের কথা শুনছেন — আলোচ্য চিত্রে তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন অজন্তা শিল্পী।

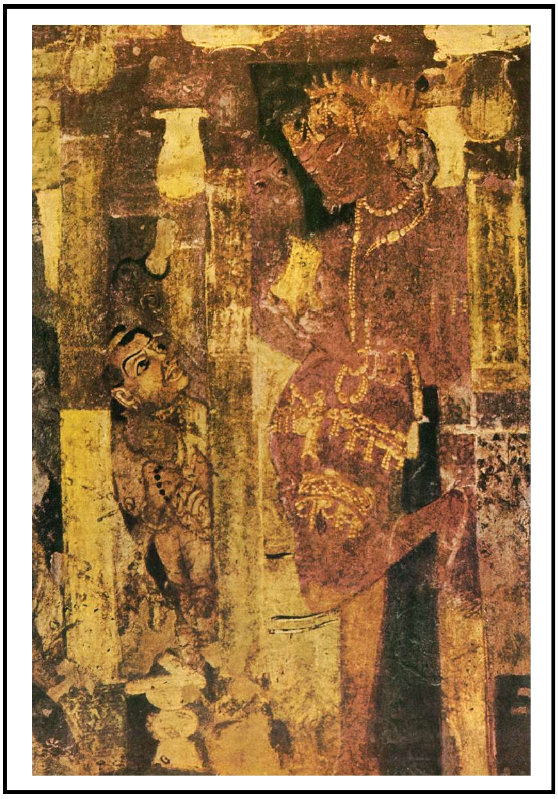

চিত্রসংখ্যা : ৭৫

দণ্ডায়মান মায়াদেবীর দাঁড়ানোর দৃশ্যটি শিল্পী খুব সুন্দরভাবে অঙ্কণ করেছেন। দেওয়ালে ভর দিয়ে এক পা তুলে নৃত্যায়িত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ক্ষীণ পদযুগল সৌন্দর্যের পরিচায়ক, ভারতীয় নারীর পদযুগল সম্বন্ধে শিল্পশাস্ত্রে বলা হয়েছে, তা হবে - কদলীবৃক্ষবৎ, করিশুণ্ডবৎ। তাঁর আনত দৃষ্টি, পদ্মপলাশলোচন, বাহুলতা, হস্তমুদ্রা - এসবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিকে ব্যক্ত করেছে।

এই চিত্রটিতে অদ্ভুত রস ব্যক্ত হয়েছে, যা পার্শ্বচরিত্রদ্বয়ের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। মায়াদেবীর স্বপ্নদর্শনের কথা দুই ব্যক্তি বিস্ময়ান্বিতভাবে শ্রবণ করছেন। এই বিস্ময়ভাব থেকেই অদ্ভুত রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - মায়াদেবীর আনত নয়ন, ভূমির দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ যা থেকে স্বপ্নটির বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্বপ্নে শ্বেতহস্তীর কাহিনী - যা কিছুটা হলেও রাণীকে ভীত করে তুলেছে। একইসাথে কিছুটা লজ্জাবনতাবশতঃ আনতদৃষ্টি-র প্রকাশ ঘটেছে। চিত্রে বর্ণিত চরিত্রগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, বেশ আকর্ষনীয় অদ্ভুত কোনো প্রসঙ্গ আলোচিত হচ্ছে।

এই চিত্রটিতে অজন্তাশিল্পীর শিল্পকর্মে রস, রীতি, ধ্বনির প্রসঙ্গটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। অজন্তা শিল্প ভাবাত্মক তাই বোধের বা মনস্তত্ত্বের আলোকে সতত উদ্ভাসিত।

বুদ্ধের পূজার অংশ - 'অপ্সরা', গুহা নং - ১৭ ঃ

'অপ্সরা' চিত্রটি অজন্তাগুহার ১৭নং গুহায় চিত্রিত। চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্ট, যেমন - অর্ধনিমিলিত 'পদ্মপলাশলোচন' চক্ষুদ্বয়, 'তিলপুষ্পবৎ' নাসিকা, বিম্বফলবৎ ওষ্ঠ, শিম্বী ফলের ন্যায় অঙ্গুলী ইত্যাদি।

অপাঙ্গদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা এই অপ্সরা-বুদ্ধদেবের পূজার অংশবিশেষ। সালঙ্কারা এই নারীর মূর্তিতে বিশেষ মস্তক বেষ্টনী, যা রত্নখচিত বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

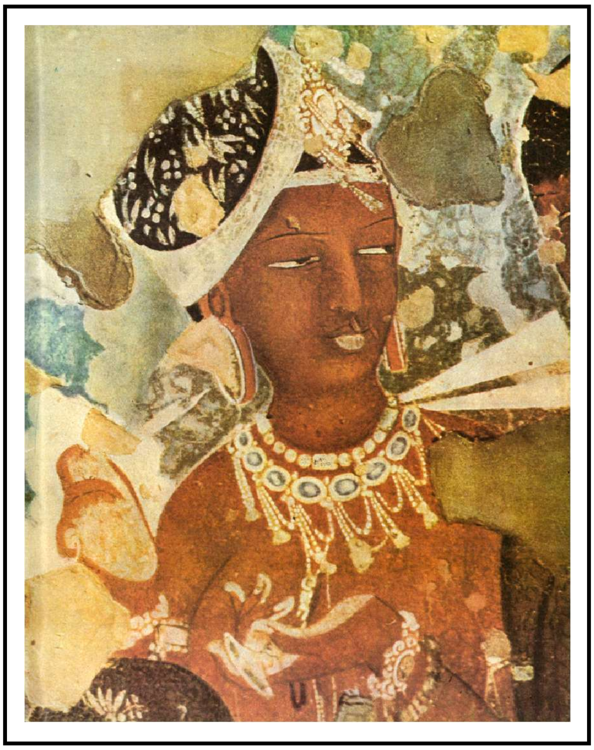

চিত্রসংখ্যা : ৭৬

কর্ণভূষণ বিশেষ আকর্ষনীয়। গলায় যে কারুকার্যময় রত্নহার তার দ্বারা এই মূর্তি যে সাধারণ মনুষ্যবাচ্য নয় তা ব্যঞ্জিত হয়েছে। এই চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল — হস্তদ্বয়ের বিশেষ মুদ্রা ভঙ্গিটি বক্ষসংলগ্ন, এর দ্বারা নিজেকে প্রকাশিত করার ইচ্ছা বর্ণিত হয়েছে। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতে যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট, তা এই অপ্সরা চিত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অজন্তা-শিল্পী গুপ্তরীতিতেই এই চিত্র অঙ্কণ করেছেন।

চিত্রটিতে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। কারণ অপ্সরার তাকানোর ভঙ্গিটি এখানে রতিভাবের অতিব্যঞ্জক, তাই চিত্রটি শৃঙ্গার রসকে ব্যঞ্জিত করছে।

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, গুহা নং - ১

অজন্তা গুহার ১নং গুহাতে যে চিত্রাবলী অঙ্কিত, তার মধ্যে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের চিত্রটি উল্লেখযোগ্য। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটি মহাপুরুষের নানা লক্ষণ অনুযায়ী রূপায়িত হয়েছে - সিংহকটি, আজানুলম্বিত মহাবাহু, উজ্জ্বল

স্নিগ্ধ অসিত চক্ষু, শরীরের সর্বাঙ্গ পূর্ণ বর্তুলাকার, অঙ্গুলি ও নখ সবই লম্বমান প্রভৃতি। ধ্যান-পরায়ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন ভারতীয় শিল্প সাধকগণ তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারা মহাপুরুষের নানা লক্ষণ নিরূপিত করেছেন। সেই সকল লক্ষণ সমাবেশে এই অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি চিত্রিত হয়েছে। অজন্তা গুহাচিত্র রেখাধর্মী হলেও সেখানে আলোছায়ায় ব্যবহার করেছেন শিল্পী। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর চিত্রটিতে করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে। অবলোকিতেশ্বরের করুণাঘন দৃষ্টি, জগতের প্রতি তাঁর করুণভাব এখানে করুণরসের উপস্থাপন ঘটিয়েছে। গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতে অঙ্কিত চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - করুণাঘন দৃষ্টি যা জগতের প্রতি অপার করুণা জ্ঞাপন করছে। 'ত্রিভঙ্গরূপী' বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর ধ্যানের এক বিশেষ ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান। 'ত্রিভঙ্গ' অবস্থা এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা প্রকাশিত, ত্রিভঙ্গ অবস্থা ধ্যানের এক বিশেষ অবস্থা, যে অবস্থায় পরিপূর্ণ অভিব্যক্তিতে দেহ ঋজুত্ব পরিহার করে তরঙ্গায়িত হয়।

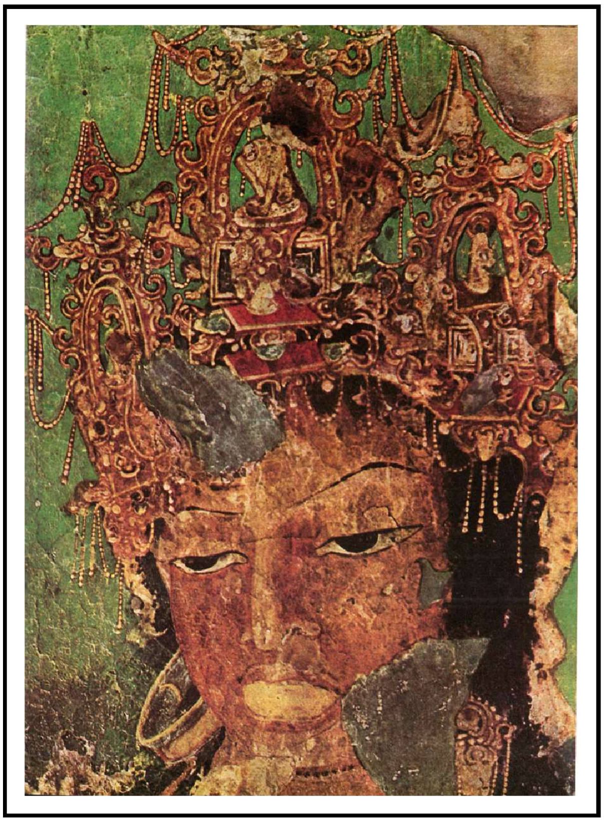

চিত্রসংখ্যা : ৭৭

বুদ্ধের উপদেশদানের একটি অংশ, গুহা নং - ১৭

বুদ্ধ উপদেশ দান করছেন, তাঁর উপদেশ শ্রবণ করার জন্য ব্যক্তিবর্গ ভূমিতে উপবেশন করছেন। ভক্তিভাবে নরনারীগণ তাঁর উপদেশ শ্রবণ করছেন। কেউ বা ঘোড়ায় আরোহণ করে উপদেশ শ্রবণ করছেন।

চিত্রসংখ্যা : ৭৮

এই আলেখ্যটি অজন্তা শিল্পীর বর্ণনায় সজীব হয়ে উঠেছে। উপস্থিত ভক্তগণের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে শান্ত সমাহিত ভাব, উপদেশ দানকারী বুদ্ধদেবও শমভাবাপন্ন হয়ে উপদেশ দান করছেন। এই শমভাবের হেতু চিত্রটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। সাহিত্যে শান্তরসকে নবম রসরূপে স্বীকার করেছেন আলংকারিকগণ।

চিত্রের ব্যঞ্জনাটি হল — বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রায় হস্ত ধৃত রয়েছেন। যেখানে দুই হাত বুকের নীচের ন্যস্ত; তিনি সারনাথে ধর্মপ্রচারকালীন প্রথম এই মুদ্রার ব্যবহার করেছিলেন। হস্তমুদ্রার মধ্য দিয়ে তাঁর ধর্মপ্রচারের ঘটনাটি শিল্পী

সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই মুদ্রার ব্যবহার হেতু তিনি যে ধর্মপ্রচার করছেন ভক্তদের মাঝে এই সত্যটি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। নরনারীর সূক্ষ্ম বস্ত্রের ব্যবহার, ‘করপল্লব’ ন্যায় হস্ত, ‘পদপল্লব’ ন্যায় পদদ্বয়, রেখাবহুল ও বর্ণনাবহুলচিত্রটি যে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশক তা উপলব্ধি করা যায়।

চিত্রটিতে একই সাথে রস, রীতি, ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে।

সিংহলাবদান কাহিনীর অংশ, গুহা নং - ১৭

সিংহলাবদান কাহিনীর এই দৃশ্যটিতে রাজা সিংহলপুরী শ্বেতহস্তিতে আরোহন করে নগরদ্বারে বাইরে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন, তাঁর মস্তকের ওপরে ছত্র। রক্ষীদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি হাতী সওয়ারে চলেছেন। চিত্রে রাজার মাথায় কিরিট

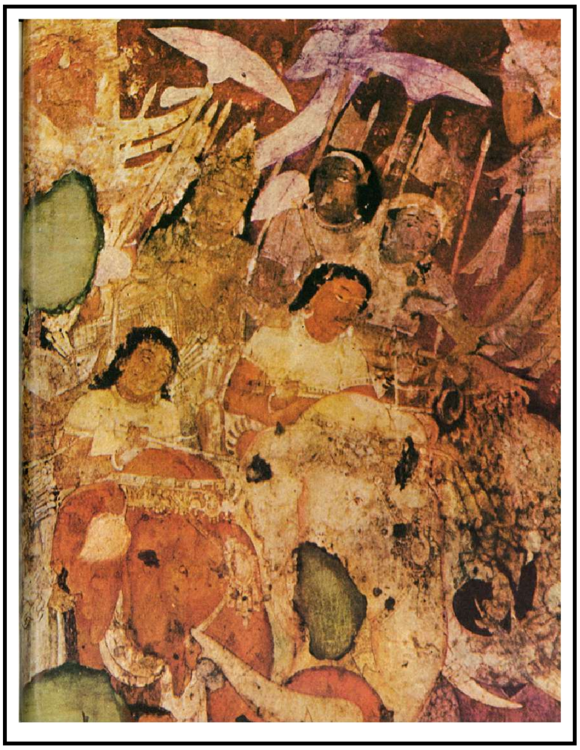

চিত্রসংখ্যা : ৭৯

দেখে রাজাকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করা যায়। মাথার ওপর চত্রধারণকারী পুরুষ, হাতীকে চালনা করার জন্য মাহুত - বর্ণনাবহুল দৃশ্যটিতে প্রকাশিত হচ্ছে।

চিত্রটিতে রাজা উৎসাহিত হয়ে নগরের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন, তাই উৎসাহভাবের প্রকাশহেতু এখানে বীর রসের উপস্থাপনা ঘটেছে।

চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - রাজা অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নগরের বাইরে প্রস্থান করছেন, তাই এর দ্বারা তাঁর মৃগয়াগমন, যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি ঘটনাকে ব্যঞ্জিত করছে।

চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে, শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী অজন্তাশিল্পী চিত্র অঙ্কণ করেছেন।

মদমত্ত হাতিকে বশীকরণ করার দৃশ্য, গুহা নং - ১৭

রাজগৃহের রাজপথে একটি মদমত্ত হস্তীকে বশীকরণের ঘটনাকে উপজীব্য করে অজন্তা শিল্পী আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। চিত্রে দেখা যাচ্ছে বুদ্ধের অদ্ভুত অনুকম্পায় হাতিটি উৎপীড়ন বন্ধ করে আত্মসমর্পণ করেছে। জনসাধারণ এই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করে আশ্চর্য হয়েছে। উপস্থিত মানুষজন অভিভূত হয়ে পড়েছে। স্বয়ং বুদ্ধ হাতিটির মাথায় হস্ত সমর্পণ করাতে হাতিটি অদ্ভুতভাবে শান্ত হয়ে নতমস্তকে বুদ্ধের বশ্যতা স্বীকার করেছে। হাতিটির এরূপ আচরণে নরনারীগণ বিস্ময়ান্বিত হয়ে দেখছে, এই চিত্রে তাই বিস্ময়ভাবহেতু অদ্ভুতরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - হাতিটির মাথায় বুদ্ধের হস্ত সমর্পণ ঘটনাটি। হাতিটিতে শ্বেত বর্ণে শিল্পী চিত্রিত করেছেন। শ্বেতহস্তী বৌদ্ধধর্মের একটি পবিত্র প্রতীক। শ্বেতহস্তীর মধ্য দিয়ে বৌদ্ধধর্ম ব্যঞ্জিত হয়েছে।

রেখাপ্রধান এই চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি অনুসৃত হয়েছে। চিত্রটির

বর্ণনাবহুল (Narrative) বিশেষত্ব গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশক। পশ্চাতে দ্বিতল বিশিষ্ট গৃহ থেকে উৎসুক নরনারীগণের বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটিও এখানে বিস্ময়ভাবের সূচনা করেছে। শান্ত হয়ে যাওয়া হাতিকে কেউ বা মালা পরাচ্ছেন, কেউ বা ফুল দিয়ে বরণ করার চেষ্টা করছেন।

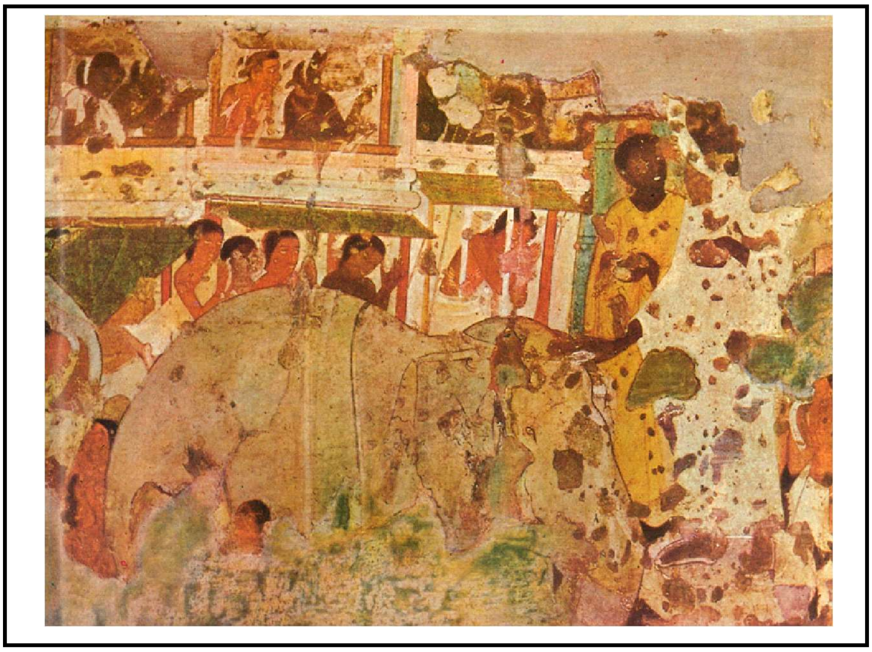

চিত্রসংখ্যা : ৮০

আলোচ্য চিত্রটিতে রস, রীতি, ধ্বনির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে।

বেস্‌সান্তর জাতক -এর অংশ, গুহা নং - ১৭

বেস্‌সান্তর জাতকের কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে রাজকুমার বেস্‌সান্তর এবং তাঁর পত্নী মণ্ডপের নীচে উপবেশন করছেন। পত্নী মদ্দী তাঁর স্বামীর দেশত্যাগের সংবাদশ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। রাজকুমার তাঁকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন। চিত্রটিতে রাজকুমারের প্রণয় ধরা পড়েছে। রাজকুমারের দক্ষিণ হস্তে মদিরার পাত্র, যার দ্বারা পত্নীকে প্রসন্ন করার চেষ্টা করছেন। পার্শ্বচরিত্রটি মদিরার পাত্র এগিয়ে দিচ্ছেন। নর-নারী উপবেশন ভঙ্গীটিও চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন শিল্পী।

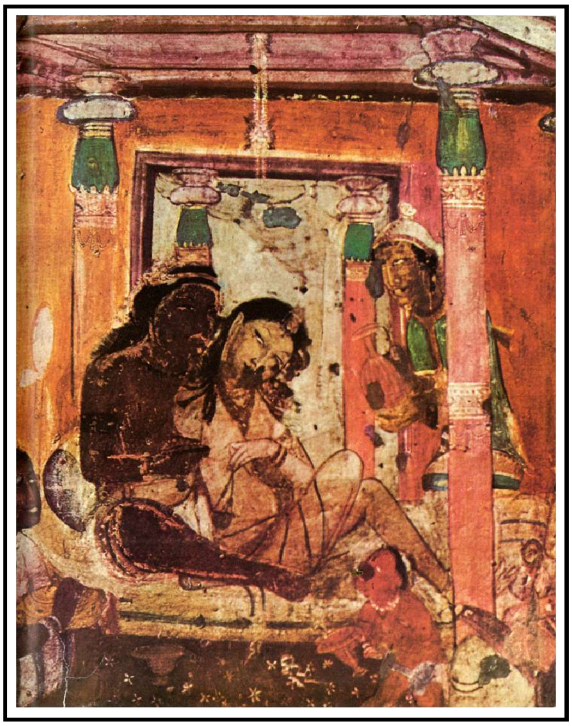

চিত্রসংখ্যা : ৮১

স্ত্রীমূর্তিটির অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকানো এই ব্যঞ্জনাটির দ্বারা তাঁর পতির প্রতি অনুরাগ ব্যক্ত হচ্ছে। পুরুষমূর্তির বামহস্ত স্ত্রীলোকের বামস্কন্ধে রাখা, এর দ্বারা মিলোনেচ্ছা ব্যক্ত হচ্ছে। চিত্রটিতে নায়ক - নায়িকার রতিভাব হেতু শৃঙ্গার রসের প্রকাশ ঘটেছে।

রেখাপ্রধান, বর্ণনাবহুল চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি প্রকাশিত হচ্ছে। নায়িকার ক্ষীণতনু, ক্ষীণপদদ্বয়, নায়কের বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশুমহাভুজ, করকমলদ্বয় - এসব শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী চিত্রিত হয়েছে। চিত্রের মধ্যে গৃহ-স্থাপত্যও বর্ণময়, খিলান ও স্তম্ভগুলিতে গুপ্তযুগীয় স্থাপত্যরীতি চিত্রিত হয়েছে।

সিংহলাবদনা কথার অংশ, গুহা নং - ১৭

সিংহলাবদান কাহিনীর চিত্রলেখ্যটি আংশিকভাবে পাওয়া যায়। কোনও এক নারী তার দয়িতের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। দয়িতের হাতের একক অংশ চিত্রে দৃশ্যমান। যদিও চিত্রটির আংশিক অবস্থান ব্যক্ত হচ্ছে, তবুও কোথাও বুঝে নিতে

অসুবিধা হয় না যে এটি একটি মিলনান্তক দৃশ্যের আলেখ্য। এক সুন্দরী নারী তার দয়িতের দিকে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এরকম আবেগঘন দৃষ্টি কেবল নায়ক-নায়িকার মধ্যেই ঘটে থঅকে। নায়কের বামহস্ত নায়িকার বামস্কন্ধে আবদ্ধ। চিত্রটিতে রতিভাবের বিস্তারহেতু শৃঙ্গাররস উপস্থাপিত হয়েছে।

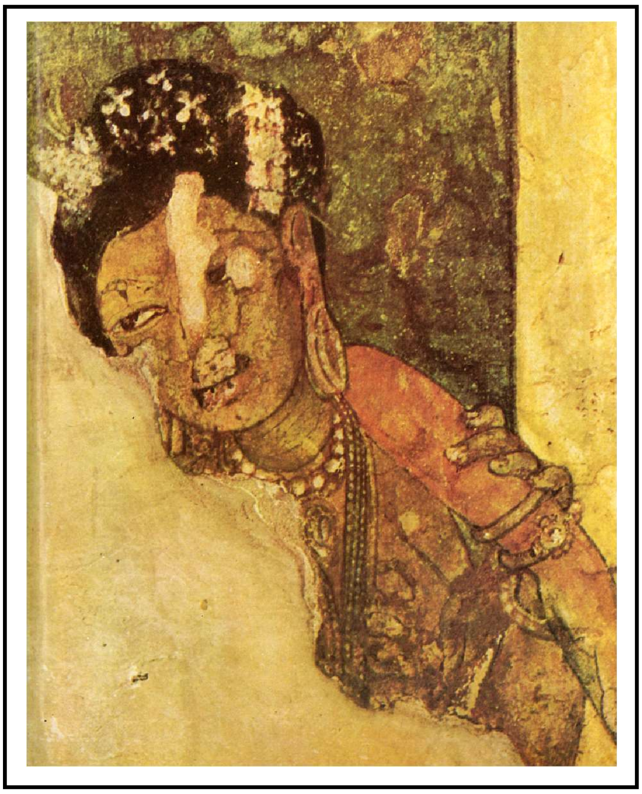

চিত্রসংখ্যা : ৮২

চিত্রটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। নায়িকার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকানোর মধ্য দিয়ে নায়কের প্রতি তার প্রেমাসক্তি ব্যঞ্জিত হয়েচে। যদিও এখানে নায়ক অনুপস্থিত, তবুও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে শূন্যস্থানে নায়কই অবস্থান করছেন।

চিত্রটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে, পদ্মপলাশ লোচন, বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ, করকমল, শিম্বীফলের ন্যায় অঙ্গুলী-সাদৃশ্যাত্মক এই অঙ্গগুলি গুপ্তযুগীয়,

বিশেষতঃ অজন্তা চিত্ররীতির অঙ্গ। সুতরাং রস, রীতি, ধ্বনিগত দিক থেকে চিত্রটি যথার্থ অলংকারযুক্ত হয়েছে।

বেস্‌সান্তর জাতক এর অংশ, গুহা নং - ১৭

১৭নং গুহার চিত্রটি বেস্‌সান্তর জাতক কাহিনীর অংশবিশেষ। চিত্রটিতে বর্ণিত হয়েছে রাজদম্পতি মহলের বাইরে প্রস্থান করছেন। বহুমানুষের সমাগম ঘটেছে, রাজকুমার তাঁর পত্নীসহ নির্বাসিত হচ্ছেন, নির্বাসনের দৃশ্যটি রাজা-রানী বাতায়ন থেকে দর্শন করছেন।

চিত্রসংখ্যা : ৮৩

অজন্তা চিত্রকলা বর্ণনাবহুল ও ভাব ব্যঞ্জনাময়। রাজপুত্রের নির্বাসনের ঘটনায় এখানে শোকভাবের উদয় হয়েছে, তাই এখানে করুণরসের উপস্থাপন ঘটেছে। বর্ণনাবহুল (Narrative) এই দৃশ্যটির প্রত্যেক নর-নারী উর্দ্ধপানে তাকিয়ে আছে। এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল - রাজকুমারের নির্বাসনহেতু প্রত্যেক নর-নারী বহির্মুখী, তাই তাদের চক্ষু উর্দ্ধমুখী। কেউ বা অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, কারও চক্ষু আনত।

গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যগুলি এই চিত্রটিতে দেখা যায়। নরনারীর বেশভূষা, অলংকারসজ্জাতে অজন্তা চিত্ররীতির প্রভাব দেখা যায়। রেখাবহুল চিত্রাঙ্কণের মধ্যে শিল্পশাস্ত্র সম্মত প্রয়োগকলা ঘটিয়েছেন শিল্পী। তাই নর-নারীর চিত্রকে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় প্রকাশ করেছেন শিল্পী।

রাজকুমারীর অঙ্গসজ্জা, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা - ১৭

অজন্তা গুহাচিত্রের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র দৃশ্যময় অংশ দেখা যায়, যেখানে পার্শ্বচর বেষ্টিত এক রাজকুমারীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। চিত্রটিতে দর্পণ হস্তে প্রসাধনরতা দণ্ডায়মান এক রাজকুমারী বা রাণী, যিনি অলংকারের দ্বারা সুবেশা, ক্ষীণকটি তণু, করিশুণ্ডের ন্যায় বাহুদ্বয়, ক্ষীণকায় পদযুগল - কদলীবৃক্ষবৎ, করিশুণ্ডবৎ, আনত দৃষ্টি - পদ্মপলাশলোচন, শিম্বীফলের ন্যায় অঙ্গুলী - এসবই শিল্পশাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। অঙ্গে সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার যা গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতে দেখা যায়। বিবাহের উদ্দেশ্যেই হোক বা অন্য কারণেই হোক তার এই প্রসাধনক্রিয়া, অঙ্গসজ্জা ভারতীয়

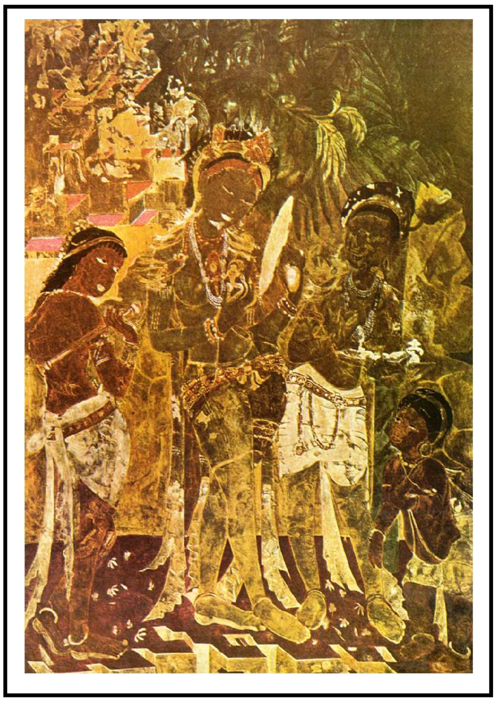

চিত্রসংখ্যা : ৮৪

শিল্পের বহুল প্রচলিত বিষয়, যা ভাস্কর্যেও দেখা যায়। দর্পণ হস্তে প্রসাধনরতা দণ্ডায়মান নারীকে এর পরবর্তীকালে আমরা ভাস্কর্যে পেয়েছি। অজন্তা চিত্রে প্রসাধনরতা নারীর চিত্রটিও যে খুবই জনপ্রিয় চিত্র সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

চিত্রটিতে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। নারীর অঙ্গসজ্জারূপ বিষয়গুলি শাস্ত্রে শৃঙ্গাররসের প্রকাশক। রসগত দিক থেকে চিত্রটি সার্থক।

ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাগত দিক থেকে বিচার করলে - রাণীর পার্শ্বচরগণ তাঁকে প্রসাধনকার্যে সহায়তা করছে এক বনপ্রান্তে, বহির্দেশে যা বিশেষ অনুষ্ঠানের দ্যোতক। এই চিত্রটির সাথে জাতক কাহিনীর কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এটি তৎকালীন কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানকে দ্যোতনা করছে।

রস, রীতি, ধ্বনিগত দিক থেকে চিত্রটির সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।

কিন্নর-যুগল, বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির অংশ, গুহা - ১

অজন্তার ১নং গুহায় বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির চিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কিন্নর-কিন্নরী হলেন স্বর্গ গায়ক ও গায়িকা। এঁদের উত্তমাঙ্গ মনুষ্যাকৃতি এবং নিম্নাঙ্গে পক্ষীসদৃশ

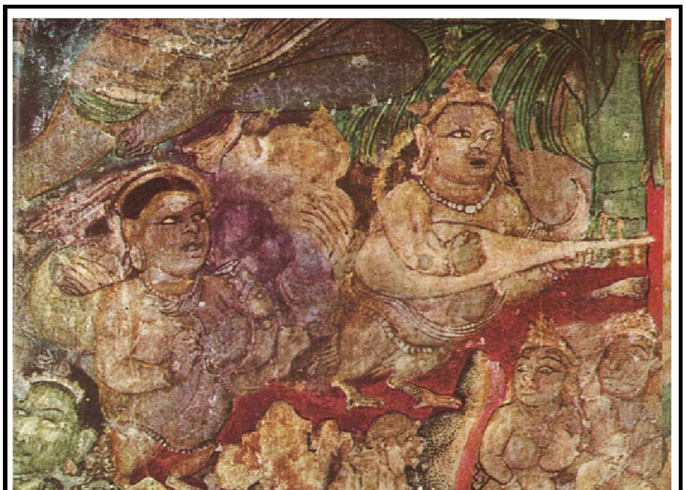

চিত্রসংখ্যা : ৮৫

পদযুগল ও পক্ষবিশিষ্ট। কিন্নরের হাতে বীণা, কিন্নরীর দুই হাতে মন্দিরা। ড. ইয়াজদানী কিন্নরের হাতের বাদ্যযন্ত্রটিতে 'Harp' বলে অভিহিত করেছেন।[৪৪] এঁরা বোধিসত্ত্বের আর্বিভাবে উল্লসিত, মহা-আনন্দিত। এই আনন্দ-উল্লাসহেতু অদ্ভুত রসের উপস্থাপন ঘটেছে। এই চিত্রের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল কিন্নর-কিন্নরীর দৃষ্টিতে বিস্ময়ের ভাব, বোধিসত্ত্বের আর্বিভাব তাঁদের বিস্মিত করেছে। তাই বোধিসত্ত্বের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাঁরা তাকিয়ে আছেন। বিস্ময়ের ভাব হেতু এখানে অদ্ভুত রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

রীতিগত দিকে থেকে এখানে গুপ্তযুগীয শিল্পরীতির উপস্থাপন ঘটেছে। রেখার ব্যবহার, বর্ণনাবহুলভঙ্গী, আড়ম্বরতা এগুলি অজন্তা শিল্পরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

নারীমূর্তি, অজন্তা গুহাচিত্র, গুহা - ১৭

অজন্তা চিত্রশিল্পে বর্ণিত নারীমূর্তির বিশেষ কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যা অনান্য যুগের শিল্পরীতির থেকে স্বতন্ত্র। বেশীরভাগ নারীমূর্তিতেই ‘পদ্মপলাশলোচন’ রূপ

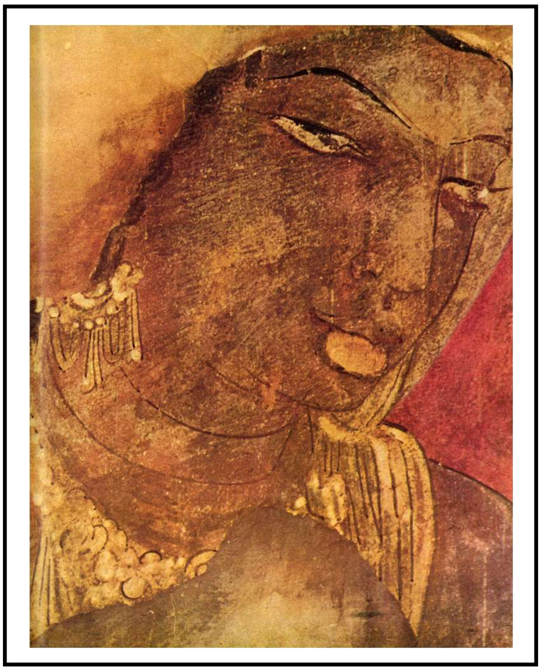

চিত্রসংখ্যা : ৮৬

চক্ষু দ্বারা প্রশান্ত দৃষ্টি দেখা যায়। নাসিকা তিলফুলের ন্যায় এবং নাসাপুট নিষ্পাব বীজের ন্যায় — *তিলাপুষ্পাকৃতি-র্নাসাপুটম্ নিষ্পাববীজবৎ*। বিম্বফলের ন্যায় ওষ্ঠ — *অধরম্ বিম্বফলম্*। অজন্তা চিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল নীচের ঠোঁট অপেক্ষাকৃত পুরু। উরু হল কলাগাছের ন্যায় — *উরু-কদলীকাণ্ডম্*। হাত ও পা এর আকৃতি হবে যথাক্রমে — *করপল্লবম্ পদপল্লবম্*। কমলের সঙ্গে ও পল্লবের সঙ্গে হাত ও পায়ের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অজন্তা চিত্রাবলীতে যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, যা অন্য কোনো শিল্পকলায় দেখা যায় না। অঙ্গুলী শিম্বীফলের ন্যায় — *অঙ্গুলী শিম্বীফলম্*। *ললাটম্ ধনুষাকারম্* — কেশান্ত থেকে ভ্রু পর্যন্ত ললাট এবং তা ধনুকের ন্যায় অর্ধচন্দ্রাকার। ষড়ঙ্গসূত্রে এই মিলগতরূপকে 'সাদৃশ্য' বলে।

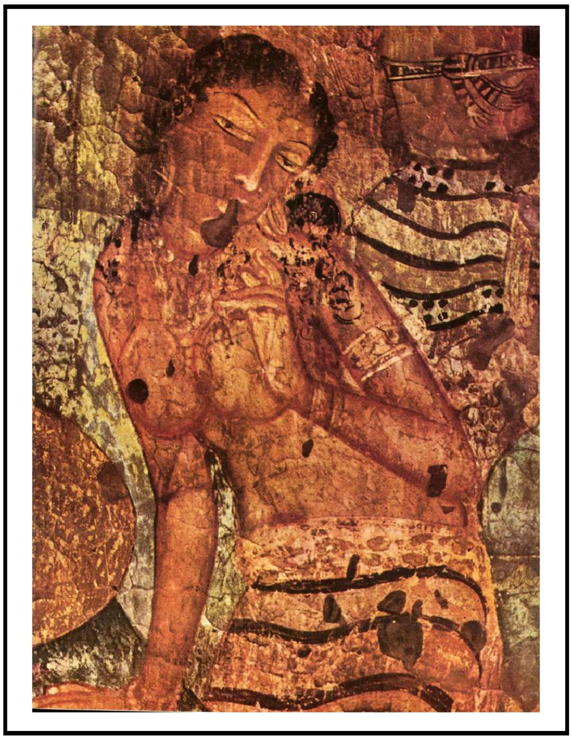

চিত্রসংখ্যা : ৮৭

অজন্তাচিত্রের বুদ্ধের মার-বিজয়ের অংশজাত যে নারীর চিত্র শিল্পী অঙ্কণ করেছেন, তা অজন্তার ১নং গুহায় দেখা যায়। এই পূর্ণযৌবনা রমণীরা বোধিসত্ত্বের দুই পাশে দণ্ডায়মান। সুন্দরী রমণীর উত্তমাঙ্গে স্বচ্ছবাস, কটিতটে মোটা কাপড়ের

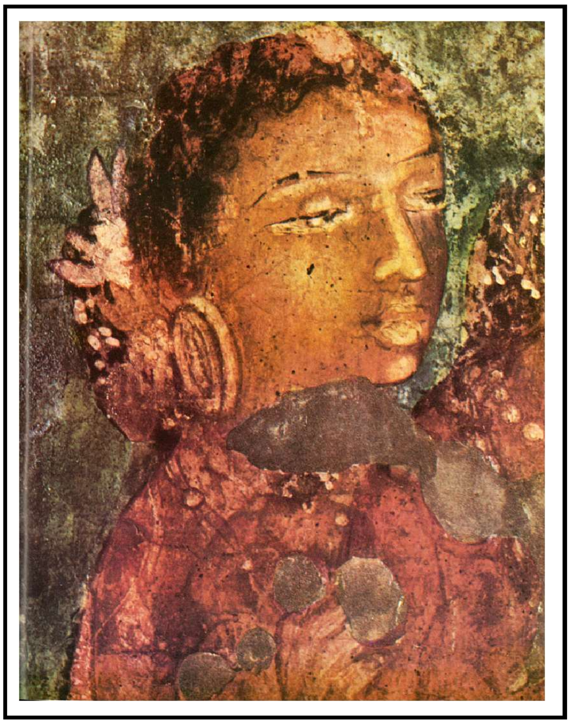

চিত্রসংখ্যা : ৮৮

নক্সাওয়ালা মেখলা। এই নারীরা বুদ্ধকে কামনার দ্বারা প্রলোভিত করছেন, ফলে এখানে শৃঙ্গারসের নিবেদন সুস্পষ্ট। সালঙ্কারা দুই সুন্দরীর মধ্যে একজন গর্ভিনী ত্রিভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — নারীটির দাঁড়ানোর ভঙ্গিমা যেন তাঁর ভাবভঙ্গীতে গৌতমের কামনা উদ্দীপ্ত করতে প্রয়াস করছেন। যেন সে বলছে — 'এস জন্মজন্মান্তর ভোগ কর, আমরা তোমাকে ধারণ করে ধন্য হই।' চিত্রে এই ভাবটি প্রকাশার্থে এই নারীকে গর্ভিনীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এছাড়া ঐ ভাবটি প্রকাশের জন্য চিত্রের মাধ্যমে অন্য কোনো উপায় নেই।

চিত্রে এই ব্যঞ্জনাটির ব্যবহার হয়েছে যথার্থ অভিব্যক্তি প্রকাশের জন্য, এরূপ কৌশল অবলম্বন করা সার্থক শিল্পীর যথার্থ ধর্ম। সিদ্ধার্থের আসনের সন্মুখে যে নারীমূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত, তাদের মধ্যে এক নারীর বামহস্ত স্তনে সন্নিবিষ্ট, অপর হস্ত ভঙ্গিমায় তর্জনী দিয়ে চিবুকটি স্পর্শ করে গৌতমকে সম্মোহিত করার জন্য ব্যর্থ

প্রয়াস পাচ্ছেন। এর পাশে যে মোহিনীমূর্তি আছেন, তিনি স্বল্পবসা, ক্ষীণকটি, পীণোন্নত বক্ষ, সালঙ্কারা নর্তকীসদৃশ।

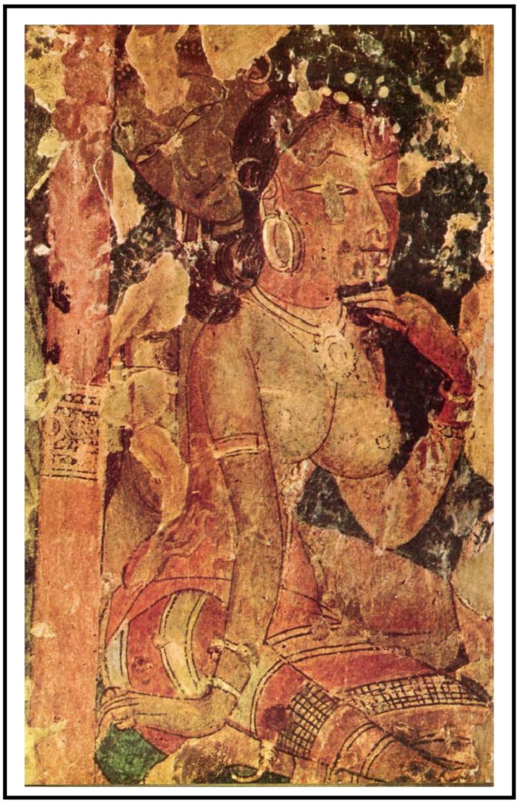

চিত্রসংখ্যা : ৮৯

ড. ইয়াজদানী এই স্ত্রী-মূর্তিগুলির প্রশংসা করেছেন। তাঁদের অতীবসুন্দর মুখাবয়বের মাধুর্যভাবের জন্য।[৪৫]

বাঘগুহাচিত্র :

অজন্তার পরেই যে চিত্রের প্রসঙ্গ উঠে আসে তা হল বাঘগুহার ফ্রেস্কো চিত্র। গোয়ালিয়রের বিন্ধ্যপর্বতের এই গুহাতে চিত্রগুলি আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত হয়েছিল। গুপ্তযুগীয় এই চিত্রগুলিতে অজন্তার মতোই চিত্ররীতি দেখা যায়। চিত্রগুলি অজন্তার মতো ছাড়া ছাড়া নয়, compactness খুব বেশী। বাঘগুহা মধ্যভারতের তথা সমগ্র ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্র।

এখনো পর্যন্ত যে নয়টি গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে কয়েকটিতে ভাস্কর্য ও ভিত্তিচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অজন্তা গুহার থেকে অনেক ছোট হলেও এটি অজন্তার মতোই শিল্পগুণে সমৃদ্ধ। বাঘগুহায় ভিত্তিচিত্র ও ভাস্কর্যমূর্তি থেকে অনুমান

চিত্রসংখ্যা : ৯০

করা যায়, এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক বা ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল।[৪৬] বাঘগুহার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের তুলনায় ভিত্তি চিত্রগুলি অপূর্ব। অজন্তা ও বাঘের চিত্রগুলি শিল্পদক্ষতার বিচারে সমপর্যায়ভুক্ত। চিত্রগুলি এক স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও দক্ষ তুলির টানে জীবন্ত। প্রভেদ এটুকুই যে অজন্তার চিত্রকলা বেশীরভাগই ধর্মমূলক, জাতক ও বৌদ্ধকাহিনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত। অপর দিকে বাঘগুহাচিত্র সমসাময়িক মানুষের আবেগে মূর্তমান। মানুষের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, জীবন ও ধর্মের সমন্বয়ে সৃষ্ট। একই সময়ে একই গোষ্ঠীর মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এই চিত্রগুলির শৈলী সাবলীল।

উল্লেখযোগ্য চিত্র হল — বাঘের চিত্রের বিষয় ‘হল্লীসক’ অর্থাৎ একজন পুরুষকে ঘিরে বহু নারীর নৃত্যদৃশ্য যা রঙ্মহল নামক গুহায় একজন পুরুষকে ঘিরে নারীদের নৃত্যদৃশ্য। মনোরম উজ্জ্বলবর্ণের এই চিত্রে একটা ছন্দোময় ভাব-ব্যঞ্জনা আছে। অজন্তার চিত্রে যেমন একটা ছাড়া ছাড়া ভাব আছে, সেখানে বাঘের চিত্রকলা compactness যুক্ত। যেন পূর্ব থেকেই প্ল্যান করে আঁকা, চিত্রগুলি বেশী রিয়ালিস্টিক

ও ঘন কম্পোজিশন যুক্ত। মূলতঃ অজনতার চিত্ররীতি যে বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল বাঘগুহার চিত্রগুলিই তার প্রমাণ। বাঘগুহার চিত্রগুলি অজন্তারীতিতেই চিত্রিত হয়েছিল। কারণ, চিত্রাঙ্কণ রীতি, পুরুষ ও নারীর কেশসজ্জা, পোষাক প্রকৃতি দেখে বাঘের ছবির সাথে গুপ্তযুগের শেষদিকের ভাস্কর্যের বেশ মিল লক্ষ করা যায়। মূলতঃ বাঘগুহাচিত্রকে আলাদা কোনো শিল্পরীতি দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। শিল্পীরা অজন্তা চিত্ররীতিতেই তা চিত্রিত হয়েছিল।

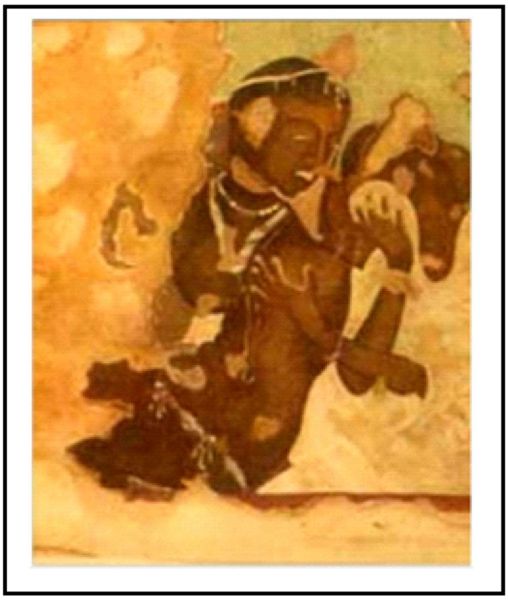

চিত্রসংখ্যা : ৯১

বাঘগুহার ৪নং গুহাচিত্রটি হল দুটি নারীমূর্তি মুক্ত কক্ষে উপবেশিতা, তার মধ্যে এক নারী শোকে মুহ্যমান, অপর নারী সমব্যথিত ও চিন্তাগ্রস্তা হয়ে সেই শোককাহিনী শুনছে, শোকের এমন জীবন্ত মূর্তি চিত্রজগতে দুর্লভ। চিত্রটিতে শোকভাব হেতু করুণ রসের উপস্থাপন ঘটেছে। দুই নারীর মধ্যেই এই শোকভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভাবপ্রধান এই চিত্রটিতে করুণরস ব্যক্ত হয়েছে তাদের বসবার ভঙ্গী, পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। চিত্রে দুই নারীর মুখভঙ্গি থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে এখানে শোকভাব প্রকাশ পাচ্ছে।

চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — ঐ দুই নারীর উপবেশন ভঙ্গীটি শিল্পী এমনভাবে তাদের দৈহিক বর্ণনা দিয়েছেন, তার দ্বারা তাদের মনে যে দুঃখের বাতাবরণটি রচিত হয়েছে, তার প্রতিফলন এখানে স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে। চিত্রে না বলা কথার মধ্য দিয়ে তাই দুঃখরূপ কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে।

চিত্রটিতে রীতিগত দিক থেকে অজন্তা চিত্ররীতিই প্রকাশিত। অজন্তার শিল্পী যেমন ভাবপ্রধান চিত্রঅঙ্কণ করেছেন, বাঘগুহার শিল্পী সেই ভাবটি এখানে অনুকরণ করেছেন।

ঐ গুহার অপর একটি চিত্রে দেখা যাচ্ছে আনন্দের রূপ, দুই দল বাদ্যকারিণী এবং দুজন নর্তকী ঘন, মন্দির, কাঠি এবং অবনদ্ধ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছে তারা আনন্দে বিভোর। চক্রাকারে সাজানো নর্তকীদের মতো একে অপরের বিপরীত দিকে হেলে পড়ায় তাদের ছন্দোময় নৃত্যের দৃশ্য অনবদ্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।

এই সারির শেষ চিত্র একটি হাতির মিছিল, এই চিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রণ অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের তাল, মান, প্রমাণ-এর ছাপ স্পষ্ট।

শেষকথা ঃ

সপ্তদশ শতাব্দীর তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের মতে বৌদ্ধশিল্প তিনভাগে বিভক্ত - দেব, যক্ষ, নাগ। এই বিচারে অজন্তা চিত্রে যক্ষ ও নাগ শৈলীর ব্যবহার দেখা যায়। মহারাজ অশোকের সমকালে যক্ষ শিল্পশৈলী ও তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দে প্রচলিত ছিল নাগ শিল্পশৈলী। বৌদ্ধধর্মানুযায়ী অজন্তার মূর্তি ও চিত্রণের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনাড়ম্বর হীনযান ও আড়ম্বরপ্রধান মহাযান ধারা লক্ষ্য করা যায়।

রসোত্তীর্ণ শিল্পগুণে সমৃদ্ধ অজন্তাচিত্রকে শিল্পশাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যা করা যায় —

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য বর্ত্তনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণামিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরেজনাঃ।।[৪৭]

অর্থাৎ আচার্যরা রেখার অনুরাগী, বিচক্ষণ বর্তনায় মোহিত হন, স্ত্রীগণ ভূষণ অলংকারের অনুরাগিনী এবং ইতরজন বর্ণের পক্ষপাতি। তাই অজন্তাচিত্রের পরিপূর্ণ রস গ্রহণ করতে হলে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। বর্ণ, বর্তুলতা, অলংকরণ, বস্তু সংস্থাপন ইত্যাদি ভালো লাগলেও চিত্র ষড়ঙ্গ মেনেই হবে —

রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্।
সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্।।[৪৮]

রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য, বর্ণিকাভঙ্গ এগুলি চিত্রশিল্পের প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশৈলী এগুলিকে নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। অজন্তার পরিপ্রেক্ষিতে চিত্রণ স্বাভাবিক, মহাপুরুষ চরিত্রগুলির ভূমিরেখা এবং শীর্ষরেখা অনুযায়ী সুষ্ঠ পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত। অজন্তা চিত্রের বৈশিষ্ট্য হল এর গতিশীলতা, মানুষ, দেবদেবী, পশুপক্ষী এখানে সবাই জীবন্ত। তাই ২০নং গুহার হস্তী মূর্তি গতিমান, ১৭নং গুহার গন্ধর্ব মূর্তি, মৃগ দম্পতি, গজ জাতকের চিত্রবলী সকলেই নিজ নিজ ভঙ্গীতে গতিবান।

দেব চরিত্র চিত্রণ উপযুক্ত অনুলোম পদ্ধতিতে রেখা অর্থাৎ উপর থেকে নীচে রেখা ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবতঃ দশতাল এর পূর্ণাবয়ব, কুক্কুটাণ্ডাকৃতি এর বদন, ধনুষাকৃতির্বা ভ্রুযুগল, পদ্মপলাশলোচন, গজতুণ্ডাকৃতিঃ স্কন্ধ ও করীকরাকৃতিঃ বাহু, গোমুখাকারম্ শরীর ও সিংহকটিতুল্য শরীর মধ্য এবং প্রস্ফুটিত কমলতুল্য পাণিযুগল। প্রতিটি অঙ্গ দেবভাগে পূর্ণ। ত্রিভঙ্গগঠনে স্থির এ মূর্তির ডান হাতে ধরা নীলপদ্ম। জীবনের চরম সিদ্ধান্তক্ষণের যে ভাব শিল্পী তথাগতের মুখে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তা বর্ণনাতীত।

অজন্তা চিত্রের প্রতিফলিত হয়েছে শ্বাস-প্রশ্বাস, যেখানে চিত্রগুলি গতিময় ও জীবন্ত, এই একই কথা শিল্পশাস্ত্রেও বলা হয়েছে। শিল্পশাস্ত্রে শুভচিত্র লক্ষণ হচ্ছে

শ্বাস-প্রশ্বাসযুক্ত জীবন্ত চিত্র —

সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।[৪৯]

চিত্রই হচ্ছে সমস্ত শিল্পের উৎস এবং জনসমক্ষে সবচেয়ে বেশী সমাদৃত। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে —

চিত্রং হি সর্বশিল্পানাং মুখং লোকস্য চ প্রিয়ম্।[৫০]

অজন্তা চিত্রকলা ও বাঘগুহা চিত্রকলার মধ্যে গুপ্তযুগীয় শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী চিত্র নির্মাণ দেখা গেছে। তাছাড়াও ঐসব চিত্রসমূহের মধ্যে ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র সম্মত রস, রীতি, ধ্বনির প্রাসঙ্গিকতাও এসেছে। রস, রীতি, ধ্বনি চিত্রগুলিকে সহৃদয় দর্শকের নিকট আকর্ষনীয় করে তুলেছে। রীতির মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে চিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ; রস শিল্পের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা শিল্পের আভ্যন্তরীণ ভাষাকে মূর্ত করে তুলেছে।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *কামসূত্র,* ৩য় অধ্যায়।

২। Shah, Priyabala. *Visṇudharmottara Purāṇa*, 3rd Khanda, PP. XXVII.

৩। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩য় খণ্ড, ৪৫.৩৮।

৪। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩য় খণ্ড, ৩৫.৫-৭।

৫। *কামসূত্র,* ৩য় অধ্যায়।

৬। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ৩য় খণ্ড, ২.৪।*

৭। Manomohan Ghosh (Ed.), *Abinayadarpana*, P. 15.

৮। *নাট্যশাস্ত্র,* ১.১১৬।

৯। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ১.৩.৩০-৩১।

১০। *অমরকোষ,* পৃ. ৩২।

১১। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ৩য় খণ্ড, ৩৫.২-৩।*

১২। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ৬.১৪।

১৩। *কামসূত্র,* বিদ্যাসমুদ্দেশ প্রকরণ।

১৪। *Aristotle's Poetics*, Chap. 1.

১৫। *রঘুবংশ,* ১৬.১৬।

১৬। Dr. K. Krisjnamoorthy : *Studies in Aesthetics and Criticism*, P. 7, Mysore, 1979.

১৭। *বস্তুশাস্ত্র,* ডি. এন. শুক্লা (সম্পা.) গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮০।

১৮। *তদেব,* পৃ. - ৪৮০।

১৯। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ৩য় খণ্ড।*

২০। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৪১.১১।

২১। *কামসূত্র,* যশোধর পণ্ডিত - জয়মঙ্গলটীকা, ১.৩.১৫।

২২। *পঞ্চদশী,* চিত্রদীপপ্রকরণ, কারিকা ১-২।

২৩। *পঞ্চদশী,* চিত্রদীপপ্রকরণ, কারিকা ২-৩।

২৪। *পঞ্চদশী,* চিত্রদীপপ্রকরণ, কারিকা ৪-৫।

২৫। *বস্তুশাস্ত্র,* ডি. এন. শুক্লা (সম্পা.) গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।

২৬। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ৬.১৪।

২৭। Dr. K. Krisjnamoorthy : *Studies in Aesthetics and Criticism*, P. 7, Mysore, 1979.

২৮। *অভিলষিতার্থচিন্তামণিঃ,* ৩.১.৯৪২।

২৯। *শিল্পরত্ন,* ১.৪৫.১৩৯-১৪৪।

৩০। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ৩য় খণ্ড; ৪০ অধ্যায়; শিল্পরত্ন, ১.৪৬.১৪-১৫।

৩১। অনিল চন্দ্র বসু (সম্পা.), *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ভূমিকা - পৃ. ১১-১২।

৩২। *ধ্বন্যালোক, প্রথম উদ্যোত।*

৩৩। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ,* ৩.১।

৩৪। *নাট্যশাস্ত্র, ২১.৬০-৬৫।*

৩৫। A. K. Coomaraswamy : *History of Indian and Indonessian Art*, 1959, P. 49.

৩৬। *কুমারসম্ভবম্,* ৩.৫৪।

৩৭। E. B. Havell : *The Indian Sculpture & Painting*, পৃ. - ১৬৪।

৩৮। James Ferguson : *The Cave Temple of India*, 1969, Page 320.

৩৯। G. Yazdani : *Ajanta Text*, 1930, P - 3.

৪০। *তদেব*, পৃ. – ২৪।

৪১। *তদেব*, পৃ. – ৬।

৪২। Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, পৃ. – ১৮৮।

৪৩। Mukuk Chandra De : *My Piligrimages to Ajanta and Bagh*, পৃ. – ১৮৩।

৪৪। G. Yazdani : *Ajanta Text*, Part I, Page 29.

৪৫। *তদেব*, পৃ. – ৩১।

৪৬। দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ঃ *বাঘ ও অজন্তা*, ১৩৬২, পৃ. – ৩৬।

৪৭। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ৩.৪১.১১।*

৪৮। *কামসূত্র, ১.৩.১৫।*

৪৯। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, ৩য় খণ্ড।*

৫০। *বাস্তুশাস্ত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়, চিত্রলক্ষণম্।

(খ) ভাস্কর্য

ভারতবর্ষ ভাস্কর্যময় দেশ। ভাস্কর্যে যে নান্দনিক সফলতার শিখর স্পর্শ করেছেন ভারতীয় শিল্পী, সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। দুটি ধারায় বিবর্তিত হয়েছে এই ভাস্কর্য। একটি লৌকিক, অন্যটি মার্গীয়। লৌকিকের মধ্যে রয়েছে সাধারণ জীবন প্রবাহের বিচ্ছুরণ। ধ্রুপদী বা মার্গীয় ভাস্কর্য এই লৌকিক থেকে রসদ সংগ্রহ করেছে। তার সঙ্গে মিলিয়েছে বর্হিবিশ্ব থেকে আহৃত রূপকল্প। মানুষ সুন্দরের পূজারী। শিল্পশাস্ত্র, রসশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র ইত্যাদি রচিত হওয়ার বহু পূর্বে মানুষ সৌন্দর্য সচেতন ছিল। বিস্ময় সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশের সিংহদ্বার-তুল্য। *বেদ*-এর উষা-স্তব এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের নানা শিল্পকর্ম সৌন্দর্য বর্জিত নয়। সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প সৌন্দর্যেরও বিবর্তন ঘটেছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের উৎস সন্ধানে আমাদের চলে যেতে হয় খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার বছর পূর্বের সিন্ধুসভ্যতায়, সেখানে উন্নত ভাস্কর্যের কোন নিদর্শন পাওয়া না গেলেও ধ্বংসস্তুপের মধ্যে যে সকল মূর্তি পাওয়া গেছে, তা থেকে বোঝা যায় তৎকালীন শিল্পীরা বহু পূর্বকাল থেকে একটি সুনির্দিষ্ঠ ধারায় ভাস্কর্যবিদ্যার অনুশীলনে যত্নশীল ছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনতম যে ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তা প্রায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ সহস্রাব্দে - নব্যপ্রস্তর যুগের। তবু ভারতবর্ষে ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনগুলির অন্যতম উৎস সিন্ধু সভ্যতা (খ্রি. পূ. ৩০০০ - ১৫০০)।[১] মহেঞ্জোদারো

ও হরপ্পায় ভাস্কর্যের যে নিদর্শনগুলি পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায় রূপায়ণের স্বাভাবিকতাতে লগ্ন থেকেও এক আদর্শায়িত ছন্দিত সুষমায় উত্তীর্ণ হয়েছে রূপাবয়ব। এই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে একটি হিন্দোল অনুভব করা যায়। বৈদিকযুগের কোনও ভাস্কর্য নিদর্শন সেভাবে পাওয়া যায় না, যদিও যজ্ঞবেদী নির্মাণের প্রথা সে যুগে প্রচলিত ছিল। *রামায়ণ*-এ সীতার স্বর্ণমূর্তি নির্মাণ কাহিনী ও *মহাভারত*-এর লৌহভীম ও দ্রোণাচার্যের মৃন্ময়মূর্ত্তি রচনার কাহিনী মাত্র জানা যায়। পরবর্তীপর্বে মৌর্য, সুঙ্গ, কুষাণযুগে ভাস্কর্যশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এরপর একে একে ঐতিহাসিক যুগের অশোক স্তম্ভ, ভারহুত, সাঁচীর উৎকীর্ণ ফলক ও মূর্তি, যা জাতকের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে সাঁচী পর্যন্ত নরনারীর গঠন রচিত হয়েছে নৃত্যের আদর্শে। সাঁচীর সমকালীন অমরাবতীর উৎকীর্ণ মূর্তি বৌদ্ধধর্মাশ্রিত হলেও সেখানে নাটকীয় পরিবেশ স্পষ্ট। নৃত্য ও অভিনয় এই দুই কলা ভারতীয় মূর্তিশিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারহুত, সাঁচী এবং অমরাবতীর জীবনপ্রবাহের পরিবর্তন ঘটেছে পরবর্তীকালে মথুরার বুদ্ধমূর্তিতে। বুদ্ধের ভগবান প্রতীকী থেকে মানুষের রূপ নিয়ে বুদ্ধদেব শিল্প ক্ষেত্রে প্রকাশিত হলেন। কঠিন পাথরকে প্রাণময় করে নির্মিত করার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তৎকালীন শিল্পীদের মধ্যে। সেদিক থেকে মথুরা শিল্পরীতি অনাড়ম্বর ও প্রাণশক্তিতে উজ্জ্বল। আর এই আদর্শের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে গুপ্তযুগের শিল্পে। এর পরবর্তী পর্ব অজন্তা ভাস্কর্যের যুগ, যা গুপ্তযুগে যথেষ্ট উন্নতরূপ নিয়ে নির্মিত হয়। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের রূপটি ভারতীয় ভাস্কর্যের এক মাইলস্টোন বলা যেতে পারে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যবর্তী সময়কাল গুপ্ত-গুপ্তোত্তর যুগের অন্তর্গত, সেখানে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। এই সময়ের ভাস্কর্য মূর্তিগুলি ভারতীয় শিল্পরীতির আনুগত্য ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট ছিল - দেহের নিঁখুত বিন্যাস ও দেহের স্বচ্ছন্দ গতিই গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য। গুপ্ত রাজন্যবর্গ হিন্দু হলেও ধর্মমতে তাঁরা ছিলেন উদারমতাবলম্বী তাই সেই সময় হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন এই তিন প্রধান ভারতীয় ধর্মে বিভিন্ন ধারার ভাস্কর্য ও চিত্র বিকশিত হতে থাকে। যে সব মন্দিরে গুপ্তযুগের শিল্পকলার সৌন্দর্যময় নিদর্শন রয়েছে সেগুলি হল - জব্বলপুরের বিষ্ণুমন্দির, ভূমারের শিবমন্দির, অজয়গড়

রাজ্যের বর্তমান কুবিরের পার্বতী মন্দির, সাঁচী ও বুদ্ধগয়ার বৌদ্ধ স্তুপ, ঝাঁসি বা দেওগড়ের প্রস্তরনির্মিত দশাবতার মন্দির, ভিতরগাঁওয়ের ইষ্টক নির্মিত মন্দির প্রভৃতি। সারনাথের ধ্যানীবুদ্ধ, মথুরার দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি গুপ্তযুগের উৎকৃষ্ট বৌদ্ধ শিল্প নিদর্শন। অজন্তার অধিকাংশ গুহা তক্ষণ, চিত্রণ ও ভাস্কর্যকর্ম এই সময় সম্পন্ন হয়। অজন্তার ১৬নং ও ১৭নং গুহা গুপ্তযুগের কীর্তি। গুপ্তযুগীয় শিল্পে বুদ্ধদেব হলেন ধর্মসংস্কারের অন্যতম প্রতিনিধি। সাহিত্য, অভিনয় এবং শিল্পাচার্যদের নির্দেশ একত্রে মিলে মিশে এক নতুন আঙ্গিকের জন্ম হল। ভারতশিল্পের অনান্য যুগের মূর্তিগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার জন্ম হল গুপ্তযুগে। গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যশিল্পের কতগুলি বৈশিষ্ট্য হল - কঠিন থেকে কোমলতা, সংযম থেকে প্রাচুর্য, আকার ও ভঙ্গির ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষা নাটকীয়ভাবের আতিশয্য, দেব-দেবীর দেহ উপমা অলংকারে সাজিয়ে তোলার চেষ্টা।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভারহুত থেকে শুরু করে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে মথুরা পর্যন্ত যে প্রায় পাঁচশ বছরের জয়যাত্রা, তাতেই ভারতীয় ভাস্কর্য অনেক দুর্যোগের মধ্য দিয়ে নিজস্ব স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। এরই শীর্ষবিন্দু গুপ্তযুগ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বকাল খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়েই বিশেষতঃ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খ্রিস্টীয় ৩৩৫ থেকে ৩৮০ খ্রিস্টাব্দ) সাহিত্য, নাট্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সবদিক থেকেই অসামান্য প্রতিভার আর্বিভাব হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তার পরবর্তী আরো দুজন গুপ্তশাসকের আমলে (খ্রিস্টীয় ৩৮০-৪৯০ খিস্টাব্দ) সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় উন্নতিলাভ করে। বহু হিন্দু শিল্পশাস্ত্র এই সময়ে রচিত। অজন্তা, বাঘ, সিংহলের সিগিরিয়ার ফ্রেস্কো এই সময়েই অঙ্কিত হয়েছে। ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের ইতিহাসে মৌর্য থেকে আরম্ভ করে ভারহুত, সাঁচি, মথুরা, অমরাবতী পর্যন্ত এক যুগ - একে বলা যায় প্রিমিটিভ বা আদিম শিল্প। এর পরবর্তী গুপ্তযুগে শিল্পের ক্ল্যাসিকাল যুগের আরম্ভ। এই যুগে শিল্পের আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন পথের সূচনা করে। বলা যেতে পারে, বহু যুগের, বহু দেশের, বহু সাধনার ধারা গুপ্তযুগের শিল্পকলায় এসে মিলিত হয়েছে। দেশজ শিল্পরীতির সঙ্গে বৈদেশিক শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে তবুও গুপ্তশিল্পী

একেবারে নিজস্ব পরিভাষায় সেই শিল্পকে ব্যক্ত করেছেন। এখানে ভারতীয় শিল্পাদর্শের এবং শৈলীর একীকরণ হয়েছে। এই সময়ে রচিত শিল্পশাস্ত্রের অনুসরণে এই শিল্প রচিত হয়েছে। বহুযুগ ধরে ভারতে শিল্পের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, তাই গুপ্তশিল্পে এসে যেন এক নবতর পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

নৃত্য ও সংগীতের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে ছন্দে গাছ বেড়ে ওঠে, কাণ্ড থেকে পত্রমঞ্জরী নির্গত হয়, লতা মাটির উপর আপন লাবণ্যে এগিয়ে যায়, যে ছন্দে পাখি ওড়ে, সমুদ্রের ঢেউ কলতাল করে আছড়ে পড়ে, সেই ছন্দকেই ভারতীয় শিল্পী আয়ত্ত করেন তাঁর অবয়ব বিন্যাসে। সমভঙ্গই হোক বা ত্রিভঙ্গই হোক শরীরের যে কোন ছন্দিত প্রকাশ ব্যক্তির অহংকে মূর্ত করে তোলে না, বরং তা বিশ্বপ্রকৃতির গতিছন্দের নির্লিপ্ততার আদলটিকে অনুসরণ করে। ভারতীয় শিল্পীরা এটাই প্রমাণ করেছেন মূর্তের ভিতর দিয়ে বিমূর্তকে ধরা যায়। তাঁরা চৈতন্যের বিমূর্ততাকে শরীরের কাঠামোর ভিতর দিয়েই প্রকাশ করতে পারেন। ভারতীয় ভাবধারার মূল ঐশ্বর্য নিহিত আছে এই বৈশিষ্ট্যে। বিগত প্রায় হাজার বছরের ক্রমিক বিকাশের পথে, গুপ্তযুগেই ভারতীয় ভাস্কর্যের একটা স্পষ্ট রূপরেখা চিহ্নিত করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য যে সব ক্ষেত্রে এক এবং অচঞ্চল থেকেছে তা নয়। কাল-ভেদে, অঞ্চল-ভেদে ও অভিব্যক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও এর মধ্যেও প্রকাশে অন্তর্মুখিনতার ও সৌন্দর্যচেতনার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে গেছে, যার মধ্যে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিচ্ছুরণ অনুভব করা যায়।

ভারতবর্ষের শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভাস্কর্যশিল্পই প্রধান ও উল্লেখযোগ্য। ভাস্কর্যবিদ্যা অনুশীলন করার আগে শিল্পী-ভাস্করকে বহু শাস্ত্রীয় বিধান, মূর্তির ধ্যান, রূপতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে তক্ষণ কলাকৌশল আয়ত্ত করতে হয়। চিত্রশিল্পের মতো ভাস্কর্য শিল্পেও ছন্দ, ভারসাম্য, ঘনত্ব বা ওজন, অনুপাত প্রভৃতি নীতি মেনে চলতে হয়। পাশ্চাত্য ভাস্কর্যরীতির বিপরীত ভারতীয় ভাস্কর্য রীতি। ভারতীয় দর্শনানুযায়ী ভাস্করশিল্পীকে ধ্যানযোগ অভ্যাস করে, পরে বস্তু বা বিষয়ের দর্শন করতে হয়। তারপর সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগের বিধান দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়

শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী ভাস্কর্য নির্মাণই হল ভারতীয় শিল্পীদের উদ্দেশ্য। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে দেহের মান পরিমাণকে বলা হয়েছে 'তাল'। ভারতীয় ভাস্কর্য মতে মানবমূর্তি হবে দশতালবিশিষ্ট। ভৈরব, নরসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ অবতার, চণ্ডী, কালিকা প্রভৃতি মূর্তিগুলি দ্বাদশতাল বিশিষ্ট।[২] এরা মূলতঃ সংগ্রামী বা নিষ্ঠুর। ষোড়শতালযুক্ত মূর্তিগুলি অতি ভীষণ ও প্রচণ্ড - সাধারণতঃ অসুর, রাক্ষস, বৃত্তাসুর, রাবণ, হিরণ্যকশিপু, রক্তবীজ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যাক্ষ, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রনেত্র, গজাসুর, তাড়কাসুর প্রভৃতি ষোড়শ তালের অন্তর্গত মূর্তি। অপরদিকে বালমূর্তি নির্মিত হবে পঞ্চতালে। পৌরাণিক কিশোর কৃষ্ণ, বামনদেব, বলদেব প্রভৃতির মূর্তি ষষ্ঠতালে নির্মিত হবে। অতিমানবিক মূর্তি সাধারণতঃ দশতালেই নির্মাণ করা হয়, তাই শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ইন্দ্র, ভার্গব, অর্জুন প্রভৃতি মানবগণকে দশতালে নির্মাণ করাই বিধান। নারীমূর্তির জন্য কোনও অনুপাত নির্দিষ্ট হয়নি। নারীমূর্তি নির্মাণ সময়ে গুণগত পর্যায়ে নির্মিত হবে। ভারতীয় ভাস্কর্যে কোন কোন স্থানে নবতাল মূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়। শাস্ত্রে সত্যযুগে দশতাল, ত্রেতাযুগে নবতাল, দ্বাপরে অষ্টতাল এবং কলিযুগে সপ্ততাল পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছে।[৩]

দেহকাণ্ডের প্রধান বিভাগ ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতির নিঁখুত বিন্যাস, আসন, মুদ্রা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিল্পাচার্যগণ তাঁদের রচিত শিল্পশাস্ত্রে বহু নির্দেশ দান করেছেন। কিন্তু শিল্পীর স্বাধীনতাকে নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ করলে বা তাকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করলে যে শিল্পের প্রাণসত্তাকে আঘাত করা হয়, তা শাস্ত্রকারদের অজ্ঞাত ছিল না। ভাস্কর্যগুলির মধ্যে একটি সমপ্রাণতা ও ঐক্যস্থাপনার জন্য শিল্পাচার্যগণ শিল্পশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। তাই মন্দিরের বিগ্রহ ব্যতীত অন্য মূর্তি রচনায় শিল্পীরা ছিলেন মুক্ত ও স্বাধীন। এই কারণে ভারতে মন্দির সংলগ্ন বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন প্রদেশের মূর্তিতে মূলগত ভাব ও সাদৃশ্য ব্যতীত নানা বিষয়ে অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। এটি শিল্পের দ্বন্দ্ব নয়, এটি তৈরী হয়েছে শিল্পীদের রূপদৃষ্টির তারতম্য ও অভিজ্ঞতার ফলে।

ভারতীয় ভাস্কর্যে হাতের মুদ্রা একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গী। হাতের মধ্য

দিয়ে মনের ভাব ব্যক্ত করার এমন কৌশল পৃথিবীর অপর কোন শিল্পকলায় বা শিল্পশাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়নি। এটি ভারতীয় শিল্পের নিজস্ব ঘরানা। এছাড়া আসন ও মুদ্রা ভারতীয় ধ্যান ধারণার অঙ্গ - যার মধ্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব নিহিত আছে। এজন্যই ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে নৃত্যকলার আঙ্গিকেও মূর্তি নির্মিত হয়েছে - পুরুষের তাণ্ডব নৃত্য ও নারীর লাস্য নৃত্যের তালে ছান্দিক ভাঙ্গীকে 'ভঙ্গে' রূপান্তরিত করে ভাস্কর-শিল্পী সমভঙ্গ, অর্ধসমভঙ্গ, অতিভঙ্গ বা বিষমভঙ্গে তাকে রূপদান করেছেন।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের অন্যতম বিশেষত্ব হল - তার নিজস্বতা। ভারতীয়তার চরম উৎকর্ষ নিহিত হয়েছে এই ভাস্কর্যে। মথুরা, গান্ধার শিল্পের যুগ অতিক্রম করে সম্পূর্ণ অন্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খ্রিস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম খ্রিষ্টাব্দের ভাস্কর্যমূর্তিগুলি।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প মূলতঃ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রিক। এই দুটি ধর্মকে অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে একাধিক মূর্তি নির্মিত হয়েছে। খ্রিস্টীয় ৪র্থ থেকে খ্রিস্টীয় ৭ম শতক পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে ভারতীয় ভাস্কর্যের বিবরণ অঙ্কিত হল যেখানে রস, রীতি, ধ্বনি প্রস্ফুটিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যে 'রীতি' ঃ

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কলমের সৃষ্টি হয়েছিল, ভাস্কর্য শিল্পেও তেমনি বিভিন্ন রাজা বা গোষ্ঠীর সময়ে বিভিন্ন ভাস্কর্য রীতি প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গতঃ এই ভাস্কর্যরীতিগুলি কুষাণ রীতি, গুপ্ত রীতি, গান্ধার রীতি, চালুক্য রীতি প্রভৃতি নামাঙ্কিত রীতি। প্রত্যেক রীতিরই কতগুলি নিয়ম বা মান-পরিমাণ বা প্রথা নির্ধারিত হয়েছে। এভাবে এক গোষ্ঠীর শিল্পরীতি থেকে অপর গোষ্ঠীর শিল্পরীতি স্বতন্দ্র। গুপ্ত ভাস্কর্যরীতি অনান্য যুগের রীতি থেকে স্বতন্ত্র। গুপ্তযুগে স্থানীয় ভাস্কর-শিল্পী তাঁদের প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে মূর্তি নির্মাণ করতেন। পরবর্তীকালে গ্রীক ও ভারতীয় ভাস্কর্যশিল্পের মিশ্রণরীতি সারনাথ ও মথুরা ভাস্কর্যকে

প্রভাবিত করেছিল। মথুরায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রাপ্ত বিখ্যাত বুদ্ধমূর্তির পেছনে উৎকীর্ণ পিপ্পলবৃক্ষটির অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও গুপ্তযুগে এই রীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। তাই গুপ্তযুগের প্রভাবযুক্ত পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের মথুরা ও সারনাথের বুদ্ধমূর্তিতে পিপ্পলবৃক্ষ উৎকীর্ণ হতে দেখা যায় না, তার পরিবর্তে বুদ্ধের মস্তকের চর্তুদিকে কারুকার্যখচিত প্রভামণ্ডল রচিত হতে থাকে। গুপ্তযুগে নির্মিত দেওগড়ের মন্দিরে ঐ যুগের বহু ভাস্কর্য নিদর্শন বর্তমান। রামায়ণের কাহিনী নিয়ে খণ্ড খণ্ড ফলকে নানান চিত্র খোদিত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্প গুপ্তযুগে হিন্দু বৌদ্ধ দুইরকম মূর্তিই পাওয়া যায়। গান্ধার পেরিয়ে বুদ্ধমূর্তি এই সময়ে পূর্ণরূপ পায়। বুদ্ধমূর্তির কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায় যা অনান্য যুগের বুদ্ধ মূর্তি থেকে স্বতন্ত্র। ধ্যানস্তিমিত নেত্র বা নাসাগ্র দৃষ্টি, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, সূক্ষ্ম স্বচ্ছ বস্ত্র; বস্ত্রের ভেতর দিয়ে দেহের গঠন দেখা যাচ্ছে, কাঁধের দুই দিকই কাপড়ে ঢাকা এগুলি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের রীতি। অথচ, কুশাণ যুগের বুদ্ধের ডান কাঁধ খোলা। মাথার পেছনে আলোকমণ্ডল কারুকার্যে পূর্ণ।

এই সময়ের ভাস্কর্যের অপর একটি বিশেষত্ব হল বুদ্ধমূর্তিতে কয়েকপ্রকার মুদ্রা দেখা যায়। যেমন - (১) 'ধ্যানমুদ্রা' - যা দুই কোলের উপর ন্যস্ত। (২) 'ভূমিস্পর্শ মূদ্রা' - যার ডান হাত মাটি ছুঁয়ে আছে। কথিত আছে, মার যখন বুদ্ধকে আক্রমণ করেছিলেন, বুদ্ধ মাটি স্পর্শ করে পৃথিবীকে সাক্ষী মেনেছিলেন। (৩) 'ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রা' - যা সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচারকালীন, দুই হাত বুকের নীচে ন্যস্ত। (৪) 'অভয় মুদ্রা' বা 'বিতর্ক মুদ্রা' - যা ধর্মপ্রচারকালীন, বাঁ হাত কোলের উপর, দক্ষিণ হাত কাঁধের কাছে খোলা।

উল্লেখ্য, গুপ্তযুগের অত্যতম ভাস্কর্যগুলির মধ্যে সারনাথের উপবিষ্ঠ বুদ্ধমূর্তি বিখ্যাত। কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি ভাস্কর্যের নমুনা প্রদর্শিত হল ঃ

ঃ বৌদ্ধ মূর্তি-ভাস্কর্য ঃ

সারনাথের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, সারনাথ, উত্তরপ্রদেশ, খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দী ঃ

প্রথমেই যে ভাস্কর্যের কথা বলা যেতে পারে তা হল গুপ্তযুগীয় সারনাথ বুদ্ধ। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারকালীন মূর্তিগুলির মধ্যে সারনাথ বুদ্ধমূর্তি সবদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ৫১/২ ফুট উচ্চ, সাদা বেলে পাথরে নির্মিত, সারনাথের জাদুঘরে রক্ষিত, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত। মূর্তিটি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর উভয় হাত ধর্মচক্র

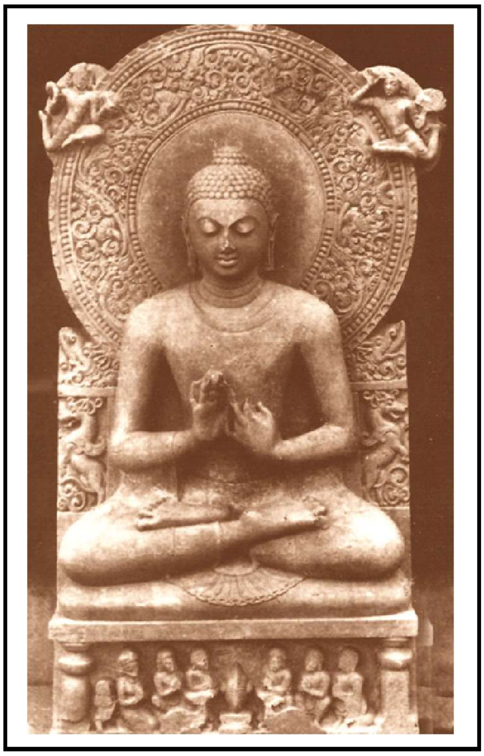

চিত্রসংখ্যা : ৯২

মুদ্রাবদ্ধ - সাধনার শেষে বাণী প্রচার করছেন অত্যন্ত শান্ত ভাবে, এই শম ভাবের জন্য এখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। সাহিত্যে যে শান্তরসের কথা বলা হয়েছে তা এখানে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সাহিত্যে শান্তরসকে নবম রসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। শান্তরস প্রসঙ্গে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেছেন —

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতাঃ।।[৪]

এই শান্তরসের মূলে আছে শম নামক স্থায়িভাব —

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেস্থৈতাষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমো'পি চ।[৫]

সারনাথ বুদ্ধমূর্তির মুখে শান্ত সমাহিতভাব বা শমভাব যা সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর মহান বাণী জনতার মাঝে শান্তভাবে প্রচার ও ব্যাখ্যা করছেন। সাহিত্যের পাশাপাশি অর্থাৎ ভাস্কর্য যে রসোদ্দীপক হয়ে উঠেছে এ তারই দৃষ্টান্ত।

গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের রীতি হল অত্যন্ত মসৃণ সরস ও সরল তণুদেহ, পাতলা আলখাল্লায় আবৃত, যার অস্তিত্ব কণ্ঠের নিম্নভাগের গোল রেখা ও হাতের উপরের সরু রেখা থেকে অনুভব করা যায়। পাথর কেটে ভাস্কর শিল্পী এই মূর্তিকে করে তুলেছেন কমনীয় জীবন্ত এক দেবদেহ। পশচাতে গোলাকৃতি বৃহৎ প্রভামণ্ডল - মণ্ডলের ধার চক্রাকারে অলঙ্কৃত। চক্রের উভয়পাশে দুটি গন্ধর্বমূর্তি খোদিত আছে। চক্রের মধ্যভাগ সমতল থাকায় মুখের ভাবটি বুঝতে খুব সুবিধা হয়। আসনতলে ভক্তগণ, মধ্যে ধর্মচক্র স্থাপন করে উভয়পাশে প্রার্থনারত। বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক নিয়ে এই মূর্তি নির্মিত হয়েছে। এই ভাস্কর্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তন মুদ্রার ব্যবহার, সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচারকালীন, দুই হাত বুকের নীচে ন্যস্ত। ডান হাতের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করে বামহাতের মধ্যমা দ্বারা পৃষ্ঠ হয়। একমাত্র উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তিতে এই মুদ্রা প্রযুক্ত হয়েছে। এই মুদ্রা কেবল সারনাথে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সময় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলিই অনান্য যুগের বুদ্ধমূর্তি থেকে এই মূর্তিকে পৃথক করেছে।

ভারতীয় শিল্পাচার্য মূর্তির অঙ্গবিন্যাস সময়ে দেহের ক্ষুদ্রতম অংশটিকেও উপেক্ষা করেননি। প্রতি অঙ্গের মধ্যে তাঁরা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রাণসত্তার অনুসন্ধান করেছেন।

বিশেষভাবে বাক্যালাপের সময় মুখভাবের সঙ্গে সঞ্চালিত হস্ত ও অঙ্গুলির সংযুক্তি ভাষা ও ভাবের শক্তি বৃদ্ধি করে। ধ্যান বা কথোপকথনের সময়ে হস্ত বা অঙ্গুলীর বিশেষ বিন্যাসকে বলা হয় মুদ্রা। দেবতা ও অতিমানব মূর্তির ভাস্কর্যে মূদ্রা প্রয়োগ একটি শাস্ত্রীয় বিধান। বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের সময় বৌদ্ধ সাধু ভাস্কর তাঁদের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারেননি। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ্য রীতির কাছে ঋণী। কারণ অপ্রাকৃত দেহের মাধ্যমে নরদেহে ঐশ্বরিক ভাব প্রকাশ করার রীতি ব্রাহ্মণ আচার্যগণ প্রথম প্রচার করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তার পরেও ভারতীয় শিল্পরীতিতে ব্রাহ্মণ্য ভাস্কর্যের আদর্শ শিল্পের বিভিন্নশাখায় প্রভাব বিস্তার করেছিল যা ব্রাহ্মণ্য শিল্পশাস্ত্র থেকে জানা যায়।[৬]

দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, মথুরা ঃ

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন হল দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি যা বর্তমানে মথুরা জাদুঘরে রক্ষিত। এটি ৭ফুট ২$^{১}/_{২}$ ইঞ্চিক উচ্চতা বিশিষ্ট। বুদ্ধমূর্তিটিতে গুপ্তযুগীয় শৈলী দেখা যায় - স্বচ্ছ কাপড়ের ভিতর দিয়ে দেহের গঠন দেখানো হয়েছে। বাঁ হাতে কাপড়ের আঁচল ধরা - যা গুপ্ত ভাস্কর্যের রীতি। মথুরা যখন সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে এলো, তখনও মথুরার শিল্পীরা কুষাণ-রীতিতেই শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। এই সময় মথুরায় গ্রীক শিল্পশৈলীর সংস্পর্শে কুষাণ শিল্পশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটে, ফলস্বরূপ মথুরা গুপ্তশৈলীর উদ্ভব হয়।[৭] মথুরা গুপ্তশৈলীতে যে দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হল, তার কতগুলি নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। মানুষের আকৃতিতে বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হতে থাকলো। আভঙ্গ আকৃতির এই মূর্তিতে সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, দেহের ওপর কাপড়ের ভাঁজ পরিলক্ষিত হল, যা এই শিল্পরীতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কুষাণযুগের মতো খুব স্পষ্ট ভাঁজ না থাকলেও একরকম সূক্ষ্ম ভাঁজে সমগ্র দেহ আচ্ছাদিত হতে দেখা যায়। সারনাথ বুদ্ধে যেমন কাপড়ের সুক্ষ্ম ভাঁজ দেখা যায়, তেমনি। কাপড়ের ভাঁজের মধ্য

চিত্রসংখ্যা : ৯৩

দিয়ে দেহাবয়ব প্রকাশমান। বুদ্ধের মস্তকে কুঞ্চিত কেশ এবং মস্তকের পশ্চাতে কারুকার্যময় আলোকমণ্ডলে পূর্ণ।

গুপ্তযুগীয় রীতির পাশাপাশি এই বুদ্ধমূর্তিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। বুদ্ধ এখানে অভয়মুদ্রায় দণ্ডায়মান, (যদিও দক্ষিণ হস্ত ভঙ্গুর)। তিনি জনগণকে আশ্বস্ত করছেন। ধ্যানস্তিমিত নেত্রদ্বয়ের নাসাগ্রদৃষ্টি এখানে শমভাব উদ্রেক করেছে, তাই এখানে নবমরস শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। সঞ্চারী ভাবরূপে এখানে করুণ রসের উপস্থাপনা ঘটেছে।

এই ভাস্কর্যমূর্তির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — বুদ্ধের মস্তকের পশ্চাৎদেশে যে আলোকমণ্ডল রয়েছে, তা বুদ্ধদেবকে দেবত্বে উন্নীত করেছে। এটি সাংকেতিক প্রতীকমাত্র। গুপ্তযুগে মানুষের আদলে যে দেবমূর্তি নির্মিত হতে থাকে, তাতে দেব

ভাব দান করার জন্য শিল্পীরা মস্তকের পেছনে আলোকমণ্ডল রচনা করতে থাকলেন।

ভাস্কর্যটিতে রস, রীতি, ধ্বনির এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে।

সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি (সুলতানগঞ্জ, বিহার) বর্তমানে বার্মিংহাম জাদুঘরে রক্ষিত, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী ঃ

সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বিরাট আকৃতির ধাতুনির্মিত বুদ্ধমূর্তি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যশৈলীর এক অন্যতম নিদর্শন। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত এই বুদ্ধমূর্তিটি বর্তমানে বার্মিংহাম জাদুঘরে রক্ষিত। মূর্তিটিতে সূক্ষ্মবস্ত্রের মধ্যদিয়ে দেহাবয়ব প্রকাশিত হয়েছে। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী ক্ষীণকটিদেশ ও প্রশস্ত বক্ষযুক্ত মহাপুরুষের আকৃতিতে এই ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে। মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, ধ্যানমগ্ন নাসাগ্র দৃষ্টি, বৃহৎ কর্ণ যা মহাপুরুষের লক্ষণযুক্ত। দক্ষিণহস্ত অভয়মুদ্রায় স্থিত, বামহস্তে বস্ত্রের প্রান্তদেশ ধরে আছেন।[৮] আভঙ্গ এই

চিত্রসংখ্যা : ৯৪

মূর্তিটিতে গুপ্তযুগীয় রীতি প্রকাশমান। যদিও মূর্তিটি গুপ্তোত্তর যুগে নির্মিত, তবুও এর মধ্যে গুপ্তশৈলীর ছাপ স্পষ্ট।

মূর্তিটিতে শান্তরস উপস্থাপিত হয়েছে। দুই চক্ষু নিমীলিত, নাসাগ্র দৃষ্টি এখানে ধ্যানের ভাবটি ব্যক্ত করেছে। শমভাব প্রকাশক বুদ্ধমূর্তিটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

এই ভাস্কর্য মূর্তিটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — দক্ষিণ হস্ত অভয়মুদ্রায় স্থিত, তাই এর দ্বারা তিনি জগৎবাসীকে আশ্বস্ত করছেন, ভয়হীন করছেন, বামহস্তে ধ্যানমুদ্রা দেখা যাচ্ছে, ফলতঃ এখানে তিনি জগৎবাসীর উদ্দেশ্যে অভয়দান করছেন।

ভাস্কর্যটিতে রস, রীতি, ধ্বনির সার্থক উপস্থাপন ঘটেছে।

মুকুটশোভিত বুদ্ধ, সারনাথ ঃ

গুপ্তযুগীয় অপর একটি ভাস্কর্য মূর্তি হল আনুমানিক পঞ্চমশতকের মুকুটশোভিত

চিত্রসংখ্যা : ৯৫

বুদ্ধ মূর্তি। এটি উত্তরপ্রদেশের সারনাথে প্রাপ্ত, বর্তমানে ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত। বেলেপাথরে নির্মিত এই মূর্তিটি সমভঙ্গ প্রকৃতির। দণ্ডায়মান এই মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হল মস্তকে দীর্ঘ মুকুট শোভিত, যা অবলোকিতশ্বরের মস্তক মুকুটকে মনে করিয়ে দেয়। দুই হাত ভগ্ন হওয়ায় কোন মুদ্রা এখানে প্রকাশিত হতে দেখা যায় না। মুখমণ্ডলে একটা স্মিত হাস্যময় ভাব বর্তমান, কেননা গুপ্তযুগীয় মূর্তিশিল্পের বিশেষত্বই হল দেবতার মূর্তি নির্মিত হবে যার মুখমণ্ডল হবে স্মিতহাস্যময়। দেহে সূক্ষ্মবস্ত্রের পরিধান, পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান এই মূর্তিতে অলংকারের বাহুল্য দেখা যায়। এই মূর্তিতে শম এই ভাবহেতু শান্ত রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, সারনাথ ঃ

উত্তরপ্রদেশের সারনাথে প্রাপ্ত অপর একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, যেখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। মূর্তিটি বর্তমানে ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত, আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত। বুদ্ধমূর্তির মুখমণ্ডলে শান্ত সমাহিত ভাব লক্ষ্য করা যায়।

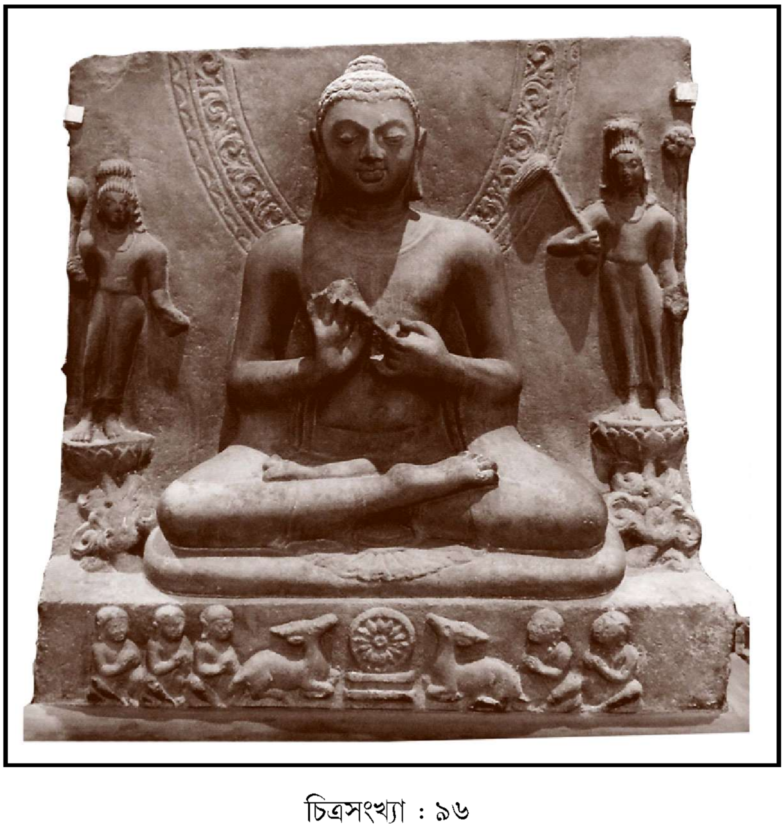

চিত্রসংখ্যা : ৯৬

তাই এখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। দুই হাত ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রায় বক্ষের নিম্নভাগে ন্যস্ত যার দ্বারা ধর্মপ্রচার ঘটনাটি ব্যঞ্জিত হচ্ছে। মস্তকের পশ্চাতে কারুকার্যময় 'হ্যালো' এবং পার্শ্বচরিত্র অলংকৃত। বেলেপাথর নির্মিত এই মূর্তিটিকে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট, বিশেষতঃ বসার ভঙ্গী, সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার, পায়ের নীচে উপবিষ্ট ভক্তগণ, অলংকরণে হরিণ ও চক্রের ব্যবহার প্রভৃতি।

মুচলিন্দ নাগ দ্বারা সুরক্ষিত বুদ্ধমূর্তি, বুদ্ধগয়া ঃ

বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শতাব্দীর নাগ মুচলিন্দ দ্বারা সুরক্ষিত বুদ্ধমূর্তি যা বর্তমানে ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত, এই মূর্তিটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, পেছনে নাগ মুচলিন্দের দ্বারা আচ্ছাদিত। পৌরাণিক কাহিনী দ্বারা নির্মিত এই ভাস্কর্যটিতে ভগবান বুদ্ধ ধ্যানমুদ্রায় অবস্থান করছেন, যার দুই হাত কোলের উপর ন্যস্ত। বেলেপাথর নির্মিত এই মূর্তিটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি বর্তমান, বিশেষতঃ সূক্ষ্মবস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত, মস্তকের পেছনে 'হ্যালো' সহ নাগদের কুণ্ডলীময়

চিত্রসংখ্যা : ৯৭

দেহসজ্জা, ধ্যানমগ্ন মুখের ভাব - এগুলি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির পরিচয়বাহী। ধ্যানমগ্নতার শমভাবহেতু শান্তরসের উপস্থাপনার পাশাপাশি ভাস্কর্যটিতে ধ্যানমুদ্রার ব্যবহার হেতু এখানে ধ্যানমগ্নতারূপ ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।

দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, সারনাথ ঃ

গুপ্তযুগে দণ্ডায়মান যেসব বুদ্ধমূর্তি ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে তাদের বেশীরভাগই সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আবৃত - যা গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট। ভারতীয়

চিত্রসংখ্যা : ৯৮

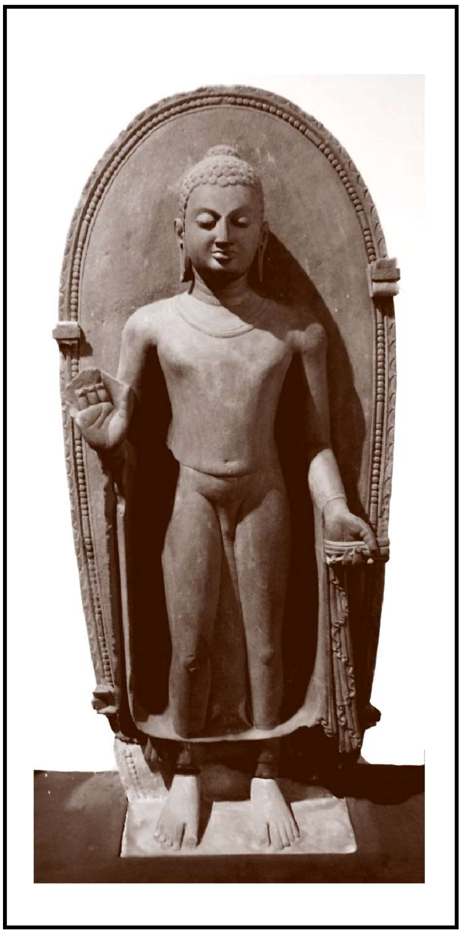

ংখ্যা : ৯৯

জাদুঘরে রক্ষিত আনুমানিক খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নির্মিত, সারনাথে প্রাপ্ত একটি দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিতে এইরূপ রূপাবয়ব বর্ণিত হয়েছে। বেলেপাথর দ্বারা নির্মিত

এই মূর্তিটিতে অভয়মুদ্রা দেখা যায়। এই ভাস্কর্য মূর্তিটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল অভয়মুদ্রায় ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববাসীকে আশ্বস্ত করছেন। মাথার পেছনে গোলাকার 'হ্যালো' তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছে। বুদ্ধের মুখমণ্ডলে শমভাব বিরাজমান, সেইহেতু এই ভাস্কর্যমূর্তিটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি, সারনাথ ঃ

বেলেপাথর নির্মিত আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি ভাস্কর্যটি গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট বহন করে চলেছে। উত্তরপ্রদেশের সারনাথে প্রাপ্ত এই মূর্তিটিতে একপ্রকার বিশেষ কোমর বন্ধনী ও সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত। দেহে অলংকরণ বৈভব ও গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির বৈশিষ্টযুক্ত। মুখে বিশেষ শান্ত সমাহিত ভাব, যা শান্তরসের উপস্থাপনের সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত এই মূর্তিটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল তীক্ষ্ণ নাসাগ্র দৃষ্টি অবলোকিতেশ্বরের ধ্যান মগ্নতার ভাবকে প্রস্ফুটিত করেছে।

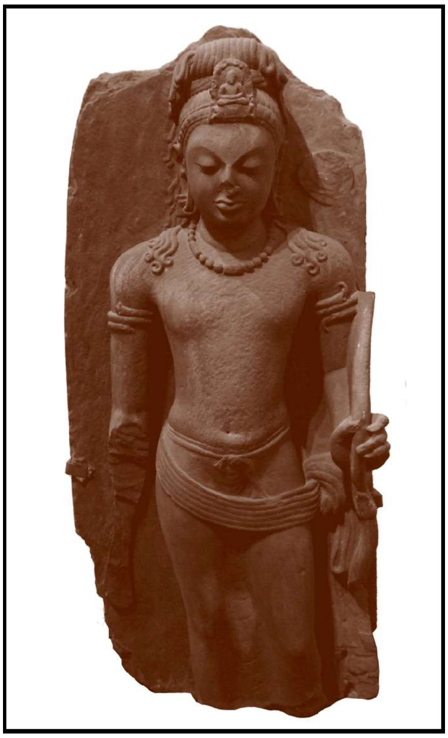

চিত্রসংখ্যা : ১০০

নাগরাজ ও তাঁর সঙ্গিনীর মূর্তি, অজন্তা ঃ

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত অজন্তার ১৯নং গুহার প্রবেশদ্বারে নাগরাজ ও তাঁর সঙ্গিনীর মূর্তি খোদিত আছে। সঙ্গে একজন চামরধারিনী নারীমূর্তি দৃশ্যমান। নাগরাজ ও তাঁর পত্নীর যুগল মূর্তি এটি। নাগরাজের বসবার ভঙ্গিটি

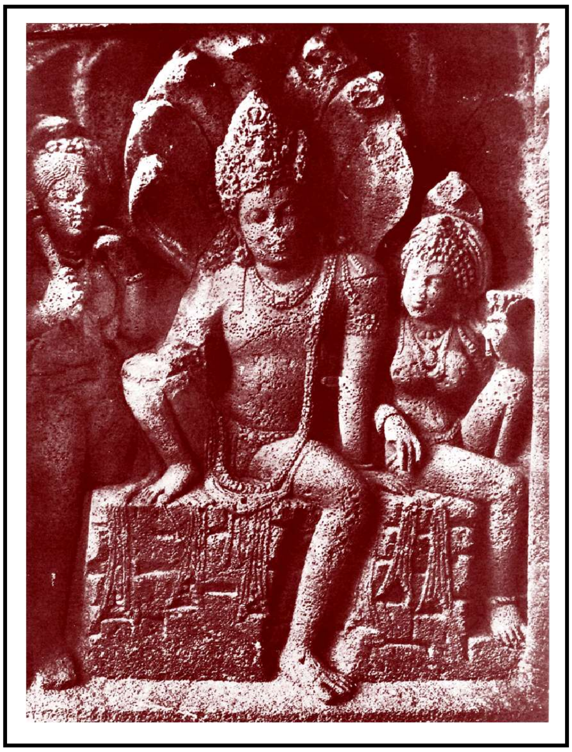

চিত্রসংখ্যা : ১০১

চমৎকার, ডানদিকের পাটি সিংহাসনের উপর রাখা, বাম পা ভূমিতে রাখা। পুরুষমূর্তিটির বামদিকে নারীমূর্তি উপবিষ্ট। নারীমূর্তির বসবার ভঙ্গিটিও চমৎকার। এখানে নাগরাজার মাথায় সর্পবেষ্টিত, রাণীর মস্তকের ওপরে সর্প শোভা পাচ্ছে। নাগরাজার দক্ষিণহস্তটি ভগ্ন, চক্ষু গভীরভাবে ধ্যানমগ্ন, নারীমূর্তিটিরও চক্ষু ধ্যানমগ্ন। এমনকি চামরধারিনী মূর্তিটির চক্ষু ধ্যানমগ্ন। নাগরাজার মস্তকের মুকুটটি অলংকারযুক্ত, কারুকার্যে পূর্ণ। সুক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, দেহ কারুকার্যময় অলংকারে ভূষিত।[৯]

রীতিগত দিক থেকে নাগরাজা রাণীর মূর্তিটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট। এখানে অজন্তা শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

যুগলমূর্তি ভাস্কর্যে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। রাজা-রাণী পরস্পর নিকটে থাকার দরুণ এখানে রতিভাবের উদয় হয়েছে, ফলতঃ শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

মূর্তিটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল, নাগরাজা মূর্তির বামদিকে যে নারীমূর্তি উপবিষ্ট, বামদিকে উপবেশনের জন্য নারীমূর্তিটি যে রাজার সঙ্গিনী বা পত্নী তাই ব্যঞ্জিত হয়েছে। মস্তকের চারিদিকে সর্পবেষ্ঠিত হওয়ায় নাগদের রাজা এই ব্যঞ্জনাটি সার্থক হয়েছে।

যক্ষের মূর্তি , অজন্তা ঃ

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত অজন্তার ১৯নং গুহার প্রবেশদ্বারে যক্ষের ত্রিভঙ্গ মূর্তি খোদিত আছে। মস্তকের পশ্চাতে আলোকমণ্ডল, স্থুলকায় দেহ

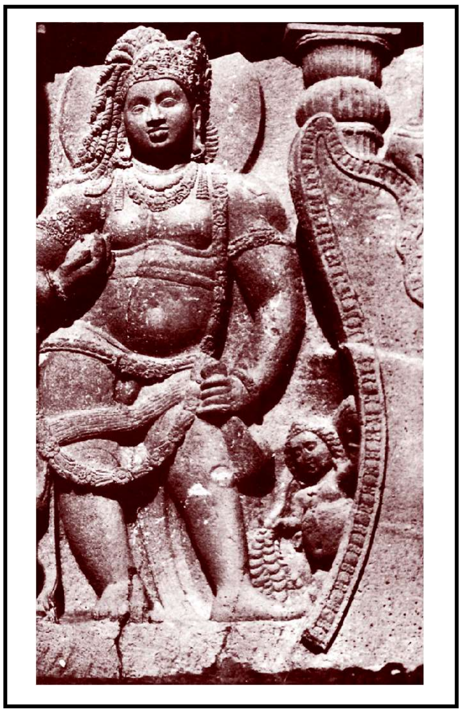

চিত্রসংখ্যা : ১০২

অলংকারে সজ্জিত, কর্ণভূষণ, কণ্ঠা, কণ্ঠাহার ও অঙ্গদ, মস্তকে বিশেষধরণের কেশসজ্জা ও উষ্ণীষ পরিহিত,বাম স্কন্ধ থেকে উপবিত নেমে এসেছে, যা ফুল-লতাপাতা দ্বারা অলংকৃত। যক্ষের হস্তমুদ্রাও বিশেষ অর্থবহ। দক্ষিণহস্ত বক্ষসংলগ্ন, বামহাত কোমরের কাছে সংবদ্ধ, স্ফীত উদর। সূক্ষ্ম বস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, নিম্নবাস হল ধুতি, কোমর থেকে মোটা পাড় নেমে এসেছে, দু-পায়ের মাঝে কোঁচা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি গুপ্তযুগীয় মূর্তিতে দেখা যায়। যক্ষ-এর মূর্তিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট। রীতি বা শৈলীগত দিক থেকে বিচার করলে যক্ষ-এর ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে।

মূর্তিটিতে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে যা কিছু শুভ্র, পবিত্র, সুদর্শন তা শৃঙ্গারের সঙ্গে উপমিত হয়। (নাট্যশাস্ত্র, ৬.৪৫)। সেকারণে যক্ষ মূর্তিতে রতিভাব হেতু শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে। এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — যক্ষের দক্ষিণ হস্তে আছে ধনসম্পদ এবং বামহস্তে আছে টাকার থলি, সুউচ্চ ও বিশাল বপুর দ্বারা তিনি যে ধনপতি ও ধনরক্ষক হিসেবে পূজিত হতেন তা এখানে স্পষ্ট।

বুদ্ধমূর্তি, অজন্তা ঃ

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত অজন্তার ১৯নং গুহার প্রবেশদ্বারে যে বুদ্ধমূর্তিগুলি খোদাই করা আছে সেগুলি নানান মুদ্রাযুক্ত। কোনটিতে ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রা, কোনটি অভয় মুদ্রা, কোনটি দণ্ডায়মান মূর্তি, কোনটি বা উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি - এগুলি সবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির পরিচয়বাহী। মূর্তিগুলিতে সূক্ষ্মবস্ত্রের দ্বারা দেহ আচ্ছাদিত, বস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেহের গঠন দৃশ্যমান, মস্তকের পশচাতে আলোকমণ্ডল, মাথায় কুঞ্চিত কেশ, বৃহৎ কর্ণ, ধ্যানস্তিমিত নেত্র, স্কন্ধের উভয় দিকই কাপড়ে ঢাকা[১০] — এগুলি গুপ্তযুগের ভাস্কর্যের রীতি। রীতিগত দিক থেকে প্রতিটি বুদ্ধমূর্তিতেই অজন্তা শৈলী বা গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতি দেখা যায়।

ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — মূল বুদ্ধমূর্তিগুলির সঙ্গে যে পার্শ্বমূর্তিগুলি দেখা যায়,

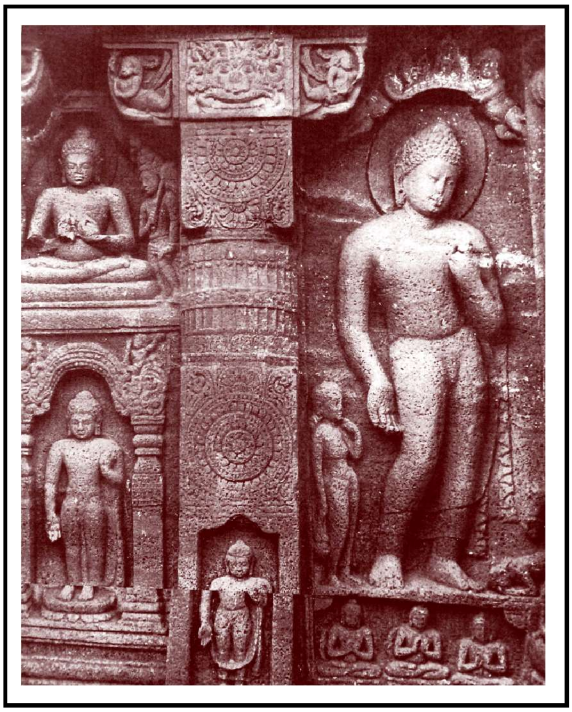

চিত্রসংখ্যা : ১০৩

সেগুলি আকারে এতটাই ক্ষুদ্র যে, তার পাশের বুদ্ধমূর্তিগুলি আকারে বৃহৎ মতে হচ্ছে। মূলতঃ বুদ্ধমূর্তিগুলিকে বড় করে দেখানোই শিল্পীর উদ্দেশ্য। এর দ্বারা মূর্তিটির মাহাত্ম্য কীর্তিত হচ্ছে। হস্তমুদ্রায় ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রার দ্বারা ধর্মপ্রচার ব্যঞ্জিত হচ্ছে। মূর্তিগুলিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। ধ্যানস্তিমিতনেত্রে বুদ্ধদেবের মূর্তিতে শমভাব হেতু এখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে রস, রীতি, ধ্বনিগত দিক থেকে মূর্তিগুলি সার্থকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বুদ্ধের মারবিজয় , অজন্তা ঃ

অজন্তার ২৬নং গুহায় বুদ্ধ ও মারের আক্রমণের যে ভাস্কর্যটি আছে তা আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর। এখানে বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। ভূমি স্পর্শমুদ্রার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — বুদ্ধদেবের ডান হাত মাটি স্পর্শ করে

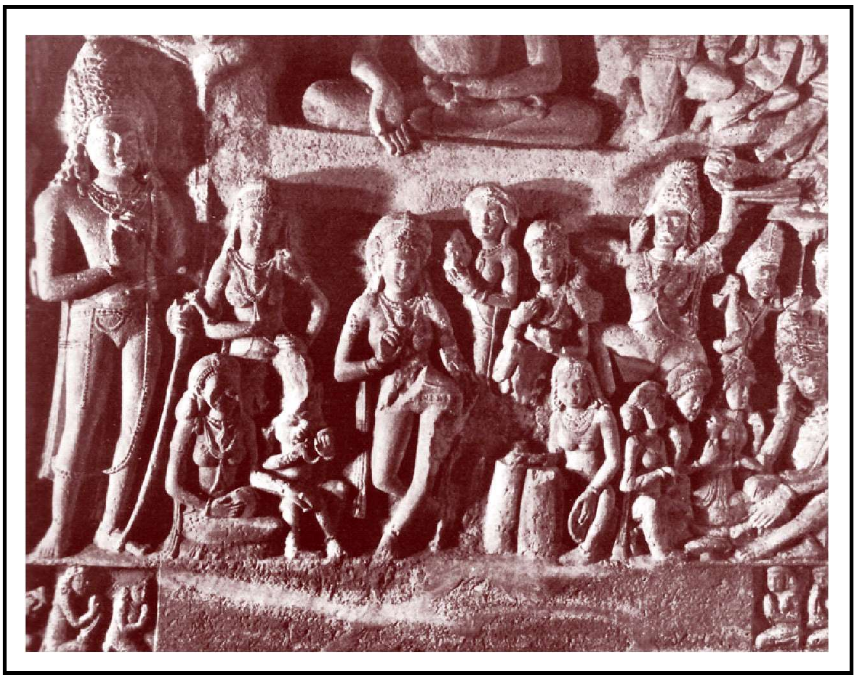

চিত্রসংখ্যা : ১০৪

আছে। অর্থাৎ, মার যখন বুদ্ধকে আক্রমণ করেছিলেন, তখন বুদ্ধ মাটি স্পর্শ করে পৃথিবীকে সাক্ষী মেনেছিলেন। তাই শিল্পী এখানে বুদ্ধের মূর্তিতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রার প্রয়োগ করেছেন। ভাস্কর্যটিতে দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধদেবকে পরিবেষ্টন করে আছে মারের কন্যারা। পরিবেষ্টন করে থাকার ব্যঞ্জনাটি হল — বুদ্ধদেবকে তারা নিজেদের যৌবনশ্রী দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইছে, বুদ্ধদেব যাতে ধ্যানভঙ্গ হয়ে যান, তাই মার কন্যাগণ নিজ নিজ যৌবনরাগে রঞ্জিত হয়ে বুদ্ধকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করছে। অথচ বুদ্ধদেব ধ্যানমগ্ন, শান্ত সমাহিত মূর্তিতে উপবিষ্ট।[১১] একদিকে শান্তরসের উপস্থাপনা, অপরদিকে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপনা ও মারের আক্রমণ ভয়ানকরসের সূচনা করেছে। মার যখন বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করেছিলেন তখন ভয় ভাব উৎপন্ন হেতু ভয়ানকরসের উপস্থাপন ঘটেছে। ভাস্কর্যটিতে মার কন্যাগণ যখন বুদ্ধকে তাদের যৌবনদীপ্ত শরীর দ্বারা আকর্ষণ করার অভিপ্রায় করছে সেখানে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

ভাস্কর্যটিতে ত্রিভঙ্গ নারীমূর্তিগুলির অলংকারবিন্যাস, হস্তমুদ্রার অভিব্যক্তি, সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যবহার, বর্ণনাধর্মী, ভাবপ্রধান বিষয়গুলি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতিকে চিহ্নিত করেছে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ, গুহা নং ২৬, অজন্তা, মহারাষ্ট্র, বাকাটক রাজবংশ, খ্রিস্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষার্ধ।

অজন্তার ২৬নং গুহায় গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির অন্যতম নিদর্শন হল বিরাট শায়িত বুদ্ধের মূর্তি যা বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ নামে প্রচলিত। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত এই ভাস্কর্যটিতে বুদ্ধদেব পাশ ফিরে শয়ন করছেন দক্ষিণহস্তের ওপর মস্তক রেখে, তার মহাপরিনির্বাণ দৃশ্যটি শিল্পী নির্মাণ করেছেন। বুদ্ধের মাথায় কুঞ্চিত কেশ, দুই চক্ষু নিমীলিত, সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, বস্ত্রের ভেতর দিয়ে দেহাবয়ব স্পষ্ট।[১২] পাশ্বমূর্তিগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি কারণ বুদ্ধের মহাপুরুষ লক্ষণকে এখানে বিরাট করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি প্রকাশিত। রেখাপ্রধান ও ভাবপ্রধান গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যশিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা মূর্তিটিতে প্রকাশিত হয়েছে।

চিত্রসংখ্যা : ১০৫

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ হেতু জগতে গভীর দুঃখের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যা পার্শ্বমূর্তিগুলির মধ্যে দিয়ে দেখানোর চেষ্টা চলেছে। মূর্তিগুলি শোকে মূহ্যমান, তাদের হাত মাথায় বা গালের সঙ্গে সংযুক্ত আছে, এই বিশেষ অবস্থা শোকভাবকে ব্যক্ত করেছে, তাই এখানে করুণ রসের সৃষ্টি হয়েছে।

ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — বুদ্ধের বামহস্তের তর্জনী অঙ্গুলীটি বিশেষ মুদ্রায় ন্যস্ত, যেন জগতের প্রতি তিনি নির্দেশ দান করছেন, জগতকে রক্ষা করার

জন্য এই মুদ্রার ব্যবহার হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ ঘটলেও জগতের ত্রাতা তিনি — এই মূল কথাটিই ব্যঞ্জিত হয়েছে।

দেবদেবীর মূর্তি, অজন্তা ঃ

আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত অজন্তার ১৬নং গুহায় যে দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে, সেখানে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। ভাস্কর্যটিতে পুরুষমূর্তিটি উপবিষ্ট, নারীমূর্তিটি দেবমূর্তির পদদ্বদের ওপর উপবিষ্ট। নারীমূর্তিটির দক্ষিণহস্ত পুরুষমূর্তির কণ্ঠলগ্না; এর দ্বারা রতিভাব হেতু শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। পুরুষমূর্তিটি নারীমূর্তির দিকে নত হয়ে আছে, এর দ্বারা আনুগত্য প্রকাশিত হচ্ছে। পুরুষমূর্তির দক্ষিণহস্ত নারী মূর্তিটির পদসংলগ্ন হয়ে আছে। এর দ্বারা কামনার ভাবটি ব্যঞ্জিত হচ্ছে। অজন্তা গুহাচিত্রে নর-নারীর চিত্রণ যেভাবে হয়েছে, ভাস্কর্যেও অনুরূপ শৈলী দেখা যায়। এই যুগলমূর্তির নর-নারীর কেশসজ্জা, অলংকরণ, রত্নহার, উপবীত, উপবেশন ভঙ্গি সবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতে অলংকৃত। ভাস্কর্যটিতে

চিত্রসংখ্যা : ১০৬

শৃঙ্গাররসের চমৎকার উপস্থাপন ঘটেছে। দেব-দেবীর পরস্পররের প্রতি আকর্ষণই এখানে রতিভাবের প্রকাশক। সেহেতু এখানে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত, দেব-দেবী উভয়ের চক্ষু নিমীলিত, এর দ্বারা পরস্পরের গভীর প্রেমাসক্তির ভাবটি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

ঃ ব্রাহ্মণ্য মূর্তি ঃ

শিব-পার্বতী মূর্তি ঃ

ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত লাল বেলেপাথর নির্মিত হর-পার্বতীর মূর্তি ভাস্কর্যটি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের অন্যতম নিদর্শন। এটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর। দ্বিভুজ শিবের অন্যতম নমুনা এটি। উর্দ্ধলিঙ্গ মহাদেবের ডান হাতে অভয়মুদ্রা, বাম

চিত্রসংখ্যা : ১০৭

হাতে কমণ্ডলু ও হাতের উপরে কাপড়ের অংশ, গৌড়ীর ডান হাতেও অভয়মুদ্রা ও বামহাতে দর্পণ। এই মূর্তিটিতে শিব ও পার্বতীর রতিভাব হেতু শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে। পরিহিত বস্ত্র ও অলংকার সজ্জা গুপ্তযুগীয় রীতির পরিচয়বাহী। শিবের বামদিকে দণ্ডায়মান পার্বতী এখানে পত্নীরূপে ব্যঞ্জিত হচ্ছেন। পার্বতী দেবী দুর্গার আর এক নাম, দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করে সতী জন্মান্তরে পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ৫৭.২৪-২৬)। এই পার্বতীই শিবের ঘরণী। হর-পার্বতীর পবিত্র দাম্পত্য মানবজীবনে অনুকরণীয়। বাম হাতে কমণ্ডলু, দক্ষিণহাতে অভয়মুদ্রা উত্তোলিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যরীতির পরিচয়বাহী এই যুগল মূর্তিটিতে রসধ্বনি ব্যঞ্জিত হয়েছে।

রাহু ও অপর তিন গ্রহ মূর্তি ঃ

ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত লাল বেলেপাথর নির্মিত আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাহু ও অপর তিন গ্রহ মূর্তি ভাস্কর্যটি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের অপর একটি নিদর্শন। দণ্ডায়মান তিন গ্রহ-দেবতার সঙ্গে রাহুর মূর্তিটিকে ভয়ানক রসের উপস্থাপন ঘটেছে। পৌরাণিক একটি আখ্যান এই ব্রাহ্মণ্য মূর্তিটির উৎপত্তির পেছনে রয়েছে। রাহুর বিস্ফারিত চক্ষু, অট্টহাস্যময় মুখমণ্ডল, কর্ণের ভূষণ - এগুলি ভয়ানক রসের উদ্দীপন বিভাব রূপে প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যিক ক্ষেত্রে যেরূপ রসের উপস্থাপন ঘটে, এখানে ভাস্কর্যশিল্পের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ভয়ানক রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রসংখ্যা : ১০৮

এখানে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল রাহুর ভয়ে ভীত অনান্য গ্রহ দেবতাগণের ভীত রূপের প্রকাশ ঘটেছে।

মন্দির স্থাপত্যাংশের রিলিফ ভাস্কর্য, ভূমারা, মধ্যপ্রদেশ ঃ

আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ভূমারা, মধ্যপ্রদেশে প্রাপ্ত অলংকৃত মন্দির স্থাপত্যাংশে কয়েকটি ভয়ানক রসের রিলিফ ভাস্কর্য রয়েছে ভারতীয় জাদুঘরে। ভাস্কর্যগুলি গুপ্তযুগীয় অলংকরণ রীতির পরিচয়বাহী। গুপ্তযুগীয় অলংকরণের বিশেষ যে ফুল-পাতার ছন্দের অনুকরণে নক্‌সা দেখা যায়, তারই ছাপ রয়েছে এই ভাস্কর্যগুলিতে। ভয়ানক রসও যে ছন্দের মধ্য দিয়ে অলংকৃত হতে পারে, তারই দৃষ্টান্ত এই ভাস্কর্য অলংকরণগুলি। মন্দিরের স্থাপত্যাংশে যে অলংকরণ রয়েছে তাতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির ছাপ স্পষ্ট। লাল বেলেপাথর নির্মিত এই ভাস্কর্যে অজন্তার চিত্রশিল্পে ফুল-লতাপাতার যে বৈচিত্র দেখা যায়, তা এখানে পাথরে খোদাই করেছেন ভাস্করশিল্পী।

চিত্রসংখ্যা : ১০৯

কুবের মূর্তি ঃ

ধনসম্পদের দেবতা কুবের গুপ্তযুগীয় শিল্পের অন্যতম বিষয়বস্তু। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে নির্মিত কুবেরের ভাস্কর্য মূর্তিটিতেও গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রভাব স্পষ্ট। মস্তকে কেশসজ্জা যা অজন্তা চিত্রকলাতেও দেখা যায়। দেহে সূক্ষ্ম উত্তরীয়ের ব্যবহার, অলংকার সজ্জা, হস্তমুদ্রায় গুপ্তরীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। কালো ব্যাসল্ট পাথরে নির্মিত এই ভাস্কর্যটিতে দেবভাব বর্তমান, তাই মস্তকের পশ্চাতে 'হ্যালো'-র উপস্থিতি, স্থুলচেহারার কুবেরকে ধনসম্পদের অধিশ্বররূপে ব্যঞ্জিত করছে।

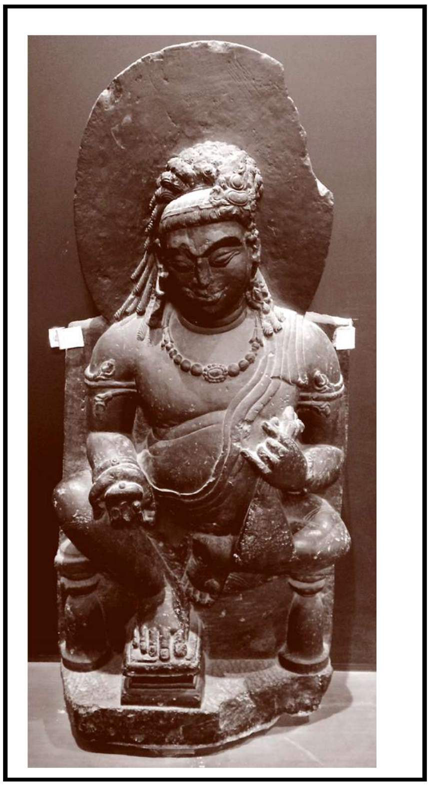

চিত্রসংখ্যা : ১১০

বিষ্ণুর বরাহ অবতার, উদয়গিরি ঃ

হিন্দু ভাস্কর্যের মধ্যে অন্যতম গোয়ালিয়রের উদয়গিরিতে ৫নং গুহায় বিষ্ণুর বরাহ-অবতারের বিশাল মূর্তি খোদাই করা আছে। এটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে

নির্মিত। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী বিষ্ণুর দশ-অবতারের মধ্যে বরাহ হল অন্যতম অবতার। মানুষের দেহে বরাহের মস্তক স্কন্ধে যুক্ত, বাম হাঁটু ভঙ্গ, তাতে বাম হাত আনত। বরাহ আকৃতির মুখমণ্ডলে এর নারীমূর্তি ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এটি দেবীমূর্তি - 'পৃথ্বী'। পশ্চাতে ঋষিগণ শ্রেণীবদ্ধ হয়ে আছেন। নিম্নে জলের প্রবাহ খোদাই করেছেন শিল্পী সেখানে পদ্মফুল ও ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ উপবিষ্ট, এরা সম্ভবত পৌরাণিক

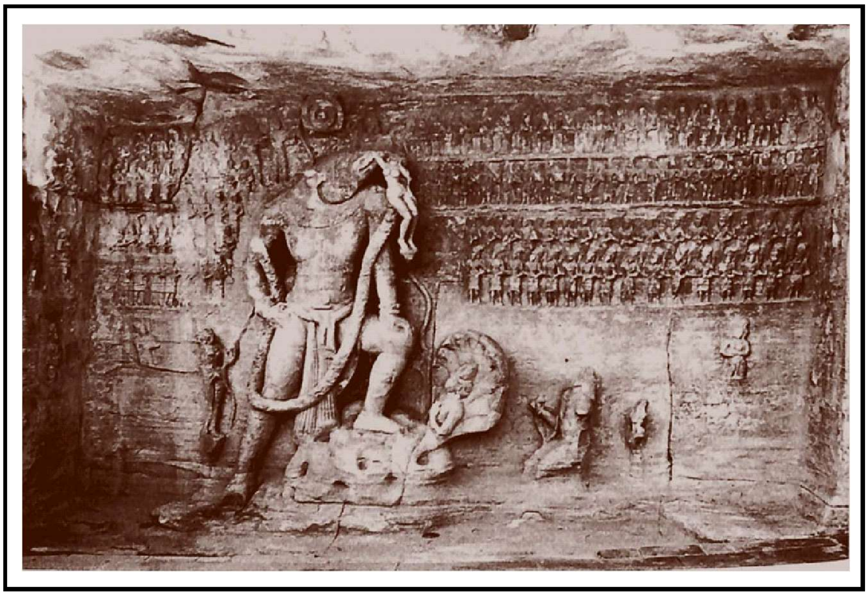

চিত্রসংখ্যা : ১১১

সমুদ্রের দেবতা। এছাড়াও ডানদিকের দেওয়ালে যে দুই নারী মূর্তি দৃশ্যমান, তাদের মধ্যে একজন মকরবাহিনী গঙ্গা ও অপরজন কচ্ছপবাহিনী যমুনারূপে কল্পিত হয়েছে। বরাহদেবের পদপ্রান্তে নাগদেবতা অঞ্জলীমুদ্রায় অবস্থিত।[১৩] বিশাল আকৃতির ত্রিভঙ্গ বরাহ অবতার গুপ্তযুগীয় দেবতারূপে পূজিত। মূলতঃ গুপ্তযুগীয় ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী বিষ্ণুর নানানরূপী অবতারগণ আর্বিভুত হন, যাঁরা পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, এইসব পৌরাণিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে গুপ্তযুগীয় শিল্পীগণ তাঁদের শিল্প সৃষ্টি করতে থাকেন।

এই ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। বরাহ অবতারের দৈহিক বর্ণনা শিল্পী যেভাবে নির্মাণ করেছেন তা শিল্পশাস্ত্রসম্মত। এখানে বিরাট শক্তিশালী

পুরুষমূর্তিরূপে বরাহদেব দণ্ডায়মান। এক পা নাগ এর ওপর, অপর পা ভূমি স্পর্শ করে আছে। শরীরের নিম্নভাগে বস্ত্রের আবরণ দেখা যায়। বামস্কন্ধ থেকে উপবীত নেমে এসেছে। এগুলি সবই গুপ্ত-শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।

ভাবপ্রধান এই ভাস্কর্যটিতে ভয়ানক রসের উপস্থাপন ঘটেছে। বরাহ অবতারের ভীষণ মূর্তিতে ভয়ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। ভীষণরূপে অবতীর্ণ হয়ে বরাহদেব পৃথিবীকে রক্ষা করছেন তাই এখানে ভয়ানক রসের উদ্রেক হয়েছে।

ভাস্কর্যটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — ভাস্কর্যটিতে গঙ্গা ও যমুনা মূর্তিদ্বয়ের অবতারণা করেছেন শিল্পী, তার দ্বারা এই সত্যটি প্রকাশিত হচ্ছে যে মধ্যদেশে ভূমিকে রক্ষা করে গঙ্গা ও যমুনা একসাথে প্রবাহিত হয়ে একজায়গায় মিলিত হয়, সেই ব্যঞ্জনাটিই এই ভাস্কর্যে পরিস্ফুট হয়েছে। গুপ্তরাজাও সেই একইরকমভাবে সাম্রাজ্য রক্ষা করছে বরাহদেবের মত করে। এই বরাহ গুপ্ত রাজা চন্দ্রগুপ্তের প্রতীকীরূপে গড়ে উঠেছে। তাই গুপ্তশিল্প রীতিতে বরাহ অবতার খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ভাস্কর্যটিতে রস, রীতি, ধ্বনি-র একত্র সমাবেশ ঘটেছে।

দশাবতার মন্দির ভাস্কর্য, দেওঘর ঃ

যুক্ত প্রদেশের ঝান্সি জেলায় **দেওঘরের দশাবতার মন্দিরে** (৬ষ্ঠ শতাব্দী) দেওয়ালের তিন দিকে তিনটি বিষয় খোদিত আছে;

ক. বিষ্ণুর অনন্তশয্যা।

খ. নর-নারায়ণ।

গ. গজেন্দ্রমোক্ষ।

অনন্তশয্যায় বিষ্ণু-এর ভাস্কর্য, বিষ্ণু মন্দির, দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ

উত্তরপ্রদেশের দেওঘরের দশাবতার মন্দিরগাত্রে 'অনন্তশয্যায় বিষ্ণু' রিলিফ খোদাই করা আছে। এই মন্দিরগাত্রে এছাড়াও আরও দুটি বিষয়ের রিলিফ খোদাই

চিত্রসংখ্যা : ১১২

করা আছে — গজেন্দ্রমোক্ষ রিলিফ ও নর-নারায়ণ রিলিফ। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের 'অনন্তশয্যার বিষ্ণু' ভাস্কর্যটিতে বিষ্ণু অনন্তনাগের উপর শয়ন করছেন, তাঁর মাথার ওপর শেষনাগের ফণা বিরাজ করছে। বিষ্ণুকে নারায়ণ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে, যাঁর পদপ্রান্তে ভক্তিভরে বিরাজ করছেন লক্ষ্মী। দক্ষিণপার্শ্বে অবস্থান করছেন গরুড়। রিলিফ ভাস্কর্যের মধ্যবর্তী স্থানে পদ্মাসনে অবস্থান করছেন ব্রহ্মা যিনি বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে উৎপন্ন। তাঁর দক্ষিণে অবস্থান করছেন বাহন সহ ইন্দ্র এবং কার্তিকেয়। তাঁদের বামদিকে অবস্থান করছে বাহনসহ শিব-পার্বতী। বিষ্ণুর রিলিফের নীচে যে পৃথক প্রস্তরখণ্ড রয়েছে তাতে চারজন পুরুষ ও একজন নারীর মূর্তি খোদাই করা আছে। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী এরা মধু-কৈটভ। রিলিফে চারজন ব্যক্তি বিষ্ণুর

চারটি অস্ত্রস্বরূপ — গদাদেবী, চক্রপুরুষ, ধনুসপুরুষ, খড়গপুরুষ। মূলতঃ পৌরাণিক কাহিনীর ওপর নির্ভর করে এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছেন গুপ্তযুগীয় শিল্পী। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে নির্মিত এই ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ দেখা যায়।[১৪] নারায়ণ বা বিষ্ণুর দৈহিক গঠন নির্মিত হয়েছে দেবভাবনায়। সূক্ষ্মবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত, যার মধ্য দিয়ে দেহের গঠন স্পষ্ট বোধ হয়। বিষ্ণুর মস্তকের উষ্ণীষটি গুপ্তযুগীয় রীতিতে নির্মিত। করিশুণ্ডের ন্যায় হস্ত, কদলীবৃক্ষসদৃশ পদদ্বয় এবং ক্ষীণকটি — এসবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতে নির্মিত হয়েছে। সুতরাং, রীতিগত দিক থেকে ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি দেখা যায়।

ভাস্কর্যটির রস হল — শান্তরস। শান্তরসকে সাহিত্যে নবম রসরূপে স্বীকার করা হয়েছে। বিষ্ণু অনন্তশয্যায় পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছেন, মস্তকে বামহস্ত বিশ্রামের ভঙ্গীতে রয়েছে, দক্ষিণ হস্ত পায়ের ওপর রেখে নিদ্রামগ্ন। তাই এখানে শম ভাবহেতু শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — বিষ্ণুর অনন্তশয্যার নিম্নভাগে যে প্যানেল আছে, সেখানে নারীপুরুষের মূর্তি দেখা যায়, এরা বিষ্ণুর নাভিদেশ থেকে জাত ব্রহ্মাকে ধ্বংস করতে চায়। সেহেতু ভাস্কর্যটিতে এদের নিম্নভাগে দেখানো হয়েছে এবং স্বয়ং ব্রহ্মা ভাস্কর্যটির উপরিভাগে অবস্থান করছেন। এখানে নারায়ণ বা বিষ্ণুকে স্বয়ং ব্রহ্মারূপে দেখানো হয়েছে।

নর-নারায়ণ ভাস্কর্য, বিষ্ণুমন্দির, দেওঘর, উত্তর-প্রদেশ, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ

নর ও নারায়ণের ভাস্কর্য খোদিত আছে দেওঘরের বিষ্ণুমন্দির গাত্রে। এই ভাস্কর্য দুটি এক স্বর্গীয় প্রীতি ও ত্যাগের প্রতীক। মূর্তিদুটির পরিধেয় অলংকার ও জটামুকুট ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত দেয় না। মূর্তি দুটি গভীর বনের মধ্যে শান্তভঙ্গিতে উপবেশন করে আছেন, যাদের পায়ের নীচে হরিণ ও সিংহ অবস্থান করছে। মূর্তিদুটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে। চারহস্তবিশিষ্ট নারায়ণের উপবেশনভঙ্গী, সূক্ষ্মদেহবস্ত্রের আচ্ছাদন, হস্তধৃত কমণ্ডলু এসবই গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতি প্রকাশক। অপর নর-মূর্তিটির

দৈহিক গঠনেও গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ দেখা যায়। মূর্তিগুলির ওপরের দিকে গন্ধর্ব অপ্সরা, কিন্নর-কিন্নরী প্রভৃতি দেখা যায়। মধ্যবর্তীস্থানে যে নারী মূর্তি দেখা যায় তা উর্বশী বলে অনুমিত।[১৫]

চিত্রসংখ্যা : ১১৩

ভাস্কর্যটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। 'নর' মূর্তিটির হস্ত উত্তোলন দৃশ্যটি এখানে শমভাবের প্রকাশ ঘটাচ্ছে, তাই এখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

বিষ্ণুমন্দিরে নর-নারায়ণের ভাস্কর্যমূর্তিটি শিল্পী উৎকীর্ণ করেছেন, এর দ্বারা ঐশ্বরিক ভালোবাসার ও ত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল চারহাতবিশিষ্ট নারায়ণ এখানে দেবতাদের প্রতীকরূপে ও দুইহস্ত বিশিষ্ট নর এখানে সাধারণ মানুষরূপে প্রতিভাত হয়েছে। নর ও নারায়ণের এক মহামিলন শিল্পী উপস্থাপিত করেছেন। নর-নারায়ণ প্রকৃতপক্ষে দেবপ্রতিম অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেব। উভয়ের মুখমণ্ডল প্রশান্তিতে বিভাসিত, নরের দক্ষিণহস্তে বরমুদ্রা, বামহস্তে অভয়মুদ্রা; নারায়ণের অতিরিক্ত দুইহস্তে অক্ষমালা ও পদ্ম; ডানহাতে জ্ঞানমুদ্রা ও বামহাতে কমণ্ডলু।

গজেন্দ্রমোক্ষ ভাস্কর্য, বিষ্ণুমন্দির, দেওঘর, উত্তর-প্রদেশ, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ

গজেন্দ্রমোক্ষ ভাস্কর্যটি দেওঘরের বিষ্ণুমন্দির গাত্রে খোদাই করা আছে। এটি গুপ্তযুগীয় শৈলীতে নির্মিত এবং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছে। পৌরাণিক আখ্যান অনুযায়ী, বরদরাজ বা গজেন্দ্রমোক্ষ নামে বাহ্যরূপে দেবতা তাঁর ভক্ত গজেন্দ্রকে জলজ দৈত্য বা গ্রাহের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ভাস্কর্যটিতে গ্রাহের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর জন্য হস্তিযূথপতি সপুষণ শুঁড় তুলে বিষ্ণুর কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন এবং সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে বিষ্ণু গরুড়ের পিঠে চড়ে আকাশ থেকে নেমে আসছেন; মূর্তির দুটি হাত ভাঙা, বাকি দুটির একটিতে গদা, অন্য হাত উরুতে রাখা। গজেন্দ্রের পায়ে কুণ্ডলী (সর্পজাতীয় দৈত্য) জড়ানো। হস্তীটি নারায়ণের স্মরণাপন্ন হলে প্রাণে রক্ষা পায়। এখানে নাগ ও নাগিনীর হস্তের অঞ্জলীমুদ্রা দেখা যায়। মূলতঃ নারায়ণের প্রতি শ্রদ্ধা হেতু এই করজোড়ে অঞ্জলীমুদ্রা দেখা যায়। এখানে এই আখ্যানের মাহাত্ম্যটি হল — হস্তীর শাপমুক্তি ঘটে নারায়ণের প্রতি প্রার্থনা হেতু, নারায়ণই হাতিটিকে রক্ষা করেন। ফলে তার মোক্ষ লাভ হয়।

চিত্রসংখ্যা : ১১৪

এখানে গজেন্দ্রমোক্ষের ভাস্কর্যটি মোক্ষ প্রাপ্তির কথা তুলে ধরেছে। সমগ্র ভাস্কর্যটির মধ্যে যেন বর্ণনামূলক আখ্যান ফুটে উঠেছে।[১৬] ভাবপ্রধান এই বর্ণনামূলক আখ্যানটি গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশক। গল্পবলার ভঙ্গিতে ভাস্কর্যটি শিল্পী নির্মাণ করেছেন। শিল্পকর্মটি একটি আখ্যানের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে। ভাস্কর্যটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। নারায়ণের প্রতি করজোড়ে নাগ-নাগিণী প্রার্থনারত, শ্রদ্ধাবনতচিত্তে নারায়ণের প্রতি প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে। করজোড়ে থাকার জন্য এখানে ভক্তিভাব হেতু শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে।

ভাস্কর্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনাটি হল — গরুড় বাহিনী নারায়ণকে ভাস্কর্যে দেখানো হয়েছে। যিনি ভক্তের আহ্বানে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। নারায়ণের উপস্থিতি এখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে। মূলতঃ ভাস্কর্যটিতে নারায়রের মাহাত্ম্য কীর্তন করার উদ্দেশ্যেই তার মূর্তি নির্মিত হয়েছে।

দশাবতার মন্দিররের দেওয়ালের মূর্তিগুলির দুই পাশে স্তম্ভ ও তিনদিকে কারুকার্য খচিত। গুপ্ত শিল্পের বিশেষত্ব অনুযায়ী দ্বার-বেষ্টনী (jamb) আছে, এর জন্য ফ্রেমে আবদ্ধ ছবির ন্যায় মূর্তিগুলি মনোহর দেখায়। দ্বারা গঙ্গা-যমুনার মূর্তি খোদিত - যা স্তম্ভ স্থাপত্যের একটি রীতি বিশেষ। মন্দিরের ভিত্তিতে রামায়ণের বিষয় খোদিত আছে (যেমন জাভাতে আছে)। দেওঘরের এই ভাস্কর্যে গুপ্তরীতি বিশেষভাবে প্রকটিত।[১৭]

গঙ্গা এবং যমুনা ভাস্কর্য, অহিচ্ছত্তা, উত্তরপ্রদেশ, আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী, টেরাকোটা, দিল্লী ন্যাশনাল মিউজিয়াম ঃ

জলদেবী গঙ্গা ও যমুনার পোড়ামাটির ভাস্কর্য উত্তরপ্রদেশের অহিচ্ছত্তাতে প্রাপ্ত যা বর্তমানে দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নির্মিত এই ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির ছাপ স্পষ্ট। এক ছন্দিত ভঙ্গিতে গঙ্গাদেবীর দেহাবয়ব নির্মিত, দেহে পরিধেয় বস্ত্রের স্পষ্ট অবস্থান দেখা যায়, তা দেহের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত। ঠিক গুপ্তযুগীয় পাথরের ভাস্কর্যে যেরূপ

রীতি দেখা যায়, এখানে পোড়ামাটির ক্ষেত্রেও একই রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গঙ্গাদেবীর বাহন মকর ও যমুনাদেবীর বাহন কচ্ছপকে শিল্পী এখানে স্পষ্টভাবে নির্মাণ করেছেন।[১৮] গুপ্তযুগে পোড়ামাটির ভাস্কর্যের এতসুন্দর রূপে নির্মাণকলার এটি অন্যতম নিদর্শন। গঙ্গাদেবীর বামহস্তে একটি কলস, যমুনাদেবীর ডানহস্তে

চিত্রসংখ্যা : ১১৫

একটি কলস বর্তমান। ভাস্কর্যদুটির মধ্যে জলধারার ব্যবহার শিল্পী খুব নিপুণভাবে নির্মাণ করেছেন। জলদেবীর দুই চক্ষু মুদিত, যেন গভীর ধ্যানমগ্ন।[১৯] ধ্যানমগ্নতা হেতু এখানে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। শমভাব মূর্তিদুটিকে এক আধ্যাত্মরূপ দান করেছে।

ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — গঙ্গা ও যমুনা উভয়দেবীর হস্তে কলস যা জলের ব্যঞ্জক। এছাড়াও মকর ও কচ্ছপ এই জলচর জীবদের বাহনরূপে উপস্থিতি এখানে জলকেই ব্যঞ্জিত করছে। ভাস্কর্যদুটির মধ্যে পরিধেয় বস্ত্রের সূক্ষ্ম রেখার মাধ্যমে জলধারা গভীরভাবে ব্যঞ্জিত করেছে।

জলদেবী গঙ্গা, বেসনগর, ভোপাল, উত্তরপ্রদেশ, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ঃ

খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত জলদেবী গঙ্গা মকরের উপর দণ্ডায়মানা। গঙ্গাজলের স্রোতবেগ শিল্পী সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন। দেবদেবীর বাহন নির্বাচনের ক্ষেত্রে শাস্ত্রকার যে বিধান দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ যুক্তিসম্মত বুদ্ধি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। গঙ্গাদেবীর বাহন হল মকর। শিল্পী মকরের ভাস্কর্যটি নির্মাণ করেছেন ছন্দায়িত ভঙ্গীতে। এই ভাস্কর্যে নদীস্রোতকে দেখানো হয়েছে অলংকরণের মাধ্যমে। জলের ছন্দিত গতিবেগ প্রদর্শনে শিল্পীর রেখাবিন্যাস অত্যন্ত দক্ষতা ও চাতুর্যপূর্ণ রূপ নিয়ে খোদিত হয়েছে। জলদেবী গঙ্গা এখানে ত্রিভঙ্গ মূর্তিতে দণ্ডায়মানা। সূক্ষ্মবস্ত্রে আচ্ছাদিত দেহাবয়ব স্পষ্টরূপে বিরাজমান। ক্ষীণকটি, করিশুণ্ডবৎ হস্তদ্বয়, কদলীবৃক্ষবৎ পদদ্বয়, একপায়ে ভর দিয়ে দণ্ডায়মান মূর্তিটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ ঘটেছে।[২০] গুপ্তযুগে সাহিত্য নির্ভর শিল্পকলার প্রচলন ছিল। এই ভাস্কর্যের বর্ণনাটি সাহিত্যকেন্দ্রিক। মকরখোদিত গঙ্গাদেবীর মূর্তিটির দক্ষিণবাহু উর্ধভাগ থেকে প্রলম্বিত একটা বৃক্ষশাখা ধরে আছে। মূর্তিটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — অনুমেয় ধনদেবী বা

চিত্রসংখ্যা : ১১৬

বৃক্ষকা মূর্তি ধীরে ধীরে জলদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন, কারণ এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ গুপ্তোত্তর যুগে জলদেবীতে কোনো বৃক্ষকে দেখা যায় না। এই ভাস্কর্যটিকে বৃক্ষের আভাস আছে মাত্র। অনুমেয় বৃক্ষকা মূর্তিই ধীরে ধীরে জলদেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

ভাস্কর্যটিতে শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে। জলদেবী ছন্দিত ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান, তাই এখানে শৃঙ্গার রসের প্রসঙ্গ এসেছে।

নন্দীর পৃষ্ঠে আরোহনরতা শিব-পার্বতী, দশাবতার মন্দির, দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী ঃ

গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের একটি নির্দশন হল শিব-পার্বতীর ভাস্কর্য, উভয়েই গতিময় নন্দীর পৃষ্ঠে আরোহনরতা। নন্দীর ছুটন্তরূপটি বিশেষ আর্কষনীয়, সাহিত্যের বর্ণিত বিষয় এখানে শিল্পকলায় স্থান পেয়েছে। নন্দীর পৃষ্ঠে শিব-পার্বতীর যুগল মূর্তি, পার্বতী দক্ষিণহস্ত শিবের স্কন্ধে রেখেছেন, যেন বীরবিক্রমে তাঁরা উড়ে চলেছেন স্বর্গপানে। নন্দীর পৃষ্ঠে পার্বতীর উপবেশন ভঙ্গিটি শিল্পী চমৎকারভাবে নির্মাণ করেছেন। দুই পা তুলে পার্বতী নন্দীর উপর বসে আছেন, শিব-পার্বতীর দেহাবয়ব নির্মিত হয়েছে গুপ্তযুগীয় শিল্পশাস্ত্রনুযায়ী; শিবের বৃষস্কন্ধ, শালপ্রাংশুমহাভূজ, বৃহৎকর্ণ - এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁকে দেবত্বে উন্নীত করেছে। সেইসঙ্গে পার্বতীর ক্ষীণকটি, করিশুণ্ডের ন্যায় হস্তদ্বয়, উন্নত বক্ষ এবং কদলীবৃক্ষের মতো পদদ্বয় - এগুলি গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশক। সাহিত্য ও শিল্পকলা যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে অবস্থান করছে তার নিদর্শন এই ভাস্কর্যটি। সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়কে শিল্পী ভাস্কর্যে রূপদান করেছেন। নন্দীর মূর্তিটিও চমৎকার ভাবে নির্মাণ করেছেন শিল্পী, গতিময় ভঙ্গিটি চমৎকার। এখানে শিব-পার্বতীর রতিভাবের প্রকাশ হেতু শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — ভাস্কর্যে নন্দীর অবস্থানই মূলতঃ শিব-পার্বতীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করেছে। নন্দী না থাকলে শিব-পার্বতীর বোধ দর্শকের

চিত্রসংখ্যা : ১১৭

সম্ভব হতো না। তা নিছকই সাধারণ দুই নরনারী বোধ হতো। নন্দীর অবস্থানই মূলতঃ শিব-পার্বতীর অবস্থানকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেছে। তাই এখানে নন্দীই হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রতীক।

বিষ্ণুর অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট মূর্তি, বাদামী, কর্ণাটক, গুহা নং ৩, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ

হিন্দু ভাস্কর্য-বিষ্ণুর অনন্তনাগের উপর উপবিষ্ট মূর্তি কর্ণাটকের বাদামী গুহায় দেখা যায়। ভাস্কর্যটি আনুমানিক ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত। কুণ্ডলিনী অনন্তনাগের ওপর বিষ্ণু উপবেশন করছেন। তাঁর পশচাতের হস্তদ্বয়ে শঙ্খ, চক্র, বাকি দুই হাত জানুর ওপর রাখা। মস্তকে অনন্তনাগের ফণাবেষ্টিত। বিষ্ণুর মস্তকে উষ্ণীষ, সূক্ষ্মবস্ত্রে সমগ্র দেহ আচ্ছাদিত এবং বস্ত্রের ভেতর দিয়ে দেহাবয়ব প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে বিষ্ণু শালপ্রাংশুমহাভূজ, বৃষস্কন্ধ এবং তাঁর চর্তুভুজ করিশুণ্ডবৎ — এগুলি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির বৈশিষ্ট্য। বিষ্ণুর উপবেশনভঙ্গিটিও চমৎকার, এখানে অর্ধপর্যঙ্কাসনে উপবিষ্ট, এক পা বিশ্রাম আসনে ও অপর পা ভাঁজ করা। এই বিশেষ ভঙ্গি অনান্য

ভাস্কর্যে দেখা যায় না, সর্পের ওপরে বসার কারণ হেতু এই আসন দেখা যায়। বিষ্ণুর ডান ও বামদিকে নরসিংহ ও বামনরূপের প্রতিকৃতি স্থাপিত। গুহার বাম দেওয়ালে পদ্ম-হস্তা লক্ষ্মী এবং ডান দেওয়ালে সরস্বতী মূর্তি স্থাপিত। ভাস্কর্যটি গুপ্তপরবর্তী যুগের হলেও এতে গুপ্তযুগীয় বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতেও যে গুপ্তযুগীয় রীতি অবলম্বন করে ভাস্করগণ শিল্পসৃষ্টি করে চলেছেন তার দৃষ্টান্ত এই ভাস্কর্যটি।[২১] তাই রীতিগত দিক থেকে ভাস্কর্যটিকে গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতির প্রকাশ দেখা যায়।

অনন্তনাগের ওপর উপবেশন করলেও তাঁর দুই চক্ষু মুদিত, গভীর ভাবে ধ্যানমগ্ন, নাসাগ্র দৃষ্টি যা গুপ্তযুগীয় মূর্তিতে দেখা যায়, ধ্যানমুদ্রাহেতু মূর্তিটিতে শমভাবের উদ্বোধক শান্তরস উপস্থাপিত হয়েছে।

ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ বিষ্ণু অনন্তনাগের আসনের ওপর উপবিষ্ট, এই অনন্তনাগ বিশালতার প্রতীক। অনন্তনাগের পঞ্চফণাযুক্ত ছত্র বিষ্ণুর মস্তকের ওপর পরিবেষ্টিত, এর দ্বারা বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট মূর্তি, দেওঘর, উত্তরপ্রদেশ, দশাবতার মন্দির, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী ঃ

দেওঘরের দশাবতার মন্দিরে অনন্তনাগের ওপর উপবিষ্ট বিষ্ণুর অনুরূপ মূর্তি ভাস্কর্য আছে। ভাস্কর্যটিতে বিষ্ণু অনন্তনাগের আসনের ওপর উপবিষ্ট, এই অনন্তনাগ বিষ্ণুর মস্তকের ওপর ছত্রের ন্যায় বিরাজমান। পদপ্রান্তে একদিকে লক্ষ্মী ও অপরদিকে বামন অবস্থান করছে। করজোড়ে গরুড় মূর্তিটির ডানদিকে দণ্ডায়মান।

শিব-নটরাজ, গুহা নং - ১, বাদামী, কর্ণাটক, চালুক্য রাজবংশ, খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক ঃ

বাদামীর ১নং গুহার দক্ষিণভাগে শিব-নটরাজের মূর্তি খোদিত আছে। চালুক্য শাসনাধীনে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়। ভাস্কর্যটিতে শিবের বাহন নন্দী পরিবেষ্টিত হয়ে চতুরঙ্গ ভঙ্গীতে শিব নৃত্যরতা, পাশে গণেশ দণ্ডায়মান এবং ঢোলকবাদক জনৈক ব্যক্তি। গুপ্তোত্তর যুগেও গুপ্তযুগীয় শিল্পকলা যে একেবারে লুপ্ত

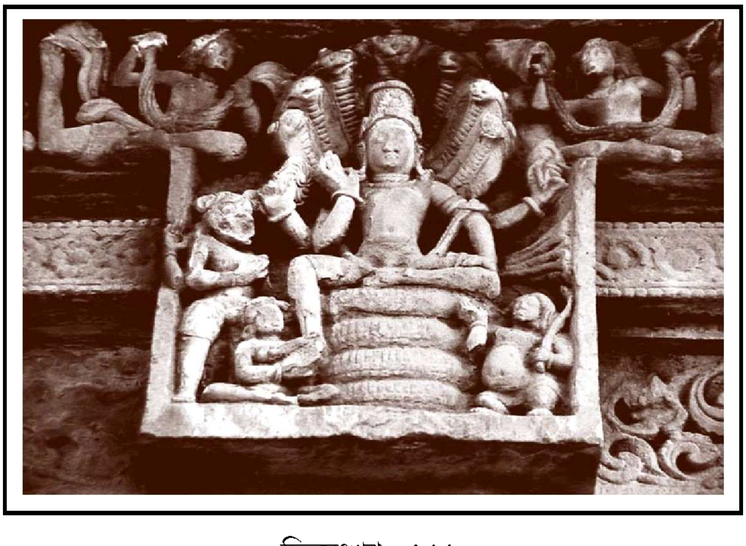

চিত্রসংখ্যা : ১১৯

হয়ে যায়নি তার পরিচয়বাহী আলোচ্য ভাস্কর্যটি। ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। শিব এখানে নৃত্যায়িত ভঙ্গিতে অবস্থান করছেন, নৃত্যের বিশেষমুদ্রা তাঁর হস্ত-পদদ্বয়ে দেখা যায়। তাঁর বহুভূজে বহু অস্ত্র সংস্থাপিত। মস্তকে বৃহৎ উষ্ণীষ। নৃত্যের এই বিশেষ ভঙ্গিটি গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, বিশেষতঃ নৃত্যকলা ও ভাস্কর্যকলা যে একই ছন্দোবদ্ধ বিষয় — এটি তারই দৃষ্টান্ত।[২২]

শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যের আদলে দেবমূর্তির ভঙ্গি নির্মিত হয়েছে। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী মূর্তি নির্মাণ গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির বৈশিষ্ট্য।

আনন্দে নৃত্য পরিবেশন হেতু এখানে শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটেছে। মনের মধ্যে অপার আনন্দের সঞ্চার হয় তখনই, যখন মন সমস্ত দুঃখের শোকের উর্দ্ধে অবস্থান করে। এই বিশেষ মানসিক অবস্থায় দেহ ছন্দিত সুষমায় নানা ভঙ্গে ধরা দেয়। তারই প্রকাশ হল শিবের এই নটরাজ মূর্তি, তাই এখানে শৃঙ্গাররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

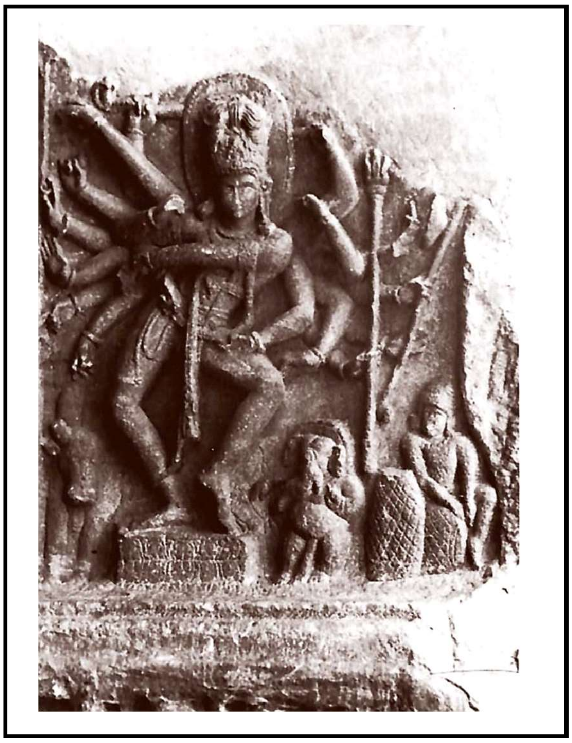

চিত্রসংখ্যা : ১২০

ভাস্কর্যটিতে শিবকে এখানে চিহ্নিত করা গেছে কেবল বাহন নন্দীর অবস্থান হেতু। তাই ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — নন্দীর অবস্থান। ভাস্কর্যের মধ্যে বাদ্যের অবস্থানটি নৃত্যকেই ব্যঞ্জিত করছে। শিবের পদদ্বয় বিশেষ তালে নৃত্যায়িত। হাত ও পায়ের সামঞ্জস্যটি শিল্পী নিঁখুতভাবে তুলে ধরেছেন।

'দুর্গা'-মহিষাসুরমর্দিনী, মহিষাসুরমর্দিনী গুহা, মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু, পল্লব রাজবংশ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক ঃ

ধর্মীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে যে কয়েকটি শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হল মহিষাসুরমর্দিনী গুহা। পল্লবরাজবংশের কীর্তিস্বরূপ এই হিন্দু ভাস্কর্যটি নির্মিত হয়েছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ভাস্কর্যটিতে দুর্গা ও মহিষাসুরের লড়াই-এর দৃশ্য খোদাই করা আছে যা গতিময়তায় দৃশ্যটি জীবন্ত। এখানে মুখ মহিষ আকৃতির ও দেহ মানুষাকৃতি অসুরকে দেবী দুর্গা তীর ধনুকের সাহায্যে লড়াই করতে উদ্যোগী হচ্ছেন। তাঁর অবশিষ্ট হাতগুলিতে তরবারি, ঘন্টা, চক্র, শঙ্খ পাশ ও ছুরিকা। দুর্গার বাহন এখানে সিংহ, তিনি সিংহে আরোহন করে বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে যুদ্ধ করছেন। এই ভাস্কর্যটির মধ্য দিয়ে পৌরাণিক আলেখ্য বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্যের অনুরূপ ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন শিল্পী। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পল্লব রাজবংশীয় ভাস্কর্যে গুপ্ত ভাস্কর্যরীতির মূল সুরটি অনুসৃত হয়েছে। দেবী দুর্গার দেহভঙ্গিমায় গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্যরীতির প্রভাব লক্ষণীয়।[২৩] পশুরাজ সিংহের দেহগঠনেও গুপ্তযুগীয় শৈলী দেখা যায়। সাঁচী, ভারহুত, অজন্তার মতোই এখানে বর্ণনামূলক একটি দৃশ্য ভাস্কর্যে পরিণত করেছেন শিল্পী। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য যে ভাবপ্রধান ও বর্ণনাবহুল সেই বৈশিষ্ট্যগুলি এই ভাস্কর্যে দেখা যায়। রীতি বা শৈলীগত দিক থেকে ভাস্কর্যটিতে গুপ্তরীতিই প্রকাশিত হয়েছে।

ভাস্কর্যটিতে একটি যুদ্ধের দৃশ্যবর্ণনা করেছেন শিল্পী, তাই বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত দুর্গা ও মহিষাসুরের যুদ্ধের দৃশ্যে বীররস উপস্থাপিত হয়েছে। মহিষাসুরমর্দিনী দৃশ্যটিতে উৎসাহভাবের প্রকাশহেতু এখানে বীররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

চিত্রসংখ্যা : ১২১

ভাস্কর্যটিতে মহিষের মস্তকধারণকারী এক পুরুষ, বীর বিক্রমে দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন — সেই দৃশ্য শিল্পীর বর্ণনায় ধরা দিয়েছে। মহিষের মস্তক ধারণকারী এক নরদেহী পুরুষের ভাস্কর্যটিতে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে। দেহটি মানুষের হলেও মস্তকটি পশুর, বিশেষতঃ মহিষের মস্তক হওয়ায় চরিত্রটি মহিষাসুরে পরিণত হয়েছে। এই ভাস্কর্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল - মহিষের মস্তকটি, যা ধারণ করে পুরুষ চরিত্রটি মহিষাসুর রূপে ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

মহিষাসুরমর্দিনী ভাস্কর্য ইলোরা, কৈলাসনাথ মন্দির, মহারাষ্ট্র, খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী ঃ

ইলোরা গুহায় মহিষাসুরমর্দিনীর যে চিত্র আছে, তার সঙ্গে মহাবলীপুরম-এর সাদৃশ্য আছে। ইলোরার ভাস্কর্যশিল্পে মহাদেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের সংগ্রামদৃশ্য নিপুণভাবে চিত্রিত, গতিময়তার দৃশ্যটি জীবন্ত। এখানে মহিষাসুরের মুখ মানুষের, কিন্তু মাথায় মহিষশৃঙ্গ। পশুরাজ সিংহের স্কন্ধ থেকে অর্ধনিক্রান্ত দুর্গা মহিষাসুরকে

নিধনরতা — এই বিষয়টি অসংখ্য ভাস্কর্য ও চিত্রকৃতির উপজীব্য। উভয়পক্ষেরই বহু সৈন্যসামন্ত উপস্থিত। দেবীদুর্গার লড়াই এর মধ্যে বীরবিক্রমভাব প্রদর্শিত হয়েছে।[২৪] মহিষাসুরকে আক্রমণ করতে উদ্যত দেবী দুর্গার যুদ্ধের উৎসাহভাবহেতু বীররসের উপস্থাপন ঘটেছে।

এই ভাস্কর্যে দেবী দুর্গার সিংহের ওপর উপবেশন ভঙ্গিটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এমন ভঙ্গি গুপ্তযুগীয় শিল্পরীতিতেই দেখা যায়। যদিও ইলোরার ভাস্কর্য গুপ্তোত্তরযুগের, তুবও ভাস্কর্যের মধ্যে গুপ্তযুগীয় প্রভাব দেখা যায়। সিংহের অবয়ব নির্মাণেও শিল্পী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

সমগ্র ভাস্কর্যজুড়ে বহু ক্ষুদ্রাকৃতির সৈন্যসামন্তের মাঝে দেবী দুর্গা ও মহিষাসুরকে বিরাট করে নির্মাণ করেছেন শিল্পী। এর দ্বারা দেবীদুর্গার অসীমত্ব ও মহিষাসুরের পরাক্রম ব্যঞ্জিত হয়েছে।

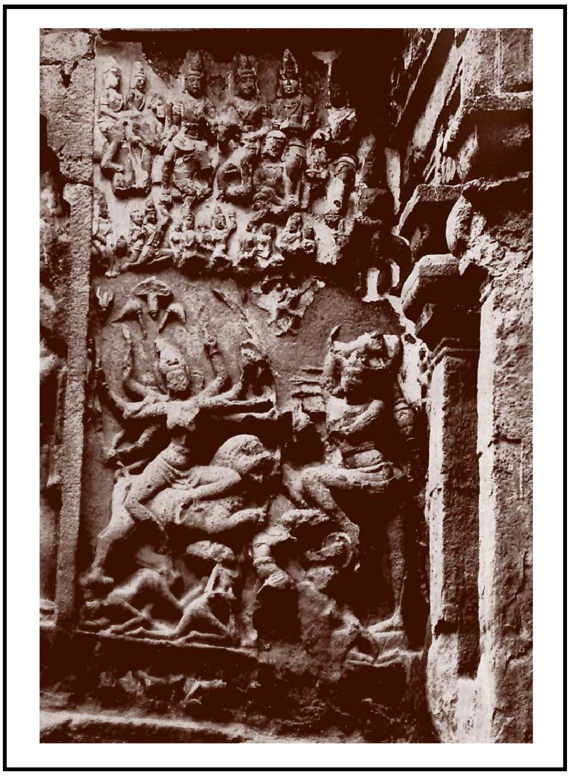

চিত্রসংখ্যা : ১২২

অর্জুনের তপস্যা ও গঙ্গার অবতরণ দৃশ্য, মহাবলীপুরম, তামিলনাড়ু, পল্লব-যুগ খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

গঙ্গা অবতরণের দৃশ্যটি ভাস্কর খুব সুন্দরভাবে এক বৃহৎ প্রস্তরে খোদাই করেছেন। ভাস্কর্যটি প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ অথবা তাঁর পুত্র মামল্লের সময়কালে নির্মিত হয়েছিল। ভাস্কর্যটি একটি বৃহৎ পর্বতগাত্রে (৩০ মিটার, ১৫ মিটার প্রস্থ যুক্ত) খোদিত হয়েছে। বহু নরনারী, জীবজন্তু ও অনান্য বিষয়গুলি সূক্ষ্মভাবে খোদিত হয়েছে। গঙ্গার অবতরণ ও অর্জুনের তপস্যা উভয়বিষয়কেই শিল্পী প্রাধান্য দিয়েছেন যা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের বিষয়। মহাভারতের কাহিনীকে কেন্দ্র করে যে আখ্যান রচিত হয়েছে তা হল 'অর্জুনের তপস্যা'। অপরটি হল গঙ্গা অবতরণের কাহিনী। পবিত্র নদী গঙ্গায় নাগের বসবাস ও গঙ্গার জলধারা বাহিত হয়ে নিম্নে সঞ্চরণ — এই বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে ভাস্কর্যে বর্ণিত হয়েছে। ভগীরথ যেভাবে গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন এবং অর্জুন তপস্যার দ্বারা শিবের কাছ থেকে যে অস্ত্র লাভ করেছিলেন — এই দুটি বিষয়ই ভাস্কর্যটিতে খোদাই করা হয়েছে।

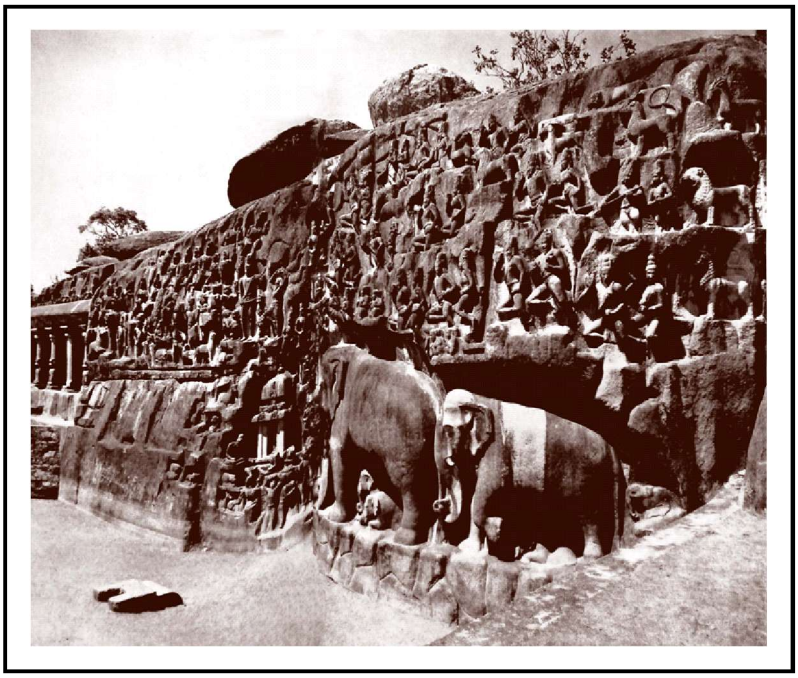

চিত্রসংখ্যা : ১২৩

ভাস্কর্যটির দুটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়, একভাগে বহু আকৃতির নর-নারীর মূর্তি নির্মিত হয়েছে পাহাড় কেটে, একই সাথে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ডানদিকে বৃহৎ আকারের হাতির মূর্তিও নির্মিত হয়েছে এমনকি অনান্য পশু-পাখিও দৃষ্টিগোচর হয়। প্রস্তরখণ্ডটির বামদিকে দেবমূর্তি নির্মিত হয়েছে। ভাস্কর্যে অনুচ্চ মুকুট পরিহিত গন্ধর্বরা গঙ্গাধারার দিকে উড়ে চলেছেন হাতে পুষ্পস্তবক। মূলতঃ পল্লব-শিল্পকলাতে গুপ্তযুগীয় শৈলীর অনুকরণ দেখা যায়। গুপ্তশৈলী যে কেবল গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল এমন নয়, তা

চিত্রসংখ্যা : ১২৪

বহুপরিসরে ব্যাপ্ত হয়ে উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করেছিল এবং বহু যুগব্যাপী তার বিস্তার দেখা যায়।[২৫] দেবমূর্তির গঠনগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেলে দেখা যায় শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী দেহাবয়ব নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি মূর্তির তাল-মান নির্দিষ্ট অনুপাতে নির্মিত হয়েছে। নরমূর্তির পাশাপাশি পশুমূর্তিগুলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষতঃ হস্তি দুটির মূর্তিকে পাথর কেটে জীবন্ত রূপদান করেছেন

শিল্পী। শৈলীগত দিক থেকে বিচার করলে ভাস্কর্যটিতে গুপ্তযুগের শিল্পরীতির ব্যপ্তি লক্ষ্য করা যায়।

ভাস্কর্যটিতে বহু ঘটনার সমাবেশ নানান রসের উপস্থাপন ঘটেছে। যেমন অর্জুনের তপস্যার ঘটনাটিতে শান্তরসের উপস্থাপন ঘটেছে। হস্তিদ্বয়ের পরস্পরের প্রতি সংযুক্ত হয়ে থাকা বাৎসল্যরসের প্রকাশক।

ভাস্কর্যটির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল — দুই প্রস্তরখণ্ডের মধ্যবর্তীস্থলে নাগরাজার মূর্তি খোদিত হয়েছে। 'নাগ' পবিত্র গঙ্গায় বসবাসকারী, তাই তার মূর্তিটি মধ্যস্থলে ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

রাবণ কর্তৃক কৈলাস পর্বত উত্তোলন, কৈলাসনাথ মন্দির, ইলোরা, মহারাষ্ট্র, খ্রিস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী।

ইলোরার কৈলাস মন্দিরে রাক্ষসরাজ ক্রোধান্ধ রাবণ তাঁর দশ হাত দিয়ে শিব-পার্বতী সহ কৈলাস পর্বতকে উত্তোলন করছে। শিব সেই রাক্ষসের শক্তিকে জানুর চাপে রোধ করছেন। উদ্বিগ্ন পার্বতী শিবের সন্নিকটে বসে আছেন। এমনই একটি নাটকীয় দৃশ্যকে শিল্পী ভাস্কর্যে রূপদান করেছেন। কয়েকটি অসমান চতুর্ভুজের সমহারে গড়ে ওঠা কৈলাস পর্বতের চূড়ায় বসে হরগৌরী, হরের পাশে নীচের দিকে দুই সহচর, অনুরূপভাবে পার্বতীর পাশেও দুই সঙ্গিনী এবং উভয়ের দু-দিকে একজন করে দু-জনগণ। সুদেহী পেশিবহুল রাবণ তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে পাহাড় উন্মূলিত করছেন, নড়ে ওঠা পাহাড়ে বসা পার্বতী ভয় পেয়ে স্বামীকে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁর মুখে ত্রাসের ভাবটি সুপরিস্ফুট। শান্ত ও অচঞ্চল শিব তাঁকে জড়িয়ে ধরে অভয় দিচ্ছেন। কাহিনীর মূল ভাববস্তু অজানা শিল্পীর স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই হিন্দু আখ্যানের মধ্যে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। ভাস্কর্যে বহু দেব-দেবীর মূর্তি খোদাই করেছেন শিল্পী। তারমধ্যে শিব-পার্বতী মূর্তিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ইলোরা ভাস্কর্যের বিশেষত্ব হল — অলংকারের বাহুল্য। কেশসজ্জা, মস্তকসজ্জা এবং অলংকরণ এগুলি ইলোরার বৈশিষ্ট্য। গুপ্তযুগে ভাস্কর্যের যে নতুন আঙ্গিক তৈরী

হয়েছিল, শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী যে দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ প্রথার সূচনা হয়েছিল, তারই প্রকাশ ঘটেছে ইলোরা ভাস্কর্যে। দেবদেবীর দেহের গঠন ভঙ্গিতে গুপ্তযুগীয় শৈলী দেখা যায়।[২৬]

রাবণ ক্রোধান্ধ হয়ে কৈলাস পর্বত উত্তোলন করছেন, তাই পার্বতী ভীতা হয়ে শিবের সন্নিকটে অবস্থান করছেন, এই ভয় ভাব হেতু ভয়ানক রসের উপস্থাপন ঘটেছে।

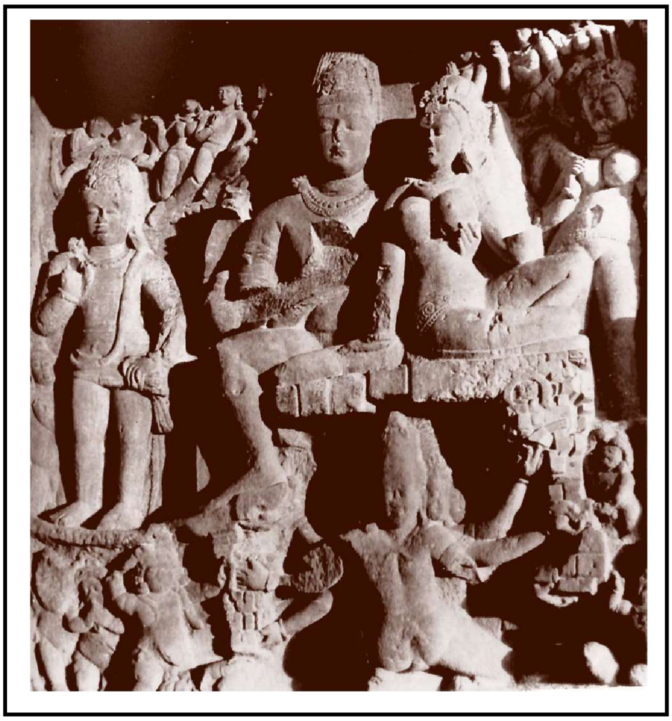

চিত্রসংখ্যা : ১২৫

রাবণের কৈলাসপর্বত উত্তোলন ও শিবের জানুর চাপে পর্বত উত্তোলনকে রোধ করার ঘটনার মধ্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে। রাবণের মত শক্তিশালী পুরুষকে শিব যে সামান্য জানুর চাপে পরাজিত করেছেন, এই ঘটনার দ্বারা শিবের মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে।

আমাদের দেশীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি যুগ যুগান্তর ধরে গড়ে উঠেছে, যেমন একদিকে দেশীয় অনার্য, অন্যদিকে আর্য এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতি নিজের স্বত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। আবার পরবর্তীকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত মথুরা ও গান্ধারের বুদ্ধমূর্তির মাধ্যমে ভারতীয় ভাস্কর্য ভাবীকালের পথের সন্ধান পায়। তারপর এল শক, হুন, পাঠান, মোঘল। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মুসলিম রাজত্বের আগে পর্যন্ত ভারতীয় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের এক ধারাবাহিকতা ছিল। ভাস্কর্যের এই ধারাবাহিকতার মূল কারণ ছিল — অধ-চিত্র ও পৃষ্ঠপোষকতা। অর্থাৎ বিভিন্ন যুগে ধর্মকে কেন্দ্র করে যে সকল মন্দির নির্মাণ হয়েছে, সব সময়ই দেখা যায় স্থাপত্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ভাস্কর্য। বলা হয় — 'Architecture is the mother of all art'। মুসলিম রাজত্বের আগে পর্যন্ত দেখা যায় স্থাপত্য মা হিসেবে তার দুই সন্তান চিত্র ও ভাস্কর্যের একইভাবে সমমর্যাদায় লালন করে এসেছে। ভাস্কর্য তার মায়ের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয় মুসলিম রাজত্বে। প্রায় ছয়শত বছরের বেশী মুসলিম শাসনে ভাস্কর্যে ধারাবাহিকতার ছেদ পড়ল। প্রসঙ্গতঃ মুসলিম রাজত্বে স্থাপত্যের আলংকারিক প্রয়োজনে কিছু ভাস্কর্য হলেও তা ভাস্কর্যের মূল ধারাবাহিকতাকে কোনও ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেনি। ভারতীয় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের মূল দর্শন ছিল মানবতাবাদ। তার সম্পর্ক যতই ধর্মের সঙ্গে থাকুক না কেন, তা যতই আধ্যাত্মিক হোক না কেন, তার মূলসুর ও দর্শন ছিল মানবিক। তা কখনই ভাবালুতা আশ্রিত নয়। নীহাররঞ্জন রায়ের ''অ্যান অ্যাপ্রোচ টু ইণ্ডিয়ান আর্ট'' বইটিতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ১৩০০ শতক পর্যন্ত ভারতীয় ভাস্কর্য যেভাবে ছন্দোময় হয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, মুসলিম রাজত্বে সেই ছন্দে ছেদ পড়ল। পরবর্তীকালে এই ছেদ ভারতীয় ভাস্কর্যকে নানা বিড়ম্বনার সন্মুখীন করেছে। ভারতীয় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের গতি রুদ্ধ হলেও এর মূলসুর কিছুটা জীবিত ও প্রবাহিত হয়েছে লোকশিল্পের মাধ্যমে। এবং বলা যায় এই লোকশিল্প পরবর্তীকালে অনেকটাই সেতু বন্ধনের কাজ করেছে ভারতীয় ধ্রুপদী ভাস্কর্য ও আধুনিক ভাস্কর্যের মধ্যে। ঐতিহ্য অনুযায়ী শিল্পের যে মূল দর্শন ক্ষীণভাবে লোকশিল্পের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে, তা আধুনিক ভারতীয় ভাস্কর্যকে পরবর্তীকালে মানবিক করেছে, প্রাণদান করেছে, ছন্দোময় করেছে।

মুসলিম রাজত্বের পর প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় পরম্পরাগত শিল্পের গতি একদিকে যেমন রুদ্ধ হয়েছে, অপরদিকে তাতে সঞ্চিত হয়েছে পশ্চিমী শিল্পের নানা পলিস্তর। মুসলিম ও ব্রিটিশ আমলে ভাস্কর্য স্থাপত্যের কোল থেকে নির্বাসিত হওয়ার ফলে ভাস্কর্যের গতি যেমন রুদ্ধ হল, আবার অপরদিকে ঐ নির্বাসন ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আর্শীবাদস্বরূপ। ভাস্কর্য তার নিজের অস্তিত্বকে এককরূপে স্থাপন করার চেষ্টা করল। তার ফলেই আধুনিক ভাস্কর্য স্থাপত্যকে ছেড়ে, ধর্মকে ছেড়ে, একাই মানবতাবাদের পতাকা উড়িয়ে সোজা ঋজুভঙ্গিতে দাঁড়ানোর সাহস পেল।

বর্তমানকালে ভারতীয় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতা না থাকলেও লোকশিল্পের মাধ্যমে এবং আঞ্চলিক স্তরে আঞ্চলিক স্তরে কিছু কিছু পরম্পরাগত ভাস্কর্য হয়েছিল। তার মধ্যে একদিকে বাংলায় যেমন মন্দিরের পোড়ামাটির ভাস্কর্য অপরদিকে দক্ষিণ ভারতে বড় বড় ভাস্কর্য কেন্দ্রগুলিতে পরম্পরাগত ভাস্কর্যের চর্চা। এমনকি এরই পথ ধরে এখনও দক্ষিণ ভারত, উড়িষ্যায় পরম্পরাগত ভাস্কর্যের চর্চা হয়ে থাকে।

শেষকথা ঃ

সাহিত্যের রস ও শিল্পকলার রসের সাদৃশ্য দেখা যায়। সাহিত্যে অর্থাৎ নাট্য সাহিত্যে নাট্যকার শব্দ দ্বারা নানা ভাব তরঙ্গ সৃষ্টি করেন। শিল্পের ক্ষেত্রে শিল্পী রেখা ও বর্ণ দিয়ে সেইসব ভাব প্রকাশ করেন। শিল্পীর কাছে রসবিহীন চিত্র অনাবশ্যক।

সাহিত্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ও শিল্পকলার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উচ্চমানের নাট্যকার তাঁর লেখনীতে ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ করেন না, এটিই হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। নাটকের ক্ষেত্রে দর্শকের মন যা দেখে, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে না দেখা বিষয়গুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। কাব্যতে উচ্চভাব আনতে গেলে ব্যঞ্জনার দ্বারা বিষয়গুলিকে প্রকাশ করতে হয়। এখানে চিত্র ও কাব্য একশ্রেণীর হয়ে যায়। কবি ও চিত্রকর উভয়েই শিল্পী। উভয়েই বিভিন্ন চরিত্র নানাভাবে প্রকাশ করেন। প্রভেদ এই যে, কবি শব্দ দিয়ে ভাব প্রকাশ করেন এবং শিল্পী বর্ণ ও রেখা

দিয়ে ভাব প্রকাশ করেন। তাই উচ্চমানের চিত্রাঙ্কণ করতে হলে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রয়োজন, তা না হলে চিত্র নীরস হয়ে পড়ে। যেখানে চিত্রকর ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ করেন, সেখানে চিত্রকরের গতি বিস্তৃত, সেই স্থলে বর্ণের অল্প প্রয়োগে ও ব্যঞ্জনার দ্বারা শিল্প প্রদর্শিত হয় ফলে দর্শকেরাও উচ্চমার্গের চিন্তা করেন। উচ্চমার্গের চিত্রে দেখা যায় শিল্পী ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সংযোগ করেন। যখন কোন দর্শক কোনো চিত্র বা ভাস্কর্য দর্শন করেন তখন প্রথম পর্যায়ে তাঁর মনে এক প্রকার ভাব সৃষ্টি হয়। দর্শকের মনে এইভাবে বহু ভাবের উদয় হয় এবং প্রথম ভাব থেকে দ্বিতীয়ভাব বহু উচ্চ এবং স্পষ্ট — তা দর্শকের কাছে প্রতীয়মান হয়। এভাবে দর্শকের মনকে শিল্পী বহু উচ্চস্তরে নিয়ে যায় এবং নতুন জগৎ ও সৃষ্টি দেখান। এইটিই হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার সংযোগ করতে পারেন যা সাধারণ শিল্পীরা পারেন না। তাই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রয়োগ করা সুনিপুণ শিল্পীর কাজ।

ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ধ্বনির যে প্রসঙ্গ আছে, সেখানে ধ্বনি বলতে ব্যঞ্জনাকে বোঝায়। ধ্বনিবাদীদের মতে ধ্বনি হল কাব্যের আত্মা বা প্রাণ। আলংকারিকদের মতে ধ্বনি তিন প্রকার — অলংকারধ্বনি, অর্থধ্বনি এবং রসধ্বনি। রসধ্বনিতেই কাব্যের চরম উৎকর্ষ। ছবিতেও তেমনি রেখা, রঙ, রূপ প্রত্যেকটির ধ্বনি থাকতে পারে। সব মিলিয়ে একটি অখণ্ড ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা থাকতে পারে — তা একমাত্র রসিকের দৃষ্টিতে ও প্রতীতিতেই ধরা পড়বে। রেখা যেখানে জীবন্ত, সেখানে রেখা ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। ভারতীয় চিত্রের রেখাই হল তার প্রাণ।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol. - I, 1955, পৃ. – ১৮।

২। তু. *চণ্ডী ভৈরব বেতাল-নরসিংহ-বরাহকাঃ।*
ক্রূরা দ্বাদশতালাঃ স্যুর্হশীর্ষাদয় স্তথা।।
— শুক্রনীতিসার, ৪.৪.৮৬।

৩। তু. *দশতালা কৃতযুগে ত্রেতায়াং নবতালিকা।*
অষ্টতালা দ্বাপরেতু সপ্ততালা কলৌযুগে।।
— শুক্রনীতিসার, ৪.৪.৮৯

৪। *সাহিত্যদর্পণ,* ৩.১৮২।

৫। *সাহিত্যদর্পণ,* ৩.১৭৯।

৬। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, প্রতিমালক্ষণম্, ৩.৪৫.১৩*

৭। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*, 1998, পৃ. – ২০০।

৮। *তদেব,* পৃ. – ২২৭।

৯। *তদেব,* পৃ. – ২৪৭।

১০। *তদেব,* পৃ. – ২৪৫।

১১। *তদেব,* পৃ. – ২৫২।

১২। তত্রৈব।

১৩। Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol. - I, 1955, পৃ. – ২৫৭।

১৪। *তদেব,* পৃ. – ২৫৬।

১৫। Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*, 1998, পৃ. – ২০০।

১৬।	*তদেব*, পৃ. – ২১১।

১৭।	Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol. - I, 1955, পৃ. – ৩৫৬।

১৮।	J. C. Harle : *The Art and Architecture of the Indian Subcontinent*, 1986, পৃ. – ১১৭।

১৯।	Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*, 1998, পৃ. – ২১৫।

২০।	Heinrich Zimmer : *The Art of Indian Asia*, Vol. - I, 1955, পৃ. – ২৪১।

২১।	*তদৈব*, পৃ. – ২৮৮।

২২।	*তদৈব*, পৃ. – ৩৬০।

২৩।	*তদৈব*, পৃ. – ২৭৬।

২৪।	*তত্রৈব।*

২৫।	Susan L. Huntington : *The Art of Ancient India*, 1998, পৃ. – ৩০৩।

২৬।	*তদৈব*, পৃ. – ২৭৫।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

সাহিত্য ও শিল্পকলা দুটি সম্পর্ণ ভিন্ন মাধ্যম হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভ্যন্তরীণ যোগসূত্র যে একই সুতোয় গাঁথা তা এই গবেষণাপত্রে প্রমাণিত হয়েছে। আর এই যোগসূত্র রচনার কাজটি করেছে রস, রীতি, ধ্বনি - অলঙ্কারশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রবিদ্‌গণ কাব্যের সৌন্দর্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি তাঁরা কাব্যের আত্মার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। ফলস্বরূপ রীতিবাদীদের মতে রীতিই কাব্যেই আত্মা।[১] রসবাদীরা বলেছেন রসই কাব্যের আত্মা।[২] আবার, ধ্বনিবাদীরা স্বীকার করেন ধ্বনিই কাব্যের আত্মা।[৩] আমার মতে কাব্যের আত্মা বলতে পৃথক পৃথক ভাবে রস, রীতি, ধ্বনি হতে পারেনা। এদের একইসাথে কাব্যে প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আলঙ্কারিকগণ এদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। একটি তত্ত্বের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপর একটি তত্ত্ব। এইভাবে বহুজনের বহুমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাব্যের সৌন্দর্য বিধানে আসলে এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে। এদের একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তাই কাব্যের সৌন্দর্য বিধানে রস, রীতি, ধ্বনি একই সঙ্গে কাব্যে প্রয়োজনীয়তা আছে। এই তত্ত্বগুলি ব্যতীত কাব্য সহৃদয় পাঠকের কাছে গ্রহনীয় আস্বাদনীয় হতে পারে না। সেই অর্থে রস, রীতি, ধ্বনি - একইসাথে কাব্যের আত্মা বা প্রাণ। নাট্যসাহিত্য যেহেতু কাব্যেরই একটি বিভাগ বিশেষ, তাই কাব্যের উৎকর্ষতা বিধানে রস, রীতি, ধ্বনির - এই তত্ত্বগুলির বিশেষ ভূমিকা থাকাটাই স্বাভাবিক। এই গবেষণাপত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছেন রস, রীতি, ধ্বনি এই তত্ত্বসমূহ কিভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, সহৃদয় পাঠকের কাছে গ্রহনীয় করে তুলেছে।

'রস, রীতি, ধ্বনি ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলা (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সপ্তম শতক' শীর্ষক গবেষণাপত্র রচনাকালে বহু মৌলিক তথ্য

উপস্থাপন করা হয়েছে, যা পূর্বের কোনো গ্রন্থে সংযোজিত হয়নি। একই সঙ্গে উঠে এসেছে বহু নতুন তথ্যাবলী যা সাহিত্য ও শিল্পকলা উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে।

নাট্যসাহিত্য বলতে আনুমানিক গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের কবিদের যথা কবি কালিদাস, কবি ভবভূতি, কবি শূদ্রক - এঁদের নাট্যকৃতিগুলিকে কিভাবে রস, রীতি, ধ্বনি উৎকর্ষ সাধন করেছে সেই বিষয়টি এই গবেষণাপত্রে নথিভুক্ত হয়েছে।

সাহিত্যের পাশাপাশি শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে রস, রীতি, ধ্বনি কিভাবে উৎকর্ষ বিধান করেছে তাও এই গবেষণাপত্রে প্রমাণিত হয়েছে। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য রস, রীতি, ধ্বনি এই তত্ত্বগুলির দ্বারা বিমূর্ত শিল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সর্বোপরি সাহিত্যের রস, রীতি, ধ্বনিকে আশ্রয় করে শিল্পকলার রস, রীতি, ধ্বনি একইসূত্রে গাঁথা হয়েছে - এই গবেষণাপত্রে। সাহিত্য ও শিল্পকলা একাত্ম হয়ে গেছে, সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন মাধ্যম সাহিত্য ও শিল্পকলার মধ্যে সেতুবন্ধন করেছে রস, রীতি, ধ্বনি এই অলঙ্কারতত্ত্বগুলি। সাহিত্য ও শিল্পকলার মূল উদ্দেশ্যই হল সৌন্দর্যনির্মাণ ও আনন্দদান।

এই গবেষণাপত্র মৌলিক, কারণ পূর্বে এই বিষয় নিয়ে কেউ এত বিশদে আলোচনা করেননি। শিল্প ও সাহিত্যের যোগসূত্র কেউ অনুসন্ধান করেন নি। সর্বোপরি রস, রীতি, ধ্বনি এগুলি যে একই সঙ্গে সাহিত্য ও শিল্পকলার বিষয় হয়ে উঠতে পারে, আমার পূর্বে কোন গবেষক এই সূত্রটি ধরিয়ে দেননি। সংস্কৃত সাহিত্যের শিক্ষার্থী হওয়ার সুবাদে আমি যখন কালিদাস, ভবভূতি, শূদ্রক ও অনান্য কবিদের কাব্য পাঠ করেছি তখন থেকেই কাব্য সম্বন্দীয় নানান জিজ্ঞাসা আমার মনে উদয় হয়েছিল। তারপর যখন শিল্পকলার ক্ষেত্রটিকে বিচরণ করলাম তখন আমার মনে হয়েছিল সাহিত্যে কবিরা যা বলেছেন শিল্পকলার উদ্দেশ্যও তাই। শিল্পীরা যখন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নির্মাণ করেন, তখন তাদের উদ্দেশ্যই হল দর্শকের মনে আনন্দদান।

তাই সাহিত্য ও শিল্পকলা যদি একই সূত্রে গ্রথিত হয়, তাহলে তাদের মূলসূত্রটি কি - এই প্রশ্ন আমাকে বারবার ভাবিয়েছে।

গবেষণাপত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার প্রয়াস করা হয়েছে মাত্র। এই নিবন্ধ রচনা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে রস, রীতি, ধ্বনি এই অলংকারতত্ত্বগুলি নিছকই তত্ত্বকলা নয়, তাত্ত্বিক দিক ছাড়িয়েও এদের বিস্তৃতি কবিদের রচনায় ব্যপৃত হয়েছে। সংস্কৃত কবিরা এদের উপজীব্য করে কাব্য রচনা করেছেন। একইসাথে শিল্পীদের সৃষ্ট শিল্পকর্মেও এই তত্ত্বগুলির দ্বারা দর্শকের কাছে শিল্পসামগ্রী আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে - এই সত্যটি আমি গবেষণাপত্র রচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি।

গবেষণাপত্রের সূচনাতে আমার মনে কতগুলি গবেষণা সংক্রান্ত মৌলিক জিজ্ঞাসা ছিল, যেগুলি এই গবেষণাপত্র রচনাকালে আমার মনে বারংবার নাড়া দিয়ে গেছে। গবেষণাপত্রের প্রতিটি অধ্যায়ে সেই প্রশ্নগুলির সদুত্তর খোঁজার চেষ্টা করে গিয়েছি।

এখন প্রশ্ন হল রস কিভাবে অলংকারশাস্ত্রের বিষয় হয়ে উঠেছে —

গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের বিভিন্ন তত্ত্বসমূহ আলোচনা কালে আমি 'রস' - এই তত্ত্বটির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। বিভিন্ন আলংকারিকদের গ্রন্থ পাঠ করে আমার মনে হয়েছে রস হল উপলব্ধির বিষয়। নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আচার্য ভরত এই প্রশ্নটা তুলেছিলেন — *রসঃ ইতি কঃ পদার্থঃ?* । প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছিলেন - *উচ্যতে আস্বাদ্যত্বাৎ*।[৪] সুতরাং তাই 'রস' যা আস্বাদ্য। নানা ব্যঞ্জনের দ্বারা প্রস্তুত খাদ্যের আস্বাদ গ্রহণ করে যেমন *সুমনসঃ পুরুষা হর্ষাদীংশ্চাধি গচ্ছতি*।[৫] তেমনি নানাভাবের অভিনয়ের দ্বারা স্থায়িভাবকে অবলম্বন করে *সুমনসঃ প্রেক্ষকাঃ হর্ষাদীংশ্চাধিগচ্ছতি*।[৬] স্থায়িভাবকে আস্বাদন করে গুণী প্রেক্ষকগণ নাট্যরস আস্বাদন করেন। এই আস্বাদন সম্ভব হয়

বিভাবানুভাবব্যভিচারীসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ [৭]-এর দ্বারা অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীর সংযোগ থেকে রসনিষ্পত্তি ঘটে। আবার আচার্য ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে বলেছেন স্থায়িভাব থেকেই রসত্ব প্রাপ্ত হয় - *স্থায়িনোভাবা রসত্বমাপ্নুবন্তি*। [৮] ভাব ও রসের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভরতমুনি বলেছেন - *ন ভাবহীনো'স্তি রসো ন ভাবে রসবর্জিত। পরস্পরকৃতা সিদ্ধিরনয়োঃ রসভাবয়োঃ।* [৯] অর্থাৎ ভাবশূন্য রস বা রসশূন্যভাব কখনো সম্ভব হয় না। এই ভাব বলতে স্থায়িভাব ও ব্যভিচারীভাবকে বোঝায়। এই দুটি ভাবই রসের অন্তরঙ্গ উপাদান এবং বিভাব ও অনুভাব হল রসের বহিরঙ্গ উপাদান। তাই স্থায়িভাব ও ব্যভিচারীভাব দুইই পাঠক বা দর্শকের অন্তরে বিরাজ করে। বিভাব ও অনুভাব সেই দুটি ভাবকে পুষ্ট হতে সহায়তা করে মাত্র। সুতরাং রসকে আস্বাদ্য বললে বুঝতে হবে পাঠক বা দর্শকের অন্তরস্থ স্থায়িভাবই তাঁর কাছে হবে আস্বাদ্য। আচার্য ভরত শৃঙ্গারাদি মোট আটটি রসের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। সেই সঙ্গে আটটিভাবে উল্লেখ তিনি করেছেন।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণা রৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।। [১০]

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্তিতা।। [১১]

ভরত প্রদত্ত এই নাট্যরসই কাব্যের জগতে কাব্যরসরূপে গৃহীত হয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে শান্তরসকে নবম রসরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এর ভাব হল 'শম'। আচার্য ভরত প্রদত্ত রস-সূত্র নিয়ে পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা সবথেকে বেশী প্রভাবিত হয়েছিলেন। রসসূত্রকে কেন্দ্র করে চারটি মতবাদ গড়ে ওঠে, যথা - (১) ভট্টলোল্লটের উৎপত্তিবাদ (২) শ্রীশঙ্কুকের অনুমিতিবাদ (৩) ভট্টনায়কের ভুক্তিবাদ (৪) অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

পরবর্তীকালে রস নিয়ে আলংকারিকদের মধ্যে বহু তত্ত্বকথার বিকাশ ঘটে। এভাবেই রস সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিষয়াভুক্ত হয়ে ওঠে। রস তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে গবেষণাপত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে।

এখন প্রশ্ন হল রস কিভাবে নাট্যসাহিত্যকে ও শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে —

'রস' এই অলংকারশাস্ত্রীয় তত্ত্বটির প্রয়োগ দেখা যায় সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলায়। আচার্য ভরতমুনি তাঁর নাট্যশাস্ত্রে বলেছেন - *'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ প্রবর্ততে'*।[১২] অর্থাৎ, এমন কোন বিষয় নেই যেখানে রস নেই। তাই নাট্যসাহিত্য যেমন রসযুক্ত, তেমনি শিল্পকলাও রসাভিমুখী। এই বিষয়টি অনুসন্ধান করেছি আমার গবেষণাপত্রে।

নাট্যসাহিত্য বলতে কবি কালিদাসের দৃশ্যকাব্য (মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্শীয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল), কবি ভবভূতির দৃশ্যকাব্য (মালতীমাধব, মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত) এবং কবি শূদ্রকের (মৃচ্ছকটিক) দৃশ্যকাব্যগুলিকেই নির্বাচন করে, সেখানে রস কিভাবে নাট্যসাহিত্যের উৎকর্ষ বিধান করেছে, তার অনুসন্ধান করেছি।

কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশীয় ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল — এই তিনটি দৃশ্যকাব্যের প্রধান রস শৃঙ্গার এবং সহকারী রসরূপে ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত ও রৌদ্ররসের প্রসঙ্গ এসেছে। এই রসগুলি ছাড়া নাট্যসাহিত্য অসম্পূর্ণ। একটি সমগ্র কাব্য বা নাটক জুড়েও একটি রসের অভিব্যক্তি হয়। বৃহৎ রচনায় একটি অঙ্গী বা প্রধান রস থাকে, তার অঙ্গ বা অধীন হিসেবে অনান্য রসও সেখানে থাকে।

নাটকের ঘটনাক্রম অনুযায়ী এক একটি অঙ্কে এক একটি রসের বা বহু রসের অভিব্যক্তি দেখা যায়। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র দৃশ্যকাব্যের প্রধান রস হল শৃঙ্গার। শৃঙ্গাররসের দৃষ্টান্ত সমগ্র দৃশ্যকাব্য জুড়ে দেখা যায়। মালবিকার সঙ্গে রাজা অগ্নিমিত্রের মিলোনেচ্ছা এখানে শৃঙ্গার রসকে পরিস্ফুট করেছে।[১৩] আবার কখনো

নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদে করুণরসের সঞ্চার হয়েছে।[১৪] বিক্রমোর্বশীয় নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার। পুরূরবা ও উর্বশীর মিলন বর্ণনা এখানে শৃঙ্গার রসকে উপস্থাপিত করেছে। [১৫] কোথাও বা ভয়ানকরসের সঞ্চার হয়েছে।[১৬] অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের প্রধান রস শৃঙ্গার। শকুন্তলা ও দুষ্যন্তের মিলনদৃশ্য বর্ণনাকালে কবি শৃঙ্গার রসের উপস্থাপন ঘটিয়েছেন। [১৭]

অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে বিদূষককে ঘিরে হাস্যরস,[১৮] রাজসভা থেকে হঠাৎ শকুন্তলার অন্তর্ধানের স্থলে অদ্ভুত রস,[১৯] সর্বদমনের বাল্যক্রীড়ার স্থলে বাৎসল্যরস [২০] অভিব্যক্ত হয়।

কবি ভবভূতির দৃশ্যকাব্য মালতীমাধব-এর অঙ্গী রস শৃঙ্গার, মহাবীরচরিতের অঙ্গী রস হল বীর এবং উত্তররামচরিতের অঙ্গীরস হল করুণ। মালতীমাধব প্রকরণের শৃঙ্গার রসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে মালতী ও মাধবের মিলোনেচ্ছার মধ্য দিয়ে। [২১] এই দৃশ্যকাব্যে কোথাও বা বীভৎস রসের সঞ্চার হয়েছে।[২২] ভবভূতির অপর দৃশ্যকাব্য মহাবীরচরিতের সমগ্র রচনা জুড়ে উপস্থাপিত হয়েছে বীররস। রাম ও লক্ষণের যুদ্ধবর্ণনায় বীররসের উপস্থাপনা ঘটেছে।[২৩] বীররস ছাড়াও এই দৃশ্যকাব্যে করুণরসের [২৪] উদ্ভব হয়েছে ভীতা সীতার বর্ণনায়।

স্থানবিশেষে বীভৎসরসের অভিব্যক্তি ঘটেছে তাড়কা রাক্ষসীর রূপবর্ণনায়। [২৫] মেঘের বর্ণনায় কবি ভবভূতি উপস্থাপন করেছেন রৌদ্ররস।[২৬] কবি ভবভূতি করুণরসের উপস্থাপনায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁর উত্তররামচরিত দৃশ্যকাব্যে। এই দৃশ্যকাব্যে রাম-সীতার কাহিনীটি করুণরসের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে।[২৭] লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধের বর্ণনায় উপস্থাপিত হয়েছে বীররস।[২৮] কবি ভবভূতি যে করুণরসের কবি তা উত্তররামচরিত দৃশ্যকাব্যের দৃশ্যবর্ণনায় ধরা পড়েছে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে জগতের কবি শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণের প্রধান রস হল শৃঙ্গার। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার মিলন এখানে শৃঙ্গার রসের সহায়ক হয়েছে।[২৯] সহকারি রসরূপে মেঘের বর্ণনায় ভয়ানক রসের প্রসঙ্গ এসেছে।[৩০] বসন্তসেনার ভয় পেয়ে ছুটে পালানের দৃশ্য ভয়ানকরসের সঞ্চার ঘটেছে।[৩১] শকারের কথোপকথনের মধ্যে

হাস্যরসের উপস্থাপন ঘটেছে।[৩২] প্রকরণ প্রসঙ্গে আচার্য ভরতমুনি বলেছেন নাটকের রসের সদৃশ প্রকরণের রস হবে। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে রস দৃশ্যকাব্যের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই প্রযুক্ত হয়েছে। তাই কবি কালিদাস, কবি ভবভূতি ও কবি শূদ্রক তাঁদের দৃশ্যকাব্যে প্রধান ও সহকারী রস রূপে যে যে রসের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন, সেগুলি নাটকের প্রয়োজনেই অভিব্যক্ত হয়েছে। এইভাবে রস নাট্যসাহিত্যের বিষয় হয়ে উঠেছে।

নাট্যসাহিত্যের পাশাপাশি রস কিভাবে শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে এই যে প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছে, এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নাট্যসাহিত্যের মতো শিল্পকলাও রসাভিমুখী। শিল্পকলার ক্ষেত্রে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে রস অভিব্যক্ত হয় দর্শনের দ্বারা। কোনো সহৃদয় দর্শক যখন কোনো শিল্পবস্তু প্রত্যক্ষ করেন, তখন তিনি রস উপলব্ধি করেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির মধ্যে শান্তরস অভিব্যক্ত হয়।[৩৩] শিব-পার্বতী মূর্তিতে শৃঙ্গার রসের প্রাচুর্য দেখা যায়।[৩৪] অজন্তা চিত্রকলায় বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণি চিত্রের মধ্যে শান্তরসের আধিক্য দেখা যায়।[৩৫]

সাহিত্যের রস ও শিল্পকলার রসের সাদৃশ্য বিচার —

সাহিত্যের রস বলতে পাঠক যখন কাব্যনাটকাদি পাঠ করেন তখন তা থেকে রস আস্বাদন করেন। শৃঙ্গারাদি রস অনুভব একমাত্র পাঠক বা দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। যখন কোনো দৃশ্যকাব্য দেখে বা পড়ে সহৃদয় দর্শক তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যান, তখন সেই নাটক বা দৃশ্যকাব্য থেকে শৃঙ্গারাদি রস হৃদয়ে অনুভব করেন। রস অনুভব একমাত্র দর্শকের পক্ষেই সম্ভব। অভিনবগুপ্তের কথায় এই দর্শক বা পাঠকের স্বরূপ হল - *যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্ বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্নীয়ভবন যোগ্যতা হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।* [৩৬] পুনঃ পুনঃ কাব্যচর্চায় স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত মনোমুকুরের অধিকারী সেই পাঠক, যাঁর অন্তরে রসের অভিব্যক্তি ঘটে। রসের প্রতীতি ঘটে এবং তা পাঠক বা দর্শকের হৃদয়ে ঘটে - এই হল অভিনবগুপ্তের মত। কোনো নাটক দেখে দর্শকের হৃদয়ে যখন রসের সঞ্চার হয় তখন দর্শক শৃঙ্গারাদি রস

উপলব্ধি করেন। সেক্ষেত্রে সাহিত্য থেকে আগত রস হল মূর্ত। পাঠক বা দর্শক সেই রস প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে থাকেন। অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক থেকে দর্শকের মনে যদি শৃঙ্গাররসের উদ্বোধন হয়, তখন সেই শৃঙ্গাররসের উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করে থাকেন। রসবাদীদের মতে, রস হল - লোকোত্তর - চমৎকার - প্রাণ। এই লোকোত্তর - চমৎকারিত্বই নাটক বা কাব্য থেকে অনুভূত হয়। বাস্তবের অসম্ভব কাব্যে সম্ভব হয় বলেই কাব্যের বা রসের জগৎ লোকোত্তর আনন্দের জগৎ।

শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তাই, রসিক দর্শক শিল্পবস্তু দর্শন করে আনন্দ লাভ করে থাকেন। শিল্পকলার রস হল বিমূর্ত সেই রস সহৃদয় দর্শকের মনে আনন্দের সঞ্চার করে থাকে। শিল্পরসিক যিনি কোনো চিত্রকলা বা ভাস্কর্য দর্শন করে আনন্দলাভ করেন, তাঁর হৃদয়ে নিশ্চিতভাবে রসের সঞ্চার ঘটে থাকে। শিব-পার্বতীর মূর্তি দেখে যখন কোনো রসিকের মনে শৃঙ্গার রসের উদ্বোধন ঘটে তখন, শিল্পের রস রূপে দর্শক মনে বিরাজ করে। এই রসের যে অভিব্যক্তি তা একমাত্র রসিক দর্শকের হৃদয়েই বিরাজ করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিল্পের রস এবং সাহিত্যের রসের মধ্যে সাদৃশ্য বিরাজমান। সাহিত্যের রস মূর্ত এবং শিল্পের রস বিমূর্ত হলেও উভয়ের মূল উদ্দেশ্যই হল পাঠক দর্শকের হৃদয়ে আনন্দলাভ।

রীতি কিভাবে নাট্যসাহিত্য ও শিল্পকলাকে প্রভাবিত করেছে —

নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে রীতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাট্যসাহিত্যের কবিরা এক একটি বিশেষ রীতিতে তাঁদের নাট্য সৃষ্টি করেছেন। এক এক কবির রচনারীতি এক এক রকমের। বিশেষ করে এই রচনারীতির দিয়েই কবিদের সৃষ্ট কাব্যকে একজনের থেকে আরেকজনকে আলাদা করা যায়। কবি কালিদাসের রচনা রীতি ও কবি ভবভূতির রচনারীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামন কাব্যের ক্ষেত্রে তিনটি রীতির কথা বলেছেন - যে রীতি তিনপ্রকার - বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী।[৩৭]

এই রীতিগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ রীতি হল বৈর্দভী, কারণ এই রীতিতে সর্বগুণের সমাবেশ ঘটে।[৩৮] কবি কালিদাস এই বৈদর্ভী রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন। কবি কালিদাসের তিনটি দৃশ্যকাব্য মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোবর্শীয় ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল দৃশ্যকাব্যগুলি বৈদর্ভী রীতিতে রচিত হয়েছে। তাই কবি কালিদাস সম্বন্ধে বলা হয় - *বৈদর্ভী রীতি সন্দর্ভে কালিদাস প্রগল্‌ভতে।*[৩৯]

আচার্য বামন কবি কালিদাস রচিত বৈদর্ভী রীতির উদাহরণ দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে —

গাহন্তাং মহিষা নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মূহুস্তাড়িতং
ছায়াবদ্ধকদম্বকং মৃগকুলং রোমন্থমভ্যস্যতু।
বিশ্রদ্ধং ক্রিয়তাং বরাহততিভির্মুস্তাক্ষতিঃ পল্বলে
বিশ্রামাং লভতামিদং চ শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ।।[৪০]

কবি কালিদাস বর্ণনা করেছেন শকুন্তলাকে দর্শন করার উৎকণ্ঠায় মৃগয়ায় যেতে অনিচ্ছুক রাজার্ষি দুষ্যন্তের এই উক্তি। এই শ্লোকে কিভাবে দশটি গুণের সমাবেশে বৈদর্ভী রীতির প্রকাশ ঘটেছে, সেই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে —

ছায়াবদ্ধকদম্বকম্, শিথিলজ্যাবন্ধম্ -এই দুই পদের বন্ধের গাঢ়ত্বার জন্য ওজঃ; *ছায়াবদ্ধকদম্বকম্, মৃগকুলম্* - এই দুই পদের বন্ধে গাঢ়ত্ব ও শৈথিল্যের সংমিশ্রণের জন্য প্রসাদ; *মহিষা নিপানসলিলম্* - এইখানে পদরচনার মসৃণতার জন্য শ্লেষ; *গাহন্তাম্* হইতে আরম্ভ করিয়া যেই রীতিতে রচনা আরম্ভ হইয়াছে সেই রীতিতেই সমাপ্তির জন্য মার্গাভেদরূপ সমতা; *গাহন্তাম্* শব্দে আরোহ, 'মহিষা' শব্দে অবরোহ, এইরূপ অন্যত্রও আরোহ ও অবরোহের ক্রম পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া সমাধি; *শৃঙ্গৈর্মূহুস্তাড়িতম্* এইখানে পৃথকপদত্বের জন্য মাধুর্য; *রোমন্থামভ্যস্যতু* - এইখানে বন্ধের অজরঠত্ব অর্থাৎ পুরুষহীনতার জন্য সৌকুমার্য; *শিথিলজ্যাবন্ধমস্মদ্ধনুঃ* এইখানে বন্ধের নৃত্যপ্রায়তার জন্য উদারতা; পদসমূহের উজ্জ্বলতার জন্য কান্তি এবং পদসমূহের

অর্থের সহজবোধ্যতার জন্য অর্থব্যক্তি - এই দশপ্রকার গুণের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। গুণের স্বরূপ নির্ণয় গুণ বিবেচন নাম অধ্যায়ে করা হইবে।

কালিদাস পরবর্তীযুগের কবি ভবভূতি গৌড়ী রীতির কবি। তাঁর মালতীবাধব, মহাবীরচরিত, উত্তররামচরিত - নাটকত্রয়ীতে গৌড়ী রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। গৌড়ী রীতির লক্ষণ প্রসঙ্গে রীতিবাদের প্রবক্তা আচার্য বামন বলেছেন - *ওজঃ কান্তিমতী গৌড়ীয়াঃ।*[৪১] অর্থাৎ, ওজঃ ও কান্তি গুণে ভূষিত রীতিতে রীতিবিশেষজ্ঞরা গৌড়ী রীতি বলে থাকেন।

সমস্তাত্যুদ্ভটপদামোজঃকান্তিগুণান্বিতাম্।
গৌড়ীয়ামিতি গায়ন্তি রীতিং রীতিবিচক্ষণাঃ।।[৪২]

আচার্য বামন গৌড়ী রীতির উদাহরণ দিতে গিয়ে কবি ভবভূতির মহাবীরচরিতের এই শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন —

দোর্দণ্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দণ্ডাবভঙ্গোদ্যত-
ষ্টংকারধ্বনিরার্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিণ্ডিমঃ।
দ্রাক্‌পর্যস্তকপালসম্পুটমিতব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর-
ভ্রাম্যৎপিণ্ডিতচণ্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।[৪৩]

উল্লেখ্য, ভবভূতির কাব্যশৈলী এটাই প্রমাণ করে যে, সে যুগের কাব্য বা নাট্যকৃতি ততটা সাধারণের জন্যে নয়, সেগুলি একান্তই বিদগ্ধ গোষ্ঠীর জন্য। তাই ভবভূতির রচনায় দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগ, কর্কশ ভাষার প্রয়োগ এই বৈশিষ্ট্যগুণে মণ্ডিত গৌড়ীরীতির প্রভাব লক্ষনীয়।

মূলতঃ বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতিই কবিদের মধ্যে জনপ্রিয়। ভবভূতি তাঁর নাট্যরচনায় গৌড়ী বা বৈদর্ভী কোন বিশেষ একটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন বলে মনে হয় না। তাই মালতীমাধব ও মহাবীরচরিতে গৌড়ী রীতির প্রাধান্য থাকলেও উত্তররামচরিত বৈদর্ভী রীতির প্রাধান্যই বেশী। উত্তররামচরিত রচিত হয়েছে মাধুর্যগুণযুক্ত বৈদর্ভী রীতিতে। *অন্যাং চ প্রায়েণ কোমলো বন্ধো'সমাস*[৪৪] - এই

রীতিতে প্রায়শ কোমল ও অসমস্ত পদ বর্তমান। ভবভূতির রচনা পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের এক মধুর সংমিশ্রণ। কোন একটি শৈলীকে অমলম্বন করে তিনি তাঁর ভাবাবেগকে রুদ্ধ করে দেননি, ভাব ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই বিবর্তিত হয়েছে তাঁর শৈলী। তাঁর রচনা কখনও গৌড়ী আবার কখনও বৈদর্ভী রীতিতে সমাশ্রিত। কখনওবা প্রয়োজনানুসারে একই পদ্যে দুটি রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। উত্তররামচরিতে এইরূপ বৈশিষ্ট্য দেখা গেছে।[৪৫] শ্লোকের প্রথম দুটি চরণে লবের আনন্দের প্রকাশে প্রযুক্ত হয়েছে বৈদর্ভী রীতি, আবার শেষের দুটি চরণে ক্ষত্রিয় তেজের প্রকাশে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে ওজোগুণ সমন্বিত সমাসবদ্ধ গৌড়ীরীতি।

ভবভূতির উত্তররামচরিতে পর্বতের পাদদেশে নদীর বর্ণনায় অনুপ্রাসের ছটায় রম্য পদ্যে বনাঞ্চলের পরিপূর্ণ দৃশ্যটি আমাদের সামনে উপস্থাপিত হয়, আবার পঞ্চম অঙ্কে লবের তেজস্বিতা ও শক্তিমত্তার বর্ণনায় বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ব্যবহৃত হয়েছে অনুপ্রাসমণ্ডিত শব্দনিচয়।[৪৬]

অনুরূপভাবে সার্থক দ্যোতনায় পরূষ, কর্কশ ও সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য দেখা যায়। আবার অন্যত্র মানব-মনের সূক্ষ্ম অনুভূতি, দাম্পত্যপ্রেমের আবেগ, স্নেহ ও বাৎসল্যরসের প্রকাশে ভবভূতি প্রসাদ ও মাধুর্যযুক্ত বৈদর্ভী রীতিকে অবলম্বন করে কঠিন দীর্ঘসমাসবহুল পদ বর্জন করেছেদ। স্মৃতির রোমন্থনে সীতার প্রতি অভিবাজ্যমান সম্ভোগ শৃঙ্গার প্রকাশ,[৪৭] ব্যথিত হৃদয়া বাসন্তীর মর্মস্পর্শী তিরস্কার,[৪৮] সীতা বিরহিত রামের করুণ বিলাপ[৪৯] ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈদর্ভী রীতির সহজ, সার্থক, সাবলীল প্রকাশ দেখা যায়।

শৃঙ্গার, করুণ প্রভৃতি কোমল প্রকৃতির রসগুলির ব্যঞ্জনায় ভবভূতি সর্বত্র গ্রহণ করেছেন বৈদর্ভী রীতিকে এবং বর্জন করেছেন দীর্ঘসমাসযুক্ত পদ ও শব্দের আড়ম্বরতা। অনুরূপভাবে, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, বীভৎস প্রভৃতি রসের প্রয়োগ ও অভিব্যক্তির জন্য এবং ভয়ঙ্কর ও গুরুগম্ভীর দৃশ্যাবলীর উপস্থাপনায় অবলম্বন করেছেন গৌড়ীরীতি। তাঁর রচনায় গদ্যভাগে গৌড়ীরীতির প্রাধান্যের জন্য পাওয়া যায় সমাসবহুল ভাষা ও সানুপ্রাস পদবিন্যাসের প্রবণতা। কালিদাসের কমনীয় রচনারীতিতে

আছে মধুরিমা আর ভবভূতিতে আছে ঔদাত্য। ভাবের অনুভূতি ও বর্ণনা ভবভূতির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা তাঁকে অন্য কবিদের থেকে পৃথক করে চিহ্নিত করেছে। ভবভূতির বিশেষত্ব হল প্রকৃতির কোমল ও মনোহর দিকটির উপস্থাপনা, তাই ভবভূতিকে যথার্থ প্রকৃতির কবি বলা হয়।

কবি শূদ্রক বৈদর্ভী রীতির কবি। তাঁর মৃচ্ছকটিক দৃশ্যকাব্য বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। মৃচ্ছকটিক দৃশকাব্যটি যেহেতু প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য তাই বৈদর্ভীরীতির পাশাপাশি এখানে প্রকরণের বৈশিষ্ট্যগুলিও দেখা যায়। মৃচ্ছকটিকের কাহিনী লৌকিক ও কবি স্বকপোলকল্পিত, প্রধান রস হল শৃঙ্গার, নায়ক ধীর প্রশান্ত বিপ্র ও বণিক, নায়িকা গণিকা ও কুলস্ত্রী।

মহামহোপাধ্যায় হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় মৃচ্ছকটিকের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলেছেন - *বাহুল্যেন বৈদর্ভীরীতিঃ। অল্পবৃত্তিরবৃত্তির্বা বৈদর্ভী রীতিরিষ্যতে।*[৫০] শূদ্রকের কাব্যশৈলী সরল ও স্বাভাবিক। কালিদাসের মতো স্নিগ্ধপদলালিত্য কাব্যাত্মক সৌষ্ঠব তাঁর রচনায় সুলভ নয়। বসন্তসেনার প্রাসাদ বর্ণনায় ওজঃ গুণের প্রকাশ দেখা যায়। প্রকরণের অন্য অংশে বৈদর্ভী রীতির প্রাধান্য বিরাজমান।

উল্লেখ্য, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে কবিসমাজে ভাষার প্রয়োগে ভিন্ন রুচি দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিকৃতিতেও ভিন্ন ভিন্ন শৈলী অনুসরণ করা হয়ে থাকে। সে শৈলী বা রীতি গড়ে ওঠে তদানীন্তন পাঠক ও দর্শন সমাজের রুচি অনুযায়ী।

একই সাথে সাহিত্য ও শিল্পকলার রীতির সাদৃশ্য বিচার —

আলংকারিক আচার্য বামনের মতে, রীতিই কাব্যের আত্মা।[৫১] এই রীতিকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ রীতি হল বৈদর্ভী রীতি। এছাড়াও কবিরা গৌড়ী ও পাঞ্চালী রীতিকে কাব্য রচনা করেছেন তা তার সাহিত্য পাঠ করলেই অবগত হওয়া যায়। যদিও রীতির নামকরণের সঙ্গে দেশের নামকরণ জড়িয়ে আছে, এই নামকরণের কারণ হল বিদর্ভ প্রভৃতি দেশে বৈদর্ভী রীতির প্রচলন

থেকে দেশের নামানুসারে রীতির নাম হয়েছে। ওজঃ প্রসাদাদি সমস্ত গুণে ভূষিত, দোষরহিত রীতি হল বৈদর্ভী।[৫২] ওজঃ এবং কান্তিগুণে ভূষিত রীতি হল গৌড়ী[৫৩] এবং পাঞ্চালী রীতি হল মাধুর্য ও সৌকুমার্য গুণে বিভূষিত।[৫৪] আচার্য বামনের মতে, যেহেতু বৈদর্ভী সর্বগুণভূষিত তাই এই রীতি গ্রহণীয় এবং গৌড়ীয়া এবং পাঞ্চালীরীতি যেহেতু স্বল্পগুণে ভূষিত সেই কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় মতে লেখকের রচনারীতি নির্ভর করে তাতে মাধুর্য আছে কিনা, দোষরহিত কিনা দীর্ঘসমাসবদ্ধপদের ব্যবহার এর ওপর। পাশ্চাত্য দার্শনিক এ্যারিস্টটলের মতে - লেখকের রচনারীতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মেলে স্পষ্টতায়, স্বচ্ছতায়, তবে গতানুগতিকতার মধ্যে নয়।[৫৫]

কালিদাসের বৈদর্ভীরীতিতে রচনার সঙ্গে ভবভূতির গৌড়ীরীতির তুলনা সহজেই করা যায়। আবার শূদ্রকের বৈদর্ভী রীতি ও কালিদাসের বৈদর্ভী রীতি সম্পূর্ণ পৃথক - এভাবে এক এক কবির এক এক রকম রীতি বা রচনা শৈলী দেখা যায়। যা থেকে একজনের থেকে অপরজনের রচনা সহজেই পৃথকভাবে বোঝা যায়। এইভাবে এক একজন কবি এক এক রীতিকে উপজীব্য করে কাব্য রচনা করেছেন, এটিই তাঁদের স্টাইল বা রীতি।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে বিশেষ একধরণের ‘স্টাইল’ একটি বিশেষ সময়কে তুলে ধরে মাত্র। রাজদরবারে শিল্প হিসেবে গুপ্তযুগের শিল্পকলার পাশাপাশি মৌর্য, কুষাণ, সুঙ্গ, মথুরা, গান্ধার শৈলীর কথা চলে আসে। শিল্পকলার ক্ষেত্রে শিল্পীরা এক এক যুগে এক এক বৈশিষ্টসম্পন্ন শিল্পবস্তু নির্মাণ করেছেন। এক যুগের থেকে অপরযুগের শিল্পকলাকে সহজেই পৃথক করা যায় তাদের রীতি দিয়ে। যেমন গুপ্তযুগীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে একরকম শৈলী। কুষাণশৈলীর মধ্যে সম্পূর্ণ অন্য স্টাইল দেখা যায়। গুপ্ত শৈলীকে সহজেই অনান্য যুগের শিল্পরীতি থেকে পৃথক ভাবে জানা যায়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সাহিত্য ও শিল্পকলা দুটি পৃথক মাধ্যম হলেও উভয়ের মধ্যে ‘রীতি’ বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন কবিবিশেষে এক

একটি বিশেষ কাব্যরীতি বা কাব্যশৈলী জন্ম নিয়েছে তেমনি শিল্পকলার ক্ষেত্রে রাজ্যশাসন বিশেষে রাজাদের রাজত্ব অনুযায়ী এক একটি বিশেষ শৈলী বা রীতির (Style) জন্ম নিয়েছে গুপ্তরীতি, কুষাণরীতি প্রভৃতি।

সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে সমান্তরালভাবে রীতি বা শৈলী দেখা যায়, যা এক যুগের শিল্প ও সাহিত্য থেকে অন্য যুগের শিল্প ও সাহিত্যকে পৃথক করেছে ও ভিন্ন ভিন্ন রীতির জন্ম দিয়েছে।

শিল্পকলায় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার স্বরূপ —

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা বিষয়টি ব্যক্ত হয়েছে ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের ধ্বনিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধ্বনির স্বরূপ ব্যক্ত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পকলাতেও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার পৃথক পৃথক অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। শিল্পকলায় ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার বিষয়টি একটি বিমূর্ত বিষয়। রসিক দর্শক যখন কোনও চিত্রকলা বা ভাস্কর্য দর্শন করেন, তখন তিনি কেবল ঐ বস্তুর বাহ্যিক অবয়ব নিরীক্ষণ করেন, এমন নয়। একই সাথে ঐ বস্তুর আভ্যন্তরীণ বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করে থাকেন। কোনও একটি শিল্পবস্তুর মধ্যে বহু না বলা কথা থাকে, রসিক দর্শক যখন ঐ ব্যঞ্জনার স্বরূপটি হৃদয়ে উপলব্ধি করেন তখন শিল্পের সৃষ্টি সার্থকরূপে ধরা দেয়। যে কোনো সার্থক শিল্প সবটা ব্যক্ত করে না, আংশিকভাবে ব্যক্ত থাকে শিল্পের ভাষা, বাকিটা দর্শককে অনুভব করে নিতে হয়। রসিক দর্শকের হৃদয়ে যখন উক্ত শিল্পবস্তুর যথার্থ স্বরূপ ধরা দেয়, না বলা কথা হৃদয়ে উপলব্ধি হয়, তখনই শিল্পের না বলা কথা বা ধ্বনির স্বরূপ ব্যক্ত হয়। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল শিল্পবস্তুর আন্তর তত্ত্বগুলির উপলব্ধি, অবয়বের বহিরঙ্গের না বলা কথা যা কেবল অর্ন্তদৃষ্টিতে ধরা দেয়। গুপ্তযুগীয় সারনাথবুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্তিতে[৫৬] বহিরঙ্গে কেবল ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের দুই আনতচক্ষুই দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ মূর্তির ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল বুদ্ধের ধ্যানমগ্নতার মৃদু হাসির অস্তিত্বটুকু কেবল শিল্পভাষা বোঝেন যে ব্যক্তি তিনিই উপলব্ধি করতে পারেন। এখানে নাসাগ্র দৃষ্টিপাত আভ্যন্তরীণ মগ্নতার চিহ্নস্বরূপ। একটি শিল্পবস্তুকে দেখে তার সার্বিক ভঙ্গীটুকু হৃদয়ে উপলব্ধি করাই হল শিল্পের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা।

প্রশ্ন হল সাহিত্য ও শিল্পকলায় ধ্বনি একইসূত্রে প্রযুক্ত হচ্ছে কি —

সাহিত্যের ধ্বনি ও শিল্পকলার ধ্বনি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে দেখা যাবে উভয়েই একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থ প্রধান রূপে ধরা দেয়। শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে, সেখানে ব্যঞ্জনার্থটি প্রধান হয়ে ওঠে। সাহিত্যের ব্যঙ্গ্যার্থ বা প্রতীয়মান অর্থ বা ধ্বনির কাজই হল বাচ্যার্থকে বহুদূর ছড়িয়ে দেওয়া। এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা ভাষায় প্রকাশের যোগ্য নয়, তা কেবল স্বহৃদয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা মাত্র। তাই ধ্বনি অনির্বচনীয় বিমূর্ত। বাচ্যার্থ যে ব্যঙ্গ্যার্থবোধের সঙ্গে অপরিহার্য সম্পর্কে বদ্ধ, আনন্দবর্ধন সেকথা স্বীকার করে বাচ্যার্থও যে সহৃদয়ের কাছে আগ্রহ সৃষ্টিক্ষম সে কথা প্রকাশ করলেন। আনন্দবর্ধনের মতে ব্যঙ্গ্যার্থই কাব্যার্থ। তাই শব্দার্থের জ্ঞান থাকলেই লোকে কাব্য বোঝে না, কাব্য বোঝা বা উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কাব্যার্থের বোধ। এই কাব্যার্থ যেহেতু বাচ্যার্থের দ্বারা আক্ষিপ্ত হয়, তাই পাঠককে প্রথমেই বাচ্যার্থের জ্ঞান সঞ্চয় করতে হয়, অতঃপর সেই বাচ্যার্থ নিজেকে ব্যঞ্জিত অর্থের কাছে নিঃশেষিত করে। ধ্বনিকার আনন্দবর্ধনের মতে, যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ অপেক্ষা প্রধান, সেটিই ধ্বনিকাব্যরূপে পরিচিত, সেটিই উত্তমকাব্য।

ব্যঙ্গ্যস্যার্থস্য প্রাধান্যে ধ্বনিসংজ্ঞিতকাব্যপ্রকারঃ[৫৭]

এই ব্যঞ্জিত অর্থ বা ব্যঞ্জনা বা -এর ভূমিকা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকগণ যে সত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাই শিল্পকলার ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়েছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আনন্দবর্ধন রসধ্বনিকেই শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করেছেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। শিল্পকলায় ধ্বনির স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে সহৃদয় রসিকের হাত ধরে। শিল্পী যখন কোনও চিত্রকলা সৃষ্টি করেন, বা ভাস্কর্য নির্মাণ করেন, তখন তিনি তার মধ্যে বহু না বলা বাণী অব্যক্তরূপে রাখেন। না বলা কথাগুলোর শিল্পকলার প্রাণ, শিল্পীর মনের কথা। শিল্পের ক্ষেত্রে ধ্বনি কিভাবে ব্যক্ত হয়েছে তা এই গবেষণাপত্রের একটি অধ্যায়ে স্পষ্টভাবে দেখানো হয়েছে। সাহিত্যের ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা শিল্পকলায় একই সুরে বেজে উঠেছে।

সাহিত্যের রস, রীতি, ধ্বনি কিভাবে শিল্পকলায় রস, রীতি, ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে —

সাহিত্যের রস, রীতি, ধ্বনি খুব স্পষ্টভাবে শিল্পকলার রস, রীতি, ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়েছে। যদিও সংস্কৃত আলংকারিকগণ নান্দনিক তত্ত্বগুলোকে শুধুমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রে বা literary art-এর ক্ষেত্রে প্রয়োগের কথা ভেবেছেন, তবুও একথা আমাদের ধরে নিতে হবে যে, যা কিছু সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা অনান্য শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও রস, রীতি, ধ্বনি - এই তত্ত্বগুলির প্রয়োগ আবশ্যিক। কখনো কখনো সাহিত্য থেকে রসদ সংগ্রহ করে শিল্পকলা সৃষ্টি হয়। তখন দুটি পৃথক মাধ্যমেও সাহিত্যে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে শিল্পকলার বিষয় এক হয়ে ওঠে। সাহিত্যে বর্ণিত বিষয় - যেমন নাট্যকার কালিদাস বর্ণিত নায়িকার বর্ণনার সঙ্গে শিল্পকলায় ভাস্কর্যমূর্তির নায়িকার সাদৃশ্য অনুভূত হয়। সাহিত্যে যেমন গৌড়ী, পাঞ্চালী, বৈদর্ভী প্রভৃতি রীতিতে কবিগণ কাব্য রচনা করেন; শিল্পের ক্ষেত্রেও কুষাণরীতি, গান্ধাররীতি, মথুরারীতি, মৌর্যরীতি, গুপ্তরীতি - প্রভৃতি রীতিতে শিল্প সৃষ্ঠ হতে দেখা যায়। সাহিত্য গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রীতিকে উপজীব্য করে, পাশাপাশি শিল্পকলায় দেখা যাচ্ছে নানান রীতির নানান শৈলী। একটি বিশেষ রীতিতে কাব্য রচনার কবিকে যেমন অপর রীতির কবির থেকে সহজেই পৃথক করা যায়, আলাদা করে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি এক যুগের শিল্পকলাকে অপর যুগের শিল্পকলার থেকে পৃথক ভাবে চিহ্নিত করা যায় রীতির দ্বারাই।

পাশ্চাত্য শৈলীবিজ্ঞানের একজন সমালোচক প্রুস্ত বলেছিলেন যে, একজন চিত্রকরের কাছে ছবি আঁকার ব্যাপারে রঙের যে ভূমিকা একজন লেখকের কাছে style-ও তাই। তাঁর মতে - It is matter not of technique but of a highly personal mode of vision.[৫৮] রীতিবাদের সম্পর্কেও হয়তো একথা বলা চলে। রীতিবাদীরা কাব্যের 'অবয়ব সংস্থান' নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল এই সংস্থানের মূলে যে শিল্পভাবনা আছে তাকে খুঁজে বের করা। খোদ আনন্দবর্ধন রীতিকে ধ্বনি ও রসবাদে প্রবেশের সোপান বলেছেন। এখানেই রীতি প্রস্থানের গুরুত্ব।

রসের ক্ষেত্রেও তাই একথা খাটে। সাহিত্যে যেমন শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক অদ্ভুত, শান্ত, বীভৎস প্রভৃতি রসের উপস্থাপন ঘটে, কবি বর্ণনীয় বিষয়কে চমৎকৃত করে তোলার জন্য বিভিন্নরসের প্রয়োগ ঘটান, তেমনি শিল্পকলাতেও রসের বিমূর্ততা থাকলেও তা রসিক দর্শকের কাছে মূর্ত রূপে ধরা দেয়। সাহিত্যের অষ্ট বা নব রসের বৈচিত্র শিল্পকলাতেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কখনও বা সাহিত্যে বর্ণিত বিশেষ রসের ঘটনা শিল্পকলায় যথা চিত্রকলা ও ভাস্কর্যে বর্ণিত হতে দেখা যায়।

শিল্পে রস আছে বলেই তা আমাদের আনন্দের সন্ধান দেয়। অভিনবগুপ্তের মতে শিল্পের সঙ্গে একত্মতা লাভ করলে তা থেকে আনন্দলাভ করা যায়।

সত্ত্বময়নিজচিৎ স্বভাবনিবৃত্তির্বিশ্রান্তিলক্ষণঃ পরব্রহ্মাস্বাদসবিধঃ।[৫৯]

দৃশ্যকাব্যের মতো চিত্রের মধ্যে রসের প্রাধান্য মণীষীরা স্বীকার করেছেন। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন মনে করেন শিল্পকর্মে রস সবসময় ব্যঞ্জিত হয়। কোন শিল্প ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা রসকে সূচিত করে। যে সব উপাদান ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার দ্বারা আমাদের রসপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে সেগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ ব্যঞ্জনা যখন আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় তখন বাচ্যবুদ্ধি (যা ব্যঞ্জনাময় অর্থলাভে সহায়ক) কখনো দূরীভূত হয় না।

ন হি ব্যক্তে প্রতীয়মানে বাচ্যবুদ্ধির্দূরীভবতী।[৬০]

চিত্রের ক্ষেত্রে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার যে প্রয়োগ ঘটে থাকে তা প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণে ব্যক্ত হয়েছে —

উত্তরীয়বিহীনাংশ দ্যুতাক্তান্ প্রদর্শয়েৎ
যুক্তং মভারৈরুষ্ট্রাদ্যৈঃ মার্গং সার্থং প্রদর্শয়েৎ।[৬১]

অর্থাৎ, একজন দ্যুতাসক্তকে বোঝানোর জন্য মানুষকে চিত্রিত করা উচিত উত্তরীয়বিহীন অবস্থায়, একটি বড় রাস্তাকে বোঝাবার জন্য চিত্রিত করা উচিৎ নানা রকম দ্রব্যবহনকারী একদল উট ইত্যাদি।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ থেকে বোঝা যায় ধ্বনির ভূমিকা চিত্রের ক্ষেত্রে যথেষ্ট রয়েছে। কাব্যের ক্ষেত্রে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা কাব্যকে রসাভিমুখী করে তোলে, পাঠককে চমৎকৃত করে, তেমনি চিত্রকলার ক্ষেত্রেও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা দর্শককে চমৎকৃত করে তোলে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসধ্বনি শ্রেষ্ঠ, শিল্পকলার ক্ষেত্রেও তাই। আচার্য অভিনবগুপ্তের মতে ভাষার শিল্পপ্রতিভা সব সময়েই - *রসাবেশবৈশদ্যনির্মাণক্ষনত্বযুক্ত।* [৬২]

যে কোন ধরণের শিল্প সৃষ্টি ক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের রসাবেশের উপর। চিত্রের ক্ষেত্রেও সেই রসাবেশ কাজ করে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে অন্যোন্যাশ্রয় বা পরম্পরাশ্রয় যুক্ত, কেননা ভাব বা ভাবনা ছাড়া শিল্পে কখনো রস আসতে পারে না, আবার রস ছাড়া ভাবনা আসতে পারে না। আচার্য ভরতমুনির মতে —

ন ভাবহীনো'স্তি রসঃ ন ভাবো রসবর্জিতঃ। [৬৩]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবি যেমন বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গার্থকে প্রধান ধরে নিয়ে সার্থক কাব্য সৃষ্টি করে থাকেন; এভাবেই সাহিত্যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে। শিল্পকলাতেও ধ্বনি বা ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটে বিমূর্ত শিল্পের সহৃদয় রসিকের মনে মূর্ত হয়ে ওঠার মাধ্যমে।

মূলতঃ কাব্য ও শিল্পকলা রূপবৃক্ষের দুটি শাখা, একই মূলে শোষিত রস দুটি শাখায় সমভাবে বিতারিত হয়। ভারতীয় কবিরা কাব্যে যে সাদৃশ্য গ্রহণ করে তাঁদের রচনাকে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট করেছিলেন, শিল্পীরাও ঠিক একই অনুভূতি নিয়ে তাঁদের চিত্র ও মূর্তিগুলিকে রূপদান করেছিলেন।

সূত্রনির্দেশ ঃ

১। *রীতিরাত্মা কাব্যস্য। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৬।

২। *বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্। সাহিত্যদর্পণ,* ১.৩।

৩। *কাব্যস্যাত্মা ধ্বনিঃ। ধ্বন্যালোক,* ১.১।

৪। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৫। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৬। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৭। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৮। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

৯। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩৬।

১০। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৫।

১১। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.১৭।

১২। *নাট্যশাস্ত্র,* ৬.৩১।

১৩। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৪.১৫, ৪.৯।

১৪। *মালবিকাগ্নিমিত্রম্,* ৩.১।

১৫। *বিক্রমোবর্শীয়ম্,* ২.১৬, ৩.১৬।

১৬। *বিক্রমোবর্শীয়ম্,* ১.৬।

১৭। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ১.১৯, ২.২০।

১৮। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ২য় অঙ্ক।

১৯। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ৫ম অঙ্ক।

২০। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ৭ম অঙ্ক।

২১। *মালতীমাধবম্,* ১.৩৮, ৬.২০।

২২। *মালতীমাধবম্,* ৩.১৭, ৫.১৬, ৫.১৮।

২৩। *মহাবীরচরিতম্,* ১.৫৩, ১.৫৪, ২.২১।

২৪। *মহাবীরচরিতম্,* ২.২১।

২৫। *মহাবীরচরিতম্,* ১.৩৫।

২৬। *মহাবীরচরিতম্,* ৫.২১, ৫.২৬।

২৭। *উত্তররামচরিতম্,* ৩.৪, ৩.৫।

২৮। *উত্তররামচরিতম্,* ৫.৩৫।

২৯। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.২৩, ১.২।

৩০। *মৃচ্ছকটিকম্,* ৫.৪৬।

৩১। *মৃচ্ছকটিকম্,* ১.১৭।

৩২। *মৃচ্ছকটিকম্,* ৮ম অঙ্ক।

৩৩। Goswamy, B. N. : *Essence of Indian Art* , P. 25.

৩৪। *তদেব,* পৃ. ৩২।

৩৫। Zimmer, Heinrich : *The Art of Indian Asia*, P. 62.

৩৬। অভিনবগুপ্ত : *অভিনবভারতী*।

৩৭। *সা ত্রিধা বৈদর্ভী গৌড়ীয়া পাঞ্চালীচেতি* । *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.৯।

৩৮। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১১।

৩৯। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* (সম্পা.) অনিল চন্দ্র বসু, পৃ. ৫১।

৪০। *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্,* ২.৬।

৪১। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১২।

৪২। *কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১২, বৃত্তিঃ।

৪৩। *মহাবীরচরিতম্,* ১.৫৪।

৪৪। *কাব্যানুশাসন,* ১.১৩।

৪৫। *উত্তররামচরিতম্,* ৩.৪, ৩.৫।

৪৬। *উত্তররামচরিতম্,* ৫.৬, ৫.৫।

৪৭। *উত্তররামচরিতম্,* ১.২৬।

৪৮। *উত্তররামচরিতম্,* ৩.২৬।

৪৯। *উত্তররামচরিতম্,* ৩.৩১, ৩.৩২, ৩.৩৫।

৫০। *হরিদাসসিদ্ধান্তবাগীশ, পৃ.* ২৫।

৫১। পূর্বোক্ত।

৫২। তু. *সমস্তগুণোপেতাবৈদর্ভী। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১১।

৫৩। তু. *ওজঃ কান্তিমতী গৌড়ীয়া। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি*, ১.২.১২।

৫৪। তু. *মাধুর্যসৌকুমার্যোপপন্না পাঞ্চালী। কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি,* ১.২.১৩।

৫৫। Aristotele : *On the Art of Poetry*, Chapter 21.

৫৬। Zimmer, Heinrich : *The Art of Indian Asia*, P. - 325.

৫৭। *ধ্বন্যালোক,* কারিকা, ৩.৪১

৫৮। Stepen Ullman : *Meaning of Style*.

৫৯। *ধ্বন্যালোক,* লোচন, চৌখাম্বা, পৃ. ১৯৩।

৬০। *ধ্বন্যালোক,* ৩.৩।

৬১। *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ,* ২৪ অধ্যায়।

৬২। Dr. K. Krishnamoorthy (Ed.) : *Dhvanyaloka,* P. xi, MLBD, Delhi, 1982.

৬৩। ভরতমুনি : *নাট্যশাস্ত্র,* ৫.১.৩৬।

গ্রন্থপঞ্জী

মৌল উপাদান ঃ

আনন্দবর্ধন - *ধ্বন্যালোকঃ* । (সম্পা.) সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, কালীপদ ভট্টাচার্য। কলকাতা : মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯২ (বাং.)। [প্র. সং. ১৩৬৪ (বাং.)]।

— · (সম্পা.) বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। কলকাতা : পুস্তকশ্রী, ১৩৭৮ (বাং.)।

দণ্ডী - *কাব্যাদর্শঃ* । (সম্পা.) চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৫।

ভরত - *নাট্যশাস্ত্র* । (সম্পা.) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। কলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৯৭ ।

বামন - *কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তিঃ* । (সম্পা.) অনিল চন্দ্র বসু। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫।

বাৎসায়ন - কামসূত্র, কোলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০।

বিশ্বনাথ কবিরাজ - *সাহিত্যদর্পণঃ* । (সম্পা.) সত্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।

— · (সম্পা.) বিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়। কলকাতা : পুস্তকশ্রী, ১৩৭৬ (বাং.)।

বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ । (সম্পা. ও অনু.) পঞ্চানন তর্করত্ন কলকাতা : ১৯৭২।

Agni Purāna. (Ed.) Hari Narayan Apte. Poona : Anandaashram Sanskrit Series, No. 41, 1957.

... . (Ed.) N. Gangadharam (Ancient Indian Tradition and Mythology), Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (rept.), 2010 (Vol. 27-30).

Ānandavardhana. *Dhvanyāloka.* (Ed.) Bishnupada Bhattacharya, Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1957 (2nd Ed.).

Bhavabhūti. *Mahāvīracaritam*. (Ed.) T. R. Ratnam Ayar. Bombay : Nirnayasagar Press, 1926 (1st Pub 1892)

... . (Ed.) Ramchandra Mishra, Varanasi : Caukhamba Vidyabhawan, 1955.

... . (Ed.) Todarmal, London : Oxford University Press, 1928.

Bhavabhūti. *Mālatīmādhava*. With the Commentary of Jagaddhara *(Ed. & Tr.)* M. R. Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1967.

... . (Ed. & Tr.) H. H. Wilson. Calcutta : The Society of the Resuscitation of Indian Literature, 1901.

... . (Ed.) M. R. Telau. Bombay : Nirnayasagar Press, 1936 (1st Pub 1892).

... . (Ed.) Saru & Devdhar. Poona : Fargusun College, 1935.

... . (Ed.) K. S. Mavadev Shastri. Trivandram : Trivandran Sanskrit Series, 1950.

... . (Ed.) M. R. Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1967 (1st Pub 1913).

... . (Ed.) R. D. Karmakar. Poona : Aryabhusan Press, 1935.

... . (Ed.) R. G. Bhandarkar. Poona : Bhandarkar O. R. Institute, 1970 (1st Pub 1876).

Bhavabhūti. *Uttararāmacaritam. (Tr.)* P. V. Kane. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1971.

… . … . (Tr.) S. K. Belvalkar. Cambridge Mass : Harvard University Press, Harvard Oriental Series, (Vol. 21), 1915.

… . … . (Ed.) T. R. Ratnam Ayar and K. P. Parab. Bombay : Nirnayasagar Press, 1949 (1st Pub 1899).

… . … . Text with the Commentary of Ghanasyama (Tr.) P. V. Kane. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1971.

… . … . (Ed.) S. K. Belbhalkar. Poona : Oriental Book Agency, 1928. Havard Oriental Series (21 Vols.), Havard University Press, 1915.

… . … . (Ed.) Saradaranjan Ray. Calcutta : S. R. & Co., 1921.

… . … . (Ed.) M. R. Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1962.

… . … . (Ed.) G. K. Bhat. Surat : The Popular Publishing House, 1965 (1st Pub 1956).

Bhojadeva. *Samarānganasūtradhāra*. (Ed.) M. M. T. Ganpati Sastri. Baroda : Central Library, 1924 (vol I).

Kālidāsa*. Abhijñānaśakuntalam*. (Tr.) Monier Williams. Oxford : Clarendon Press, 1877.

… . *Mālavikāgnimitram*. (Ed. & Tr.) M. R. Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (rept.), 1999.

… . *Vikramorvaśīyam*. (Ed. & Tr.) C. R. Devadhar. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1966.

Kalātattvakośa. (Ed.) Bettina Bäumar, Delhi : Indira Gandhi National Centre for Arts & Motilal Banarsidass Pub., 2003. (Vol. II)

Kumārasambhava. (Ed. & Tr.) M. R. Kale (Kalidasa's Kumarsambhava with the Commentary of Mallinatha). Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (rept.), 1986.

Mahābhārata. (Ed). (Sanskrit Text with Trans) M. N. Dutt. Delhi : Parimal Publication, 2001, (9 Vols).

... . (Ed.) V. S. Sukthankar (General Editor). Poona : Bhandarkar Oriental Research Institute, 1933-1966, Critical Edition, 22 Vols.

... . (Tr.) K. M. Ganguly. Calcutta : 1884-1896, New Delhi, 1991(rpt.).

... . (Tr.) P. C. Roy. Calcutta : 1884-1896 (Several reprints), (12 Vols).

Mammaṭa. *Kāvyaprakāśa*. (Ed.) Gangadhar Jha. Delhi : Bharatiya Vidya Prakashan, 2005.

Mānasāra (on Architecture and Sculpture). (Ed.) Prasanta Kumar Acharya. London, New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1979. (1st Ed. 1934). (vol III)

Nāndikeśvara. *Abhinayadarpaṇam*. (A Manual of Gesture and Posture used in Ancient Indian Dance & Drama). (Ed.) Manmohan Ghosh. Calcutta (Now Kolkata) : Firma K. L. Mukherjee, 1957. (rev 2nd ed.).

Śūdraka. *Mṛcchakaṭikam*. *(Ed. & Tr.)* Kashinath Pandurang. Bombay : Tukram Javaj, 1904.

... . (Ed. & Tr.) M. R. Kale. Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (9th Edn.), 2009.

The Viṣṇudharmottara (Pt III) : A Treatise on Indian Painting and Image Making. (Ed.) Stella Kramrisch. Calcutta : University of Calcutta, 1928.

Vāmana. *Kāvyākamkarasūtravṛtti.* (Ed.) Narayan Nethaji Kulkarni. Poona : Oriental Book Agency, 1927.

Vāmana. *Kāvyālankara Sūtra*. Varanasi : Kashi Sanskrit Series (209), Chaukhambha Sanskrit Sansthan, 1987.

Viṣṇudharmottara Purāna (Third Khanda). Ed. Priyabala Shah. Baroda : Oriental Institute, 1961. (Vol - II). (Gaekwad's Oriental Series, No. - 137)

Viṣṇudharmottara Purāna. Bombay : Venkateswar Press, 1969.

Viśvanātha. *Sāhityadarpaṇa.* Delhi : Bharatiya Book Corporation, 1988.

সহযোগী উপাদান ঃ

আচার্য, রামানন্দ - *কাব্যপ্রকাশ* । কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ (বা.)।

কাঞ্জিলাল, দিলীপকুমার - *সংস্কৃত সহিত্যে হাস্যরস*। কলকাতা : সংস্কৃত কলেজ, ১৯৬৪। (কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক - ২৯)

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার - *বাংলার ভাস্কর্য* । কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৯৮৬।

গুপ্ত, মণীন্দ্রভূষণ - *শিল্পে ভারত ও বর্হিভারত*। কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২। (প্র. সং. - ১৯৭৫)।

ঘোষ, সুবোধ - *শিল্পভাবনা* । কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

চক্রবর্তী, বিপ্লব (সম্পা.) - *শৈলী চিন্তাচর্চা* । কোলকাতা : রত্নাবলী, ২০০৩।

চক্রবর্ত্তী, রণবীর, চক্রবর্ত্তী কুনাল ও বন্দোপাধ্যায়, অমিত (সম্পা.) - *সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাস* । কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০ (অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ)।

চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী - *কাব্যাদর্শ*। কোলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।

চট্টোপাধ্যায়, অশোক - *পুরাণ পরিচয়*। কলকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১৯৭৭।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার - *দ্বীপময় ভারত* । কোলকাতা, ১৯৪০।

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ - *বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী* । কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮। (প্র. সং. - ১৯৪১)।

— · *ভারতশিল্পে মূর্তি* । কোলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৬ (বাং.)।

— · *ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ* । কোলকাতা : বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৩৯৬ (বাং.)।

থাপার, রোমিলা - *ভারতবর্ষের ইতিহাস*। কোলকাতা : ওরিয়েন্ট লং ম্যান, ১৯৯৩।

দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার - *কাব্যালোক* । কোলকাতা : বীণা লাইব্রেরী, ১৩৫২ (বাং.)।

দাস, করুণাসিন্ধু - *কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা* । কোলকাতা : রত্নাবলী, ২০০৭। (প্র. সং. - ১৯৯৪, দ্বি. সং. ১৯৯৯)।

দেব, চিত্রা - *বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন* । কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৩।

দত্ত, বিমলকুমার - *ভারত শিল্প (আদি পর্ব)*। কলকাতা : ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ১৯৬৩।

দাস, কৃষ্ণলাল - *শিল্প ও শিল্পী*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

নির্ম্মলানন্দ, স্বামী - *দেবদেবী ও তাঁদের বাহন* । কোলকাতা : দ্য প্রণব মঠ, ১৩৯০ (বাং.)।

নাথ, শান্তি - *রূপে অরূপে অজন্তা*। কলকাতা : রক্তকরবী, ২০০৮।

নিয়োগী, বরেন্দ্রনাথ - *অজন্তা চিত্রদর্শন*। কোলকাতা : ইন্টারন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৯৯।

বিশ্বাস, সুখেন - *নন্দনতত্ত্বে প্রাচ্য* । কোলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১১।

— · *নন্দনতত্ত্বে প্রতীচ্য* । কোলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ২০১০।

বেদান্ততীর্থ, গিরীশচন্দ্র - *প্রাচীন শিল্প পরিচয়*। কলিকাতা : সুবর্ণরেখা পাবলিকেশন্, ১৯৭৯ (বাং.)

বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু - *কামসূত্রম্* । কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।

বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন - *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ* । কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬।

বসু, চন্দ্রনাথ - *শকুন্তলাতত্ত্ব* । কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০ (বাং.)।

বসু, দেবেন্দ্রনাথ - *শকুন্তলায় নাট্যকলা* । কলিকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৭৯ (বাং.)।

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ - *হিন্দুদের দেবদেবী* । কোলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী - *প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য* । কোলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪১৭ (বাং.)। [প্র. সং. ১৩৯৪ (বাং.)]।

ভট্টাচার্য, সকুমারী - *প্রবন্ধসংগ্রহ* - ১। কলকাতা : গাঙচিল, ২০১২।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী - *প্রাচীন ভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০।

ভট্টাচার্য, সকুমারী - *ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯১।

ভট্টাচার্য, ভোলানাথ - *শিল্পভাবনা* । কোলকাতা : মনফকিরা, ২০১০ (বাং.)। (প্র. সং. - ১৯৭৫)।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ - *ধর্ম ও সংস্কৃতি ঃ প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট*। কোলকাতা : আনন্দ প্রকাশন, ১৯৯৬।

ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ - *বৌদ্ধ দেবদেবী*। কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬২ (বাং.)।

ভট্টাচার্য, হেমন্ত - *কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্যে নারীচরিত্র*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৩।

ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ - *প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের ভূমিকা*। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৪।

— · *কাব্যমীমাংসা*। কলকাতা : জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন্স্, ১৯৮২।

ভাট, জি. কে. - *ভবভূতি*। নিউ দিল্লী : সাহিত্য একাডেমী, ২০০০।

মণ্ডল, বলরাম - *প্রাচীন সাহিত্যে সভাকবি ও রাজন্যবর্গ*। কলকাতা : দে বুক স্টোর, ২০০৩।

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী - *সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি-ভাস্কর্য*। কোলকাতা : নব চলন্তিকা, ২০১০।

মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত - *সাহিত্য বিবেক*। কোলকাতা : গ্রন্থমেলা, ১৮৮৪।

মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার - *ভারতশিল্পের কথা*। কোলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৩৮৯ (বাং.)।

মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন - *রসসমীক্ষা*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১।

মুখোপাধ্যায়, তরুণ - *বাঙালীর শকুন্তলাচর্চা ঃ উনিশ শতক*। কোলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৫।

মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল - *সাংস্কৃতিকী*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৮৬ (বাং.)।

মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত - *বাঘ ও অজন্তা*। কলকাতা : রত্নসাগর গ্রন্থমালা, ১৩৬২ (বাং.)।

মিত্র, কৃষ্ণা - *সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগকলা*। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩।

রায়, নীহাররঞ্জন - *বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং (তৃতীয় সংস্করণ), ২০০১।

রায়, যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি - *পৌরাণিক উপাখ্যান*। কলকাতা, ১৩৬১ (বাং.)।

লোকেশ্বরানন্দ, স্বামী - *ভারত সংস্কৃতির রূপরেখা*। কোলকাতা : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পর্ষদ, ২০০৩।

শাস্ত্রী, গৌরীনাথ (সম্পা.) - *সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার*। কোলকাতা : নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২। (খণ্ড - ১৩, ১৭, ৭, ৬, ১২, ২, ১১)

— · *সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৪০০ (বাং.)।

শাস্ত্রী, জিতেন্দ্রনাথ - *সংস্কৃত ও সংস্কৃতি*। কলিকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮৩।

সান্যাল, নারায়ণ - *অজন্তা অপরূপা*। কলকাতা : ভারতী বুক স্টল, ১৯৮৩।

সরকার, দেবার্চনা - *সেকেলে*। কোলকাতা : বলরাম প্রকাশনী, ১৪১১ (বাং.)।

— · নিত্যকালের তুই পুরাতন। কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ; ২০১৩।

সরকার, দীনেশচন্দ্র - শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ। কলকাতা : সাহিত্যলোক, ১৯৮২।

সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র এবং ভট্টাচার্য, কালীপদ (সম্পা.) - *ধন্যালোক*, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৫।

সরস্বতী, সরসীকুমার - *পালযুগের চিত্রকলা*। কলিকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮।

সেন, অমূল্যচন্দ্র - *অভিজ্ঞান-শকুন্তল*। কলকাতা : সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৬৮।

হালদার, অসিতকুমার - *ভারতের শিল্পকথা : স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা*। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৯।

হালদার, অসিতকুমার - *অজন্তা*। কলকাতা : লালমাটি, ২০১০।

Adinarayana, M. *Decorative Arts of South Indian Temples*. Delhi : Bharatiya Kala Prakashan, 2001.

Agrawata, V. S. *Catalogue of Brahmanical Images in Mathura Art*. Lucknow : U. P. Historical Society, 1951.

… . *Indian Art (Gupta Art : A History of Indian Art in the Gupta Period, 300-600 A.D.)*. Varanasi : Prithivi Prakashan, 1977.

… . *Indian Art : A History of Indian Art from the Earliest Times upto the Third Century. A D. Vol 1*. Varanasi : Prithivi Prakashan, 1965.

… . *Ancient Indian Folk Cults*. Varanasi : Prithivi Prakashan, 1970.

Allan, John. *Catalogue of the coins of Ancient India in the British Museum*, London : British Museum, 1967.

… . *Catalogue of the Coins of the Gupta Dynasties and Sasanka, King of Gauda*. New Delhi : Oriental Books Reprint Corporation, 1975. (Originally Pub. British Museum, London 1914).

Apte, Vaman Shivam. *The Practical Sanskrit-English Dictionary*. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2010.

Banerjee, R. D. *The Temple of Siva ant Bhumara.* Memories of Archaeological Survey of India, No. 16.

Barua, Anandaram. *Bhavabhūti and his place in Sanskrit Literature*. Kolkata, 1878.

Basham. A. L. & Sharma. Arvind. *The Little Clay Cart : An English Translation of the Mṛchchhakaṭikam of Sudraka, as Adopted for the stage*. Albany : State University of New York Press, 1994.

Bhat, G. K. *Sanskrit Drama : A perspective of Theory and Practice*. Karnataka : Karnataka University, 1975.

… . *Tragedy and Sanskrit Drama*. Bombay : Popular Prakasan, 1974. (Bhat, G. K.)

Birdwood, George C. M. *The Arts of India*. Great Britain : British Book Company, 1971.

Canningham, A. *The Stupa of Bharuta*. Varanasi : Indological Book House (2nd rept. Edn.), 1962.

Coomaraswamy. A. K. *Fundamentals of Indian Art*, New Delhi, 1980.

Cotterill, H. B. *A History of Art*. New Delhi : Kaveri Books, 1998 (Vol. I, II).

Cowell, E.B. *The Jataka Stories of the Buddha's former Births*. New Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 1994.

Dasgputa and Dey. *History of Indian Literature - Classical Period*. Calcutta : University of Calcutta, 1947.

Dahejia, Vidya. (Ed.). *Devi : The Great Goddess : Female Divinities in South Asian Art. Washington DC* : Arthur M. Sackier Gallery, Sanithsonian Institution, 1999.

Dange, S. A. *Encyclopedia of Puranic Beliefs and Practices*. New Delhi : Navrang, 1990. (5 Vols).

… . *Glimpses of Myth and Culture*. Delhi : Ajanta Publications, 1987.

Dasgupta, Kalyan Kumar. *A Tribal History of Ancient India : A Numismatic Approach*. Calcutta : Nababharat Pub., 1974.

Datta, Bimal Kumar. *Introduction to Indian Art*. Calcutta : Prajñā, 1979.

Davis, T. W. Rhys & Stede, William (Ed.) : *Pali-English Dictionary*. Delhi : Motilal Banarsidass (rept. edn.), 1993.

De, S. K. *History of Sanskrit Literature*. Calcutta : University of Calcutta (2nd Edn.), 1975.

Deneck, M. M. *Indian Sculpture : Masterpieces of Indian, Khmer and Cham Art*. London : Spring Books, 1964.

Desai, Devangana & Banerji, Arundhuti. *Kaladarpana : The Mirror of India Art.* New Delhi : Aryan Books International, 2009.

Deva, Krishna. *Temples of Khajuraho*. Archaeological Survey of India, 1990. (Vol – I)

Dowson, J. A. *A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, History and Culture*. London : Roultedge & K. Paul, 1961.

Farquhar, J. N. *An outline of Hindu Religious Literature*. London : Oxford University Press, 1919.

Fergusson, J. & Burgess, J. (Ed.) *The Cave Temples of India*. Delhi : Oriental Book. (rept.), 1969.

Fergusson, James. *History of Indian and Eastern Architecture*. New Delhi : Pupa Pub. Indian Pvt. Ltd. 2011.

Frederic, Louis. *Indian Temples and Sculptures*. London : Thames and Hudson, 1959.

Fuller, C. J. *Servants of the Goddess : The Priests of a South Indian Temple*. Cambridge : Cambridge University Press, 1984.

Ghosh, Niranjan. *Concept and Iconography of the Goddess of Abundance in three Religions of India : A Study on the basis of Art and Literature of Brahmanical, Buddhist and Jain Tradition*. Burdwan : Burdwan University, 1979.

Gonda, Jan. *"The Ritual Sutras." In a History of Indian Literature*. (Ed.). Otto Harrassowitz, Wlisbaden : 1977. (Vol 1.)

… . *Ancient Indian Kingship from the Religious Point of view*. E. J. Brill (rept.) Leiden : 1969.

Goswami, B. N. *Essence of Indian Art*. Ahmedabad : Mapin Publishing Pvt. Ltd. 1986.

Goswami, Bijoya & Basu (Ghosh), Shiuli. *Indian and Western Aesthetics & Comparative Study*. Kolkata : Sanskrit Pustak Bhandar, 2012.

Guirand, Felix. *Larousse Encyclopedia of Mythology.* New York : Promestheus Press, 1959.

Gupta S. K. *Elephant in Indian Art and Mythology*. New Delhi : Avinav Pub., 1983.

Gupta, Parameshwari Lal. (Ed.) *Patna Museum Catalogue Antiquities*. Patna : Patna Museum, 1965.

Harle, J. C. *The Art and Architecture of the Indian Subcontinent*. London : Penguin Books, 1986.

… . *Gupta Sculpture : Indian Sculpture of the Fourth and Sixth Centuries A. D*. New Delhi : Munshiram Manoharlal (rept.), 1996.

Harse, R. G. *Observation on the life and works of Bhavabhūti*. France : Litere De Franch, 1938.

Hastings, James. *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Edinburgh : T. & T. Clark, 1908-1926. (12 Vols.)

Havell, E. B. *The Art Heritage of India*, Bombay : D. B. Taraporevala Sons & Co. Private Ltd, 1965.

… . *Indian Sculpture & Painting*. London : John Murray, 1908.

Huntington, Susan L. *The Art of Ancient India*. New York : Weather Hill, 1993.

Jagirdar, R. V. *Drama in Sanskrit Literature*. Bombay : Popular Book Depot, 1947.

Jamkhedkar, P. Arvind. *Ajanta*. New Delhi : Oxford University Press, 2009.

Joshi, N. P. *Mathura Sculpture*. New Delhi : Sandeep Prakashan, 2004.

Keith, A. B. *The Sanskrit Drama*. London : Oxford University, 1923.

… . *A History of Sanskrit Literature*. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 1999. (Vol. I, II).

Kollar, Petar L. *Symbol in Hindu Architecture*. New Delhi : Aryan Books International, 2001.

Kramrisch, Stella. *The Hindu Temple*. Delhi : Motilal Baransidass Publication, 1996 (Vol - II).

... . *Indian Sculpture : Ancient Classical and Mediaeval*. Delhi : Motilal Baransidass Publication, 2013.

Kumar, Jitendra. *Masterpieces of Mathura Museum*. New Delhi : Sundeep Prakashan, 2002.

Lahiri, P. C. *Concepts of Rīti and Guṇa in Sanskrit Poetics*. New Delhi : Oriental Book Reprint Corporation, 1974.

Longhurst, A. H., *Pallava Architecture*. New Delhi : Cosmo Publications, 1988 (Vol 14).

Macdonell, A. A. & Keith, A. B. *Vedic Index of Names and Subjects*, Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (rept), 1967.

Mackenzie, Donald A. *Indian Myth and Legend*. London : The Gresham Publication Company Ltd., 1968.

Mani, B. R., *Sarnath*. New Delhi : Archaeological Survey of India, 2006.

Mani, Vettam. *Purana Encyclopedia : A Comprehensive Dictionary with Special Reference to the Epic and Puraic Literature*. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1979.

… . *Puranic Encyclodaedia*. Delhi : Motilal Banarsidass Publishers, 2010.

Mathpal, Yashodhar. *Prehistoric Rock Paintings of Bhimbetka.* New Delhi : Abhinav Publication, 1984.

Mishra. P. K. *Studies in Hindu and Buddhist Art*. New Delhi : Abhinav Publications, 1999.

Mitra, Debala. *Ajanta*. New Delhi : Director General of Archaeology in India, 1958.

Mukherjee, Bratindra Nath, *Numismatic Art of India : Historical and Aesthetic Perspectives*. New Delhi : Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2007.

Mukherjee, Radhakamal. *The Culture and Art of India*. New Delhi : Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 1984.

Nagar, R. S. & Joshi, K. L. (ed.) *Nāṭyaśāstra*. Delhi : Parimal Publication, 2006 (3rd Ed.). (rpt.) (1st ed. 1985, 2nd ed. 1990).

Raghaban, V. *The Social Play in Sanskrit*. Bangalore : The Indian Institute of Culture, 1932.

… . *Bhavabhūti and the Veda.* Bombay : Journal of the Asiatic Society, 1956-1957. (Vol 31-32).

Raja, C. Kunhan. *Survey of Sanskrit Literature*. Bombay : Bharatiya Vidyabhawan, 1962.

Rao, Rekha. *Apsaras in Hoysala Art. A New Dimension*. New Delhi : Aryan Books International, 2009.

Rowland, Benjamin. *The Art Architecture of India*. London : Penguin Books, 1953.

Sen, Asis. *Animal Motifs in Ancient Indian Art*. Calcutta : Firma K. L. Mukherjee & Sons, 1973.

Shah, Priyabala. The Sun Images. New Delhi : Aditya Prakashan, 1996.

Shah, *U. P. Studies in Jaina Art*. Banares : Jaina Cultural Society, 1955.

Sharma, Deo Prakash & Sharma, *Madhuri. Early Buddhist Metal Images of South Asia*. Delhi : Bharatiya Kala Prakashan, 2000.

Sharma, Ramesh Chandra (Ed.). *Bharhut Sculpture*. New Delhi : Abhinav Publicatons, 1994.

Shasri, H. P. *A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript in this Collections of the Asiatic Society of Bengal, Mss*. Calcutta : Asiatic Society of Bengal, 1928. (Vol. 5)

Shastri, Ajay Mitra. *The Age of Vākāṭaka*. New Delhi : Harman Pub. House, 1992.

… . *The Age of Satavahanas*. New Delhi : Aryan Book International, 1999.

Shastri, Daksina Ranjan. *A Short History of Indian Materialism, Sensationalism and Hedonism*. Calcutta : Bookland Pvt. Ltd., 1930.

Shastri. A. K. Nilkantha. *A Comprehensive History of India*. Bombay : Orient Longmans, 1957. (Vol. 2)

Singh, Chandramani & Vashishtha. *Pathwayas to Literature Ary and Archaeology*. Jaipur : Publication Scheme, 1991.

Singh, Upinder. *A History of Ancient and Early Medieval India : From the Stone age to the 12th Century*. New Jersey : Upper Saddle River, Pearsona Education in South Asia, 2008.

Singha, Ayodhya. *Bhavabhūti aur unko Nātyakalā*. Delhi : Motilal Banarsidass, 1969.

Sivaramamurti, C. *Ethical Fragrance in Indian Art & Literature*. New Delhi : Kanak Publications, 1980.

… . *Indian Painting*. New Delhi : National Book Trust, 2006 (rpt.) (1st Ed. 1970, 2nd Ed. 1996)

… . *Sanskrit Literature and Art – Mirrors of Indian Culture*. New Delhi : Laksmi Book Store, 1970. (Memories of the Archaeological Survey of India No. – 78)

.. . *Sources of History illumined by literature*. New Delhi : Kanak Publication.

… . *Sculpture inspired by Kalidasa*. Madras : The Samskṛta Academy, 1942.

Smith, Vincent A. *A History of Fine Art in India & Ceylon*. Bombay : D.B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd., 1962.

... . *The Early History of India*. Oxford : The Clarendon Press, 1957.

Sorenses, A. *An Index to the Names in the Mahabharata*. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1963.

Swami, Parameshwaranand. *Encyclopedia Dictionary of Puranas*, New Delhi : Sarup & Sons, 2001 (5 Vols.)

Tuner. Jane. *The Dictionary of Art*. New York : Oxford University Press, 1996. (Vol – 15).

Upadhayay, Baladev & Bachaspati, Gourola. *Mahakavi Bhavabhūti*. Varanasi : Caukhamba Vidyabhawan, 1960.

Vatsyayan, Kapila. *Bharata : The Nātyaśāstra*. New Delhi : Sahitya Akademi, 2001.

… . *Classical Indian Dance in Indian Literature and the Arts*. New Delhi : Sangeet Natak Akademi, 2007.

… . *The Cultural Heritage of India*. Kolkata : The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 2006. (vol VII, Part I)

Walimbe, Y. S. *Abinavagupta on Indian Aesthetics*. Delhi : Ajanta Publication, 1980. (Ajanta's Series of Aesthetics 2).

Weiner, Sheila L. *Ajaṇṭā : Its place in Buddhist Art. London* : University of California Press, 1977.

Wilkins, W. J. *Hindu Mythology*. Delhi : Delhi Book Store, 1972.

Willliams, Monier. *A Sanskrit-English Dictionary : Etymologically and Philosophically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Language*s. Delhi : Motilal Banarsidass Pub. (rept), 2005.

Winternitz, M. *A History of Indian Literature*. Delhi : Motilal Banarsidass Pub., 1963. (Vol. 3).

Yazdani, G. *Ajanta*. London : Oxford University Press, 1930 (Vol. 1,2,3 & 4).

Zimmer, Heinrich. *Myth and Symbols in Indian Art and Civilization*. New York : Pantheo Books Inc., 1946. Bollingen Series – VI.

... . *The Art of Indian Asia*. New York: Pantheon Books, 1955 (Vol. I, II).

——— .... ———